আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ গল্প

ভূমিকা ও অনুবাদ | ফজল হাসান

আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ গল্প

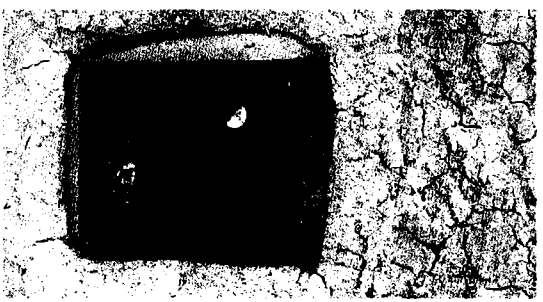

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ গল্প

ভূমিকা ও অনুবাদ | ফজল হাসান

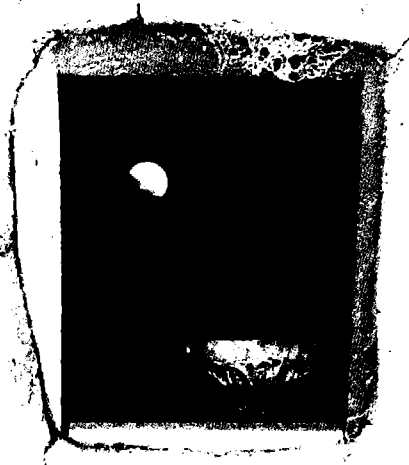

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

www.pathagar.com

প্রকাশনার এক দশক

আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ গল্প
অনূদিত গল্প
ভূমিকা ও অনুবাদ : **ফজল হাসান**

স্বত্ব
ফজল হাসান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
২৫০ টাকা

Afganistaner Shrestha Golpo (Great short stories of Afghanistan) Translated by Fazal Hasan, Published by Ittadi Grantha Prokash : February 2013. Price Tk. 250, ISBN: 984 70289 0299 9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জনাব গোলাম মোর্তোজা
সম্পাদক, 'সাপ্তাহিক'

যিনি 'সাপ্তাহিক'য়ের সাধারণ সংখ্যায় গল্প ছাপান না,
অথচ 'বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণা' ছাপিয়ে
আমাকে কৃতজ্ঞতার মায়াবী জালে আবদ্ধ করেছেন।
পরে ঈদ সংখ্যা ২০১২-য় ছাপিয়েছেন 'দাশত্-ই-লাইলি'।

www.pathagar.com

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

মৌলিক ছোটগল্প
চন্দ্রপুকুর (ফেব্রুয়ারি ২০০৮)
কতোটা পথ পেরোলে তবে (ফেব্রুয়ারি ২০১০)

অনুবাদ গল্প
নির্বাচিত নোবেল বিজয়ীদের সেরা গল্প (ফেব্রুয়ারি ২০১৩)

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সংকলনের বেশির ভাগ গল্পই ইতোমধ্যে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী, সাপ্তাহিক এবং অনলাইন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলো প্রকাশের জন্য আমি সর্বজনাব গোলাম মোর্তোজা (সম্পাদক, সাপ্তাহিক), ফেরদৌস মাহমুদ (প্রাক্তন শিল্প-সাহিত্য সম্পাদক, বাংলানিউজ২৪.কম), এম জে ফেরদৌস (বর্তমান শিল্প-সাহিত্য সম্পাদক, বাংলানিউজ২৪.কম), কবি মারুফ রায়হান (সম্পাদক, বাংলামাটি অনলাইন ম্যাগাজিন), আকিদুল ইসলাম (সম্পাদক, বাসভূমি অনলাইন ম্যাগাজিন), সাহাদৎ মানিক (প্রধান সম্পাদক, প্রিয় অস্ট্রেলিয়া অনলাইন ম্যাগাজিন) এবং কবি ফারুক আহমেদ (সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক সকালের খবর) প্রমুখের প্রতি কৃতজ্ঞ। এছাড়া সুইডেনের উপসালা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. অ্যান্ডার্স উইডমার্কের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। দারি এবং পশতু ভাষা থেকে ইংরেজিতে তার অনূদিত গল্পগুলো বাংলায় অনুবাদ করার অনুমতি দেয়া ছাড়াও তিনি আমাকে এই অনুবাদকর্মে উৎসাহিত করেছেন। বইটি প্রকাশের জন্য আমি *ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ*-এর স্বত্বাধিকারী জহিরুল আবেদীন জুয়েল-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আমি আমার স্ত্রী মেহেরুন নিসার প্রতি দায়বদ্ধ। তিনি আমাকে অনুবাদকর্মের জন্য একাকীত্বের জীবনযাপন পালন করার অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

A good story cannot be devised; it has to be distilled.

Raymond Chandler (1888-1959)
American Novelist

www.pathagar.com

ভূমিকা

ভৌগোলিক দিক থেকে আফগানিস্তান পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এক রুক্ষ প্রকৃতির দেশ। দেশটির প্রত্যন্ত অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম। দেশটি সমাজ নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত অসংখ্য জাতি, উপজাতি, আদিবাসী, গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন যোদ্ধাদের নেতৃত্বে এসব গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ফলে আদিকাল থেকেই তাদের ভেতর রয়েছে একধরনের বিভাজন। আজো অশান্তি আর অস্থিতিশীলতার ঘেরাটোপে বন্দি দেশটি। অতীতে সেখানে গণতন্ত্রের কোনো বিকাশ ঘটেনি এবং বর্তমানেও গড়ে ওঠেনি জাতীয়বাদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা। এ ছাড়া সে দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং গোত্রের মধ্যে কোনোদিন কোনো জাতিগত সংহতি গড়ে ওঠেনি, বলা যায় উঠতে পারেনি।

অতীতে আফগানরা কখনওই কোনো বিদেশী শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি, এমনকি এখনও করে না। আলেকজান্ডারের মতো দিগ্বিজয়ী বীর সেনানী কিংবা চেঙ্গিস খানের মতো নির্দয় আর নির্মম যোদ্ধার আক্রমণে দেশটির পাহাড়-পর্বত, জনপদ এবং বাসস্থান ক্ষত-বিক্ষত হলেও কখনও আফগানরা পরাজয় মেনে নেয়নি, বরং রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখেছে। পরবর্তীতে তিনবার ব্রিটিশরা আক্রমণ করেও আফগানদের পরাস্ত করতে পারেনি। তবে সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানের ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। জোর করে ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়া দেশটি দখল করে নেয়। কিন্তু এক দশকের আধিপত্যের আগেই সোভিয়েত রাশিয়া দেশটি থেকে পাত্তারি গোটাতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে গত কয়েক দশক ধরে দেশটিকে ঘিরে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক রাজনীতি আর ষড়যন্ত্রের ঘেরাটোপে আটকে গেছে। গত শতাব্দীর আশির দশকে পাকিস্তানের সহায়তায় আভ্যন্তরীণ কোন্দল, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মৌলবাদী তালেবানদের দুঃশাসন এবং সবশেষে আমেরিকা ও তার দোসরদের সম্মিলিত আগ্রাসন দেশটিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ভৌগোলিকভাবে আফগানিস্তানের অবস্থান এমন একটি জায়গায় যেখানে পশ্চিমা দেশগুলোর, বিশেষ করে আমেরিকার, স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

www.pathagar.com

উপরন্তু মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থানের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের সমাজ ব্যবস্থায় নেমে আসে ঘোর অমানিশা। তাই আফগানিস্তান এখনও একটি অশান্ত দেশ।

আফগানিস্তানের অবস্থান এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে হওয়ায় শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে রয়েছে এক ধরনের দ্বন্দ্ব। যদিও গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে যুদ্ধবিগ্রহ, মৌলবাদী তালেবানদের আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতার জন্য বলা যায় দেশটির শিল্প-সাহিত্য ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়েছে, কিন্তু বর্তমানে এসব নেতিবাচক প্রভাব দেশটির শিল্প-সাহিত্যে ক্রমশ একধরনের নতুনত্বের উন্মেষ ঘটছে।

দুই

আফগানিস্তানের প্রচলিত ভাষা দু'টি—দারি এবং পশতু। যেহেতু রাজনৈতিক দিক থেকে পাশতুনরা ক্ষমতাবান, তাই আফগানিস্তানের সরকারি ভাষা পশতু। অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, দারি ভাষা ব্যবহার করা হয়। তাই সামাজিক কারণে সব আফগানদের উভয় ভাষাতেই পারঙ্গম হতে হয়। তথ্য অনুসারে, প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ আফগান দারি ভাষায় কথা বলে। অন্যদিকে প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ আফগানীর ভাষা পশতু। বাকিরা আঞ্চলিক ভাষাসহ অন্যান্য ভাষায় কথা বলে।

ক্লাসিক্যাল দারি সাহিত্য থেকে আধুনিক আফগান সাহিত্যের বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অতীতে যেখানে ছিল লোকগাথাভিত্তিক সাহিত্য, তা এখন রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্ভর সাহিত্যে রূপ নিয়েছে। আগে যেখানে ছিল প্রাঞ্জল ভাষায় কল্পকাহিনী, তা আজ যুক্তি নির্ভর সচেনতা এবং মননশীল সাহিত্যকর্ম। এছাড়া আগে যেখানে ছিল ভৌতিক কাহিনী, আজ সেখানে দেখা যায় দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন। তবে দারি ভাষার উৎপত্তি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে মনে করেন 'দরবার' (অর্থাৎ রাজকীয় বিচারালয়) শব্দ থেকে দারি ভাষার উৎপত্তি। অর্থাৎ দারি ভাষা রাজকীয় ভাষা। তবে দারি ভাষা শুধু রাজপরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যে (বিশেষ করে কবিতায়), ইতিহাসবিদ এবং বুদ্ধজীবী মহলে এ ভাষার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। অন্যদিকে অনেকে বিশ্বাস করেন যে দারি ভাষা 'দারা' (অর্থাৎ উপত্যকা) শব্দ থেকে এসেছে। কেননা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব বাদাখশান নামক পাহাড়ী এবং উপত্যকা এলাকায় প্রথম দারি ভাষা

www.pathagar.com

বিস্তার লাভ করেছে। একাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কবি হাকিম আবদুল কাশিম ফেরদৌসী 'পার্সি-ই দারি' ভাষায় শাহানামা রচনা করেন। বেশির ভাগ আফগান পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে অতীতের এই 'পার্সি-ই দারি' ভাষা থেকে বর্তমানের দারি ভাষার আসল উৎপত্তি। বলা হয়, ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে পশ্চিমা সাহিত্যের ধারায় প্রভাবিত হয়ে দারি ভাষার কথাসাহিত্যের কলা-কৌশলে নতুনত্ব আনেন আসাদুল্লাহ্ হাবীব, ড. আকরাম ওসমান এবং মোহাম্মদ আজম রাহনাওয়ার জারিয়াবের মতো স্বনামধন্য সাহিত্যিকরা।

ষোড়শ শতাব্দীতে পশতু ভাষায় লেখার প্রথম হদিশ পাওয়া যায়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে আফগানিস্তানের জাতীয় কবি খুশহাল খান খাট্টক পশতু ভাষায় লেখা কবিতার মাধ্যমে উপজাতীয় আচার-আচরণের নিয়ম-কানুন তুলে ধরতেন। ১৯৩৬ সালে পশতু ভাষাকে আফগানিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে গণনা করা হয়। আফগানিস্তানের সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতায়, পশতু ভাষা বিশিষ্ট আসন দখল করে রেখেছে। রাজধানী কাবুল এবং কান্দাহার শহরে পশতু ভাষার প্রচলন বেশি।

আধুনিক পশতু ছোটগল্পের বিষয়বস্তু লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং মানসপটে আঁকা বিচিত্র কাহিনী, যা চারপাশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত। এ সব গল্পের কাহিনীতে কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি নেই, এমনকি আঙ্গিকের কোনো পরীক্ষা-নিরিক্ষার বালাই নেই। তবে অনেকের মতে সাংস্কৃতিক এবং ভৌগলিকভাবে পশতু ছোটগল্পের কাঠামো, প্রকাশভঙ্গি, গল্প প্রকাশের প্রবণতার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ-ভারত, মিশর, তুরস্ক, রুশ এবং পারস্য সাহিত্যের প্রভাব আছে। বর্তমানে পশতু সাহিত্য তার নিজস্ব পরিচয় খুঁজে পেয়েছে।

এই সংকলনে সমকালীন আঠারোজন আফগান লেখক/লেখিকার মোট কুড়িটি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। দু'জন লেখকের দু'টি করে গল্প রয়েছে। এরা হলেন আকরাম ওসমান এবং আজম রাহনাওয়ার জারিয়াব। এদের একাধিক গল্প নির্বাচনের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ নেই, তবে গল্পগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাৎপর্যমণ্ডিত।

তিন

সংকলনের নির্বাচিত গল্পগুলোর বিষয় এবং বক্তব্যের ভেতর রয়েছে বহুমাত্রিকতা। প্রতিটি গল্প আলাদা করে আলোচনা না করে কয়েকটি গল্পের

www.pathagar.com

অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা পৃথকভাবে তুলে ধরা হল। বাকি গল্পগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সব গল্প থেকে বিচক্ষণ পাঠকরাই অনায়াসে খুঁজে নিতে পারবেন গল্পের নিজস্ব বিষয়বস্তু এবং জানা ও বোঝার উপকরণ।

আফগানিস্তানের বামিয়ান পাহাড়ে ২০০১ সালের মার্চে তালেবানদের হাতে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস হওয়ার পর তালেবানদের মানসিক অবস্থার কথা 'বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণা' গল্পটিতে নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

দাশত্-ই লাইলির মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ শুধু আফগানিস্তানের নয়, বিশ্ব ইতিহাসের এক অমানবিক, নৃশংস এবং জঘন্য ঘটনা। পাশবিক এই ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০১ সালের ডিসেম্বরে, যা পশ্চিমা মিডিয়াতে তেমন করে প্রকাশ পায়নি। মাজার-ই-শরীফের কালা-ই জঙ্গি দুর্গের কাছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক পর্যায়ে তালেবান সৈনিকেরা সাদা পতাকা উড়িয়ে ন্যাটো এবং আমেরিকার দোসর ও কমান্ডার দুর্ধর্ষ আফগান জেনারেল আবদুর রশিদ দুস্তমের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের প্রধান শর্ত ছিল আটককৃত তালেবানদের কোনোমতেই শারীরিকভাবে ক্ষতি করা যাবে না। আটককৃত আনুমানিক সাড়ে সাত হাজার তালেবানকে লোহার কন্টেইনারের বন্ধ ট্রাকে করে কুন্দুজ থেকে শেবিরগানের সন্নিকটে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন কন্টেইনারের ভেতর গাদাগাদির জন্য শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, অনাহারে এবং তৃষ্ণায় অনেক তালেবান মারা যায়। ভাগ্যক্রমে যারা বেঁচেছিল, নর্দান অ্যালায়েন্সের অঙ্গ-সংগঠন 'জানবিশ-ই মিলি' দলের উগ্র সৈনিকেরা তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। পরে দাশত্-ই লাইলির মরুভূমিতে মৃত তালেবানদের গণকবর করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। অনূদিত গল্পটি এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে লেখা। গল্পটিতে লেখক যুদ্ধের উভয় পক্ষের সৈনিকদের অভিজ্ঞতার কাহিনী নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, অনায়াসে যা পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দিতে সক্ষম।

মোহাম্মদ আসেফ সুলতানজাদের 'পেশা' গল্পটিতে লেখক মার্কিন সৈনিকদের ওপর এক আফগান যুবকের প্রচণ্ড রাগ এবং ক্ষোভের চিত্র তুলে ধরেছেন। এছাড়া জরীন আনজুরের 'এভাবেই শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে থাকে' গল্পটিতে একজন বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত পিতার করুণ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। 'কবরের আলিঙ্গন' গল্পটিতে মাহমুদ মারহুন একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী জিহাদী তালেবানের নৈতিকতা, মানসিক

www.pathagar.com

টানাপোড়েন এবং কর্মফলের অনুশোচনার চিত্র তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে 'লোকটি পাহাড়ে উঠেছিল' গল্পটিতে পীর মোহাম্মদ কারওয়ান লেখক যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের একজন সাধারণ নাগরিকের দেশপ্রেম, হতাশা এবং উদ্বিগ্নতার এক করুণ চিত্র এঁকেছেন।

পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরে আফগান এক শরণার্থীর জীবনের সত্যি ঘটনার উপর ভিত্তি করে খান মোহাম্মদ সিন্ধ 'প্রদর্শনী' গল্পটি রচনা করেন। গল্পটিতে দারিদ্রতার এক মর্মান্তিক এবং বিয়োগান্তক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে 'পরিচয়পত্র' গল্পটিতে ওয়ালী শাকের পেশোয়ারের শরণার্থী শিবিরে আফগান শরণার্থীদের দুর্গতি এবং লাঞ্ছনার এক নিখুঁত মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। এছাড়া শরণার্থীদের দারিদ্র্যতা, দুঃসহ জীবন, নষ্টালজিয়া ও মাটির টানে মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার আকুলতার পরও যে তাদের আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে, সেই স্পর্শকাতর বিষয়কে লেখিকা পারভিন ফায়েজ জাদাহ্ মালাল সাবলীল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন 'ঘৃণা' গল্পে।

'মাহিনা' গল্পটিতে হামিদ আলিপুর আমেরিকা প্রবাসী একজন আফগান অভিবাসী জীবনের কঠিন সংগ্রাম এবং করুণ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া 'স্পটলাইটের নিচে থমকে থাকা খরগোশের মতো' গল্পটিতে নুশীন আরবাবজাদাহ মতানৈক্যের পরেও একজন আমেরিকা প্রবাসী আফগান এবং অন্যজন আফগানিস্তানের আফগানির কথোপকথনের মাধ্যমে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং আমেরিকায় আফগান অভিবাসী নারীদের জীবনযাত্রার বৈষম্য তুলনা করেছেন।

অন্য সব দেশের মতো আফগানিস্তানেও যে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস আছে, আছে বৈষম্য এবং সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম, আত্মপরিচয় আর মূল্যবোধ, 'ব্যবধান' গল্পটিতে আকরাম ওসমান তারই এক করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। রয়া খোরশীদ 'তার বিশ্বস্ত চোখ' গল্পটিতে একজন নিঃসঙ্গ নারীর দুর্বিসহ জীবনের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা, হতাশা এবং জিঘাংসার এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছেন। দনিয়া গোবারের 'মা' গল্পটি স্বামী নিখোঁজ হওয়া একজন গরীব মায়ের ছেলেকে ঘিরে অপূর্ণ স্বপ্ন এবং আশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গল্পটি ১৯৯৪ সালে আফগানিস্তানের জাতীয় গল্প প্রতিযোগিতায় দশটি শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি হিসেবে নির্বাচিত হয়।

'মানুষ কথা রাখে' গল্পটিতে আকরাম ওসমান আফগানিস্তানের পুরুষ মানুষের একদিকে গৌরব, আত্মসম্মান, ওয়াদা এবং অন্যদিকে শাশ্বত প্রেম-

www.pathagar.com

ভালোবাসার চিরাচরিত টানপোড়েনের কাহিনী সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। বলা হয়, গল্পটি আকরাম ওসমানের সবচেয়ে সফল এবং অন্যতম ছোটগল্প। গল্পের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ১৯৮৫ সালে সিনেমা তৈরি করা হয়।

আফগানিস্তানে তালিবানদের পতনের পর ২০০২ সালে 'কাল্পনিক প্রত্যাবর্তন' গল্পের লেখক আতিক রহিমী দীর্ঘ আঠারো বছর পরবাসী জীবন কাটিয়ে জন্মস্থান কাবুলে ফিরে যান। শৈশবের স্মৃতিবিজরিত কাবুলের ধ্বংসস্তূপ দেখে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। সেই অনুভূতি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পটিতে। জাহেদা গনিও 'আফগানিস্তান' গল্পটি তার জীবনের সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রচনা করেন। গল্পটিতে তিনি আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় তার শিশু বয়সের ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতার স্মৃতি তুলে ধরেছেন।

চার

ইংরেজিতে অনুবাদ সাহিত্যের জন্য বৃটেনের পেন ক্লাব পদক এবং বানিপাল ট্রাস্ট পুরস্কার প্রাপ্ত সমকালীন আধুনিক আরবী সাহিত্যের সেরা অনুবাদক হামফ্রে ডেভিসের মতে 'অনুবাদ খুবই একাকিত্বের কাজ'। এছাড়া আমরা জানি, ইংরেজি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সরাসরি অনূদিত না হলে, অর্থাৎ অনুবাদ থেকে অনুবাদ হলে, হয়তো কিছুটা খামতি দেখা দিতে পারে। তবে বলা হয়, অনুবাদকের ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার দক্ষতা অনেক সময় সেই খামতি পূরণ করতে পারে।

এ সংকলনের গল্পগুলোয় সমকালীন আফগান ছোটগল্পের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধাঁচের এবং নানান স্বাদের গল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশি পাঠকদের সঙ্গে আফগানিস্তানের ছোটগল্পের একটা ধারনা দেবার প্রয়াস এই সংকলন।

আশা করি, আফগানিস্তানের ছোটগল্প সম্পর্কে এই সংকলন বিদগ্ধ এবং উৎসাহী পাঠকদের মনে খানিকটা আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। যদি তাই হয়, তাহলেই অনুবাদকের শ্রম এবং একাকিত্বের কাজ সার্থক হবে।

ফজল হাসান
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

www.pathagar.com

গল্পক্রম

বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণা	জালমে বাবকোহি	১৭
দাশত্-ই লাইলি	মোহাম্মদ হুসেইন মোহাম্মদী	২৯
পেশা	মোহাম্মদ আসেফ সোলতানজাদে	৪৭
এভাবেই শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে থাকে	জরীন আনজুর	৫৮
কবরের আলিঙ্গন	মাহমুদ মারহুন	৬৪
লোকটি পাহাড়ে উঠেছিল	পীর মোহাম্মদ কারওয়ান	৬৭
প্রদর্শনী	খান মোহাম্মদ সিন্ধ	৭১
পরিচয়পত্র	ওয়ালী শাকের	৭৬
ঘৃণা	পারভিন ফায়েজ জাদাহ্ মালাল	৮২
মাহিনা	হামিদ আলিপুর	৮৬
স্পটলাইটের নিচে থমকে থাকা খরগোশের মতো	নুশীন আরবাবজাদাহ্	৯৩
ভস্মস্তূপ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর	কাদের মোরাদি	১০১
প্রতিশোধ অথবা আশা-নিরাশার দোলাচল	নাহীদ ইলিয়াসি	১০৮
ব্যবধান	আকরাম ওসমান	১১৪
ভাঙা জানালা	ফরহাদ আজাদ	১২০
কম্পোজিশন	আজম রাহনাওয়ার জারিয়াব	১২৪
ফটো	আজম রাহনাওয়ার জারিয়াব	১২৮
তার বিশ্বস্ত চোখ	রয়া খোরশীদ	১৩২
মা	দনিয়া গোবার	১৩৭
মানুষ কথা রাখে	আকরাম ওসমান	১৪৬
কাল্পনিক প্রত্যাবর্তন	আতিক রহিমী	১৬৯
আফগানিস্তান	জাহেদা গনি	১৭৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জালমে বাবকোহি
বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণা

বুম... ম... ম...

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে একটা কিছু ভেঙে পড়ার আওয়াজ...

ডিনামাইটের ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ...

নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে। ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণের সঙ্গে তালেবানদের কম্পিত কণ্ঠের আর্তচিৎকার 'আল্লাহু আকবর' মিলে চারপাশের পাহাড়ি ভূমি যেন প্রচণ্ড রকমভাবে কাঁপছে এবং ধূলির ঘন মেঘ উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে বিশাল খোলা আকাশের দিকে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে।

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে বিশাল বৌদ্ধমূর্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে এবং মূর্তির ধ্বংসাবশেষ তড়িৎ বেগে পাহাড়ের মাঝে উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে। বৌদ্ধমূর্তির ভাঙা নুড়িপাথরের হাজার হাজার টুকরো আশেপাশের জায়গা জুড়ে বিশাল স্তূপ সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি নুড়িপাথরের টুকরো যেন এক একটা ক্ষুদ্র বৌদ্ধমূর্তি।

বিস্ফোরণের শব্দতরঙ্গ সমস্ত বামিয়ান উপত্যকার ঈথারে ছড়িয়ে পড়েছে। এই শব্দতরঙ্গ চতুর্দিকের পাহাড়ের গায়ে ও চূড়ায় ধাক্কা লেগে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে এবং পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ফিরে আসছে ফাঁকা জায়গায়, যেখানে কিছুক্ষণ আগেও বিশাল বৌদ্ধমূর্তি সগর্বে দাঁড়িয়েছিল। দূরে এবং কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শব্দতরঙ্গ।

ধোঁয়া এবং ধূলিকণায় আকাশ অন্ধকারময়। বাতাসের সঙ্গে ধূলিকণা মিশে উপত্যকা পেরিয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। অনেক দূরে সেই ধূলিকণা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে।

মোল্লা জানান আখন্দ তালেবানদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। এর আগে ট্যাঙ্ক, কামান এবং মর্টার দিয়ে বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস করতে না পারার জন্য তিনি

www.pathagar.com

দারুণভাবে মর্মাহত। পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বৌদ্ধ মূর্তির কাছে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক রাখার জন্য আদেশ করেছেন। যখন বিস্ফোরণের পর 'বুম... ম... ম...' আওয়াজে কেঁপে উঠল মাটি ও পাহাড়, তখন তিনি ভীষণ শব্দ করে হাসলেন এবং চরম আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। সে সময় তিনি আল্লাহু আকবর বলতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন চারপাশ থেকে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তার কানের ভেতর প্রবেশ করে, তখন তার সম্বিত ফিরে আসে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি অন্যদের সঙ্গে সুর মেলালেন।

সমস্ত চেষ্টার পর অবশেষে বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস হওয়ায় মোল্লা জানান দারুণ খুশি। এতদিন মূর্তি ধ্বংস করতে না পারার যে ক্ষোভ তার বুকের ভেতর কাঁটা হয়ে বিঁধেছিল, এখন সেটা সরে গেছে এবং তিনি সম্পূর্ণ ভারমুক্ত। মনে মনে ভাবলেন, এখন মূর্তি পূজারিদের জন্য শুধু ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রইল।

দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বিস্ফোরিত ধূলিকণার অন্ধকারে সবাই নিজেদের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। মোল্লা জানান আখন্দ গর্বিত এবং তার চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক ঝলমল করে ওঠে। তিনি ট্যাংকের উপর উঠে দাঁড়ালেন। সে সময় তার ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে কাষ্ঠহাসি ফুটে ওঠে। তিনি হাত দুটো পেছনে ভাঁজ করলেন। বাতাসে তার দীর্ঘ দাঁড়ি এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে এবং ঘাড়ের উপর শাল ঝুলছে।

বৌদ্ধমূর্তির উল্টোদিকের দিগন্তে সন্ধ্যাতারা ভেসে উঠেছে। তার অস্পষ্ট আলো এসে ঠিকরে পড়েছে ভাঙা নুড়িপাথরের গায়ে। পাহাড়ের মাঝে ফাঁকা জায়গার অন্ধকারে লক্ষ কোটি ধূলিকণার বৌদ্ধমূর্তি যেন মেঝেকে সফেদ করে তুলেছে।

একটা বুলডোজার দিয়ে বিধ্বস্ত মূর্তির পাথরের স্তূপ ভেঙে ফেলা হয়েছে। লুকোনোর জন্য কয়েকজন তালেবান শাবল দিয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাটির নিচে চাপা দিচ্ছে। তারা দারুণ খুশি। কেননা কাজ প্রায় শেষ এবং আমীর যে ফতোয়া দিয়েছিলেন, তারা সেই হুকুম পালন করেছে।

অত্যন্ত পরিশ্রমের এবং প্রতিযোগিতামূলক কোনো কঠিন কাজ সমাধান করার পর মনের ভেতর যেরকম স্বস্তির ভাব এসে মনকে প্রফুল্ল এবং শীতল করে তোলে, সে রকম একটা অনুভূতি তাদের চোখেমুখে হাসির খোরাক জোগায়।

কাজ শেষ করে তারা শাবল একপাশে সরিয়ে রাখে। তারপর মাথায় গোল করে পেঁচানো শাল খুলে মাথা এবং মুখের ধূলিকণা পরিষ্কার করে।

www.pathagar.com

ধূলিকণা আর মাটি লেগে তাদের মুখ, নাক এবং কান পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে। তাদের চেহারার দিকে তাকালে মনে হয় তারা প্রত্যেকে যেন এক একটা শিলামূর্তি। তাদের মধ্যে একজন অন্যদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণায় তোমাদের সমস্ত মুখ এবং চুল সাদা হয়ে গেছে। এখন তোমরা নিজেরাই মূর্তি হয়ে গেছ। তাই তোমাদেরও গুড়িয়ে দিতে হবে।' বলেই সে শব্দ করে হাসতে থাকে। অন্যরাও সেই হাসির সঙ্গে সুর মেলায়। কাছাকাছি নদীর পানিতে মাথা এবং মুখ ধোওয়ার জন্য একসময় তারা নদীর দিকে দৌড়ুতে থাকে।

ইতোমধ্যে রাত নেমেছে। চারদিকের সবকিছু ঢেকে গেছে নিবিড় অন্ধকারে। হিমেল হাওয়ার ঝাপটা এসে পাহাড় এবং পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে। পাহাড়ের যে জায়গায় বৌদ্ধমূর্তি ছিল, এখন ওখানে থকথকে গাঢ় অন্ধকার। তবে চারপাশের ফাঁকা জায়গায় বাতাস এসে রীতিমত ঘুরপাক খাচ্ছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে নদীর উল্টোদিক থেকে কেউ একজন বাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। একটুবাদেই আরো অনেক বাতির আলো দেখা যায়। ক্রমশ আলো বহনকারী লোকদের চাপা কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হতে থাকে।

মাথা এবং দাড়ি ধোওয়ার জন্য যুবক তালেবানরা নদীর পানিতে মুখ ডোবায়। নদীর পানি অত্যন্ত শীতল। তাই তারা বেশিক্ষণ মাথা ধুতে পারেনি। চটজলদি শাল দিয়ে মাথা মুছে নেয়। ধোওয়া-মোছার পরও তাদের সারা মুখে এবং মাথায় বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণা লেগে আছে, যেন কেউ তাদের মুখমণ্ডলে সাদা চুন মেখে দিয়েছে। একসময় তারা বিধ্বস্ত বৌদ্ধমূর্তির কাছে গুহার দিকে চলে গেল। এই গুহা হলো তাদের মূল ঘাঁটি। বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার জন্য অন্য জায়গা থেকে যে সব তালেবানরা এসেছে, এটা তাদেরও আস্তানা।

ঠাণ্ডায় যুবক তালেবানরা কাঁপছিল এবং তাড়াতাড়ি তারা গুহার ভেতর প্রবেশ করে। ভেতরের আবহাওয়া মোটামুটি উষ্ণ। গুহার দেয়ালে তেলের বাতি ঝুলানো। সেই বাতির আলোয় যখন তারা একে অপরের দিকে তাকায়, তখন সবাই ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণায় সবার সাদা মুখ দেখে কাউকে আলাদা করে চেনা যায় না। একে অপরের দিকে তাকিয়ে তারা দারুণ ভয় পেয়েছে এবং অবশেষে এক একজন করে গুহা থেকে বের হয়ে অন্য গুহায় চলে যায়। ইতোমধ্যে যেসব তালেবান গুহায় অবস্থান করছিল, তারা অতিথিদের দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে এবং দৌড়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। 'মূর্তি... মূর্তি...,' হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে

www.pathagar.com

বলল। তারা ক্রমাগত চিৎকার ও চেঁচামেচি করে বলছে যে কয়েকজন তালেবান মূর্তির রূপ ধারণ করেছে। অবিশ্বাস্য এ খবরটা অন্য তালেবানদের মধ্যে দাবানলের মতো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

বলবে, কি বলবে না—আতঙ্কিত তালেবানরা এই দোলাচলে দুলতে দুলতে একজন সাহস করে মোল্লা জানানকে বলল যে কয়েকজন তালেবান মূর্তির রূপ ধারণ করেছে।

'বাজে বকো না,' হাসতে হাসতে বলল মোল্লা জানান।

কয়েকজন তালেবান মোল্লা জানানকে বারবার এই বলে বোঝাতে চাইল যে ঘটনাটা বানোয়াট বা অর্থহীন নয়। আসলে সে সত্য কথা বলছে এবং কয়েকজন তালেবান সত্যি মূর্তির রূপ ধারণ করেছে।

'কাদের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে? কারা করেছে?' চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে মোল্লা জানান জিজ্ঞেস করলেন।

'ওরা মূর্তির রূপ ধারণ করেছে ... হ্যাঁ, কয়েকজন তালেবান...'

'তুমি কি বলতে চাও? কেমন করে একজন তালেবান মূর্তির রূপ ধারণ করতে পারে? অধার্মিকের মতো কথা বলো না।'

'কিন্তু ওরা বদলে গেছে। বিচূর্ণ মূর্তির ধুলিকণায় ওদের মুখ ঢেকে গেছে। মুখগুলো দেখতে অবিকল বিধ্বস্ত মূর্তির মতো।'

যে তালেবান এসে মোল্লা জানানকে দুঃসংবাদটা দিয়েছে, সে এখন রীতিমতো চিন্তিত এবং ভয়ে জড়োসড়ো। অবিশ্বাস্য এ খবর শুনে মোল্লা জানান আশ্চর্যান্বিত। আচমকা তিনি যে খাটিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, সেখান থেকে উঠে দাঁড়ালেন। যেখানে আরো অনেক তালেবান জড়ো হয়েছে, যুবক তালেবান তাঁকে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যায়। মোল্লা জানানকে আসতে দেখে কয়েকজন তালেবান উঠে চলে যায়। মোল্লা জানানের দৃষ্টি গিয়ে আটকে পড়ে চারজনের উপর, যারা মাঠে বসেছিল এবং হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় তাদের প্রত্যেককে এক একটা মূর্তির মতো দেখাচ্ছিল। কিছুতেই মোল্লা জানান নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না। এক মুহূর্তের জন্য তিনি ভাবলেন, হয়তো যুবক তালেবানরা নিজেরাই সারা মুখে চুন মেখে মূর্তি সেজে তার সঙ্গে মশকরা করছে।

'ঢের হয়েছে ... এটা কি ধরনের মশকরা?' রাগী স্বরে তিনি বললেন।

তালেবানদেরকে বালতি ভরে পানি আনার জন্য মোল্লা জানান আদেশ করলেন। যারা মূর্তির রূপ ধারণ করেছে, কাঁধের উপর থেকে শাল নিয়ে তিনি নিজের হাতে ওদের মাথা এবং মুখ পরিষ্কার করলেন। তবুও ওদের চোখেমুখে

www.pathagar.com

এবং সারা মাথায় সাদা চুন লেগে আছে। মনে হয় ওরা মুখোশ পরে আছে।

অলৌকিক এবং বিস্ময়কর ঘটনায় মোল্লা জানানের মুখের ভেতর সমস্ত থুতু শুকিয়ে গেছে, এমনকি দু'আঙুলের ফাঁকে তসবীর দানাও থেমে গেছে। মোল্লা জানান কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু তার জিহ্বা একটুও নড়ল না। তিনি তোতলাতে লাগলেন। তিনি জানেন না, আসলে কি বলতে চান। একসময় মোল্লা জানান জনতার ভীড় ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় অবিশ্বাসী মন নিয়ে তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মাঠের উল্টোদিকে দেখতে পেলেন কয়েকজন তালেবান তাকে অনুসরণ করছে। মাঠভর্তি সৈন্যবাহিনীর যন্ত্রপাতি পড়ে আছে এবং সেখানে অনেক মানুষের ভীড়। ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম ভর্তি গাড়িগুলো ফাঁকা জায়গায় একের পর এক সাজানো। তখনও চারপাশের খোলা হাওয়ায় গোলাবারুদের পোঁড়া গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শান্ত এবং সুন্দর এই রাতের আঁধারে ভয়ংকর রকম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

মোল্লা জানানের চোখেমুখে রাগের চিহ্ন ফুটে ওঠে এবং তিনি রীতিমতো বিপর্যস্ত। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং সবকিছুই স্পর্শ করছেন। কখনও কখনও তিনি ট্যাঙ্কের গায়ে সজোরে আঘাত করছেন। আবার অন্য সময় হাঁটু গেড়ে বসে তিনি মাটি থেকে খালি কার্টিজের খোসা তুলছেন। হালকা ভাবে তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করে এবং মাথা ঘুরতে থাকে। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, এমনকি তার মুখ থেকে কোনো কথাই বেরোচ্ছিল না। একসময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। যেসব তালেবানরা তার কাছাকাছি ছিল, সবাই দৌড়ে কাছে আসে। তারা মোল্লা জানানকে ধরাধরি করে গুহার ভেতর নিয়ে যায় এবং খাটিয়ায় শুইয়ে দেয়। সারারাত মোল্লা জানান সংজ্ঞাহীন এবং হতবাক ছিলেন। কখনও খানিকটা সময় তার চোখে ঘুম নেমে এসেছিল, আবার অন্য সময় তিনি সজাগ থেকেছেন। পরদিন তার শারীরিক অবস্থা কিছুটা ভালো এবং সহজেই তিনি চোখ মেলে তাকাতে পারছেন। তিনি এক গ্লাস পানি চাইলেন এবং খানিকটা পান করে ভাবতে শুরু করলেন। কয়েকজন তালেবান তার খাটিয়ার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওদের উপস্থিতি তার চিন্তায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। মোল্লা জানানের মস্তিষ্কের ভেতর যেসব চিন্তার ঘুণপোকা কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছিল, তিনি সে সব চিন্তার কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নিজেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেমন করে ওরা মূর্তির রূপ ধারণ করল?' গতরাতে তিনি অসুস্থতা বোধ করেছিলেন। তখন তিনি জেগে ছিলেন, নাকি

www.pathagar.com

ঘুমিয়ে ছিলেন, সেটা পুরোপুরি মনে করতে পারছেন না। একজন তালেবানের কাছে তিনি খবরাখবর জানতে চাইলেন। যুবক তালেবান বলল যে চারজন তালেবানের মূর্তির রূপ ধারণ করা ছাড়া তেমন বিশেষ কোনো খবর নেই।

মোল্লা জানান বুঝতে পারলেন গতরাতের স্বপ্নটা আসলে খুব খারাপ স্বপ্ন ছিল না। তবে তার আগের রাতের স্বপ্নটা ছিল সত্যি। তারপরেও তালেবানদের মূর্তির রূপ ধারণ করার চিন্তাটা তিনি তার মাথা থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছেন না। 'কেন ওরা এভাবে বদলে গেল?' তিনি ভাবলেন।

কয়েকজন তালেবান মোল্লা জানানকে বলল যে যারা মূর্তির রূপ ধারণ করেছে, তারা নদীর পানিতে ডুবিয়ে মাথা ধুয়েছে এবং ভালো করে মুখ ঘষে মূর্তির ধূলিকণা পরিষ্কার করতে চেয়েছে। কিন্তু ওরা তা করতে পারেনি। অন্যরা ভয়ে পানির কাছে যায়নি। কেননা ওরা পানি স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছিল। ওদের জন্য নদীর পানি বিষাক্ত হয়েছে। তাই ওদের মুখে এখনও ধূলিকণা লেগে আছে। মোল্লা জানান ভাবছিলেন, পানি দিয়ে যদি ধূলিকণা সাফ করতে না পারে, তাহলে কেমন হবে? পানির সমস্যা কি? কেন পানি...?

ভাবনার অথই দরিয়ায় মোল্লা জানান আকণ্ঠ ডুবে আছেন। এমন সময় এক তালেবান দৌড়ে এসে গুহার ভেতর প্রবেশ করে এবং ছোট একখণ্ড পাথর তার হাতে তুলে দেয়। মোল্লা জানান খুব কাছ থেকে পাথরটি উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে দেখলেন। পাথরটি দেখতে অবিকল আসল বড় বৌদ্ধমূর্তির মতো, যা ডিনামাইট দিয়ে গুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। যুবক তালেবান বলল যে স্তূপাকারে রাখা ভাঙা মূর্তির সবগুলো পাথরের টুকরো দেখতে এই ছোট পাথরের বৌদ্ধমূর্তির মতো।

মোল্লা জানান রীতিমতো বাকরুদ্ধ। তিনি কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিলেন না। শুধু অবাক বিস্ময়ে ছোট পাথরের বৌদ্ধমূর্তির দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকেন। যদিও আকৃতিতে মূর্তিটি ছোট, হয়তো হাতের সমান, কিন্তু দেখতে অবিকল আসল বড় বৌদ্ধমূর্তির মতো।

গুহার ভেতর যে সব তালেবানরা মোল্লা জানানকে ঘিরে রেখেছে, ওরা সবাই এক একজন করে ছোট মূর্তিটিকে নেড়েচেড়ে পরখ করে দেখল। ওদের চোখ ছানাবড়া। কোনো কিছু না বলে মোল্লা জানান আখন্দ তড়িৎ গতিতে গুহা থেকে বের হয়ে নুড়িপাথরের কাছে গেলেন। তিনি একটা নুড়িপাথর তুলে চোখের সামনে এনে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। এটা অবিশ্বাস্য যে এ পাথরটাও একটা ছোট বৌদ্ধমূর্তি। তারপর তিনি আরেকটা নুড়িপাথর তুললেন এবং সেটাও একটা বৌদ্ধমূর্তি।

www.pathagar.com

প্রত্যেকটা নুড়িপাথর হাতের সমান অথবা তার চেয়ে ছোট এক একটা বৌদ্ধমূর্তি।

মোল্লা জানান আখন্দ বিড়বিড় করে বললেন, 'এটা যাদু এবং প্রত্যেকটা নুড়িপাথরই এক একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু।'

বাকিরা সবাই বোবা দৃষ্টিতে বৌদ্ধমূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। সে সময় উদ্বিগ্নতার কয়েক টুকরো ধূসর মেঘ উড়ে এসে তাদের চোখেমুখে ছায়া ফেলে। তারা একে অপরের দিকে ট্যাঁরা চোখে তাকিয়ে আছে। তবে সরাসরি কেউ কারোর চোখের দিকে তাকায়নি। একসময় তাদের দৃষ্টি আটকে যায় মেঝের উপর।

আচমকা চারপাশ থেকে হট্টগোলের আওয়াজে সুনসান মৌনতার কাচ ভেঙে খানখান হয়ে যায়। চিৎকার-চ্যাঁচামেচির শব্দ শুনে তালেবানরা গুহা থেকে বের হয়ে আসে। মাঠের যেখানে অন্যেরা উচ্চস্বরে শোরগোল করছিল, তারা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। তুমুল উত্তেজনায় তালেবানরা দাঁড়কাকের মতো চিল্লাচিল্লি করে একে অপরকে অলৌকিক ঘটনার কথা বর্ণনা করছিল। সবাই একসঙ্গে কথা বলছিল, শুনছিল না কেউ। যারা এতক্ষণ অন্য গুহার ভেতর ছিল, তারা হৈচৈ শুনে হুড়মুড় করে গুহা থেকে বেরিয়ে নুড়িপাথরের ছোট মূর্তির স্তূপের দিকে দৌড়াতে থাকে। মোল্লা জানান এবং তার আশেপাশের তালেবানদের মুখে কোনো রা নেই। তারা রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা ভাবছে, যেহেতু বিশাল বৌদ্ধমূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে, এখন এসব ছোট ছোট বৌদ্ধমূর্তি দিয়ে কি করবে? এ ছাড়া বিশাল মূর্তির ধূলিকণায় যাদের মুখের আদল বদলে গেছে, এমনকি যারা মূর্তির রূপ ধারণ করেছে, তাদের নিয়ে কি করবে?

এ সময় ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে ওঠে। উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় মোল্লা জানান এবং অন্য তালেবানদের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। মোল্লা জানান কাবুল এবং কান্দাহারের উচ্চপদস্থ তালেবান নেতাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি তাদেরকে অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য ঘটনার পুরোটাই খুলে বলেন।

কমান্ডার আদেশ করলেন, তালেবানরা যেন অনেক দূরে কোথাও ধূলিকণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় যাতে কোনো ধরনের চিহ্ন না থাকে এবং নুড়িপাথরের টুকরোগুলো এমনভাবে মাটি চাপা দেয় যেন কেউ খুঁজে না পায়।

কমান্ডারের আদেশ অনুসারে মোল্লা জানান সমস্ত নুড়িপাথর এবং বৌদ্ধ মূর্তির ধূলিকণা ট্রাকে তোলার নির্দেশ দিলেন। বুলডোজার আর ট্রাক্টর দিয়ে

www.pathagar.com

বিধ্বস্ত মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ট্রাকে তুলে বিছিন্ন এলাকায়, নদীর ধারে, গিরিখাতে, উপত্যকায় এবং পাহাড়-পর্বতের ঢালুতে ফেলে দেয়।

কাজ শেষে মোল্লা জানান ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটাকে হেলানোর ভঙ্গিতে খাটিয়ার উপর বিছিয়ে দেন। সে সময় তার মস্তিষ্কের অন্দরে আগের দুশ্চিন্তা এবং পেরেশানীর ছিঁটেফোঁটা নেই। তিনি রীতিমতো ভারমুক্ত। যেসব তালেবান যুবক পরবর্তী নির্দেশনার জন্য গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তারা মোল্লা জানানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। তিনি শুধু 'উহ্' বা 'আহ্' করেছেন এবং স্মৃতির ফিতে টেনে সমস্ত ঘটনা রিওয়াইন্ড করে আরেকবার ভাবতে থাকেন।

দুপুরের দিকে মোল্লা জানান গুহা থেকে বের হয়ে অজু করে নামাজ আদায়ের জন্য তৈরি হলেন। ইতোমধ্যে তালেবানরা কাজ শেষ করেছে। কোথাও কোনো বুলডোজারের গরগর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। নিস্তব্ধতার মিহি চাদরে ঢেকে আছে বামইয়ান উপত্যকার চারপাশ। বিশাল আকাশের বুকে মনের সুখে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা। যদিও কোথাও সূর্যের আলো নেই, তবুও কেন জানি মনে হয় এ যেন কোনো রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। কোথাও উত্তাল বাতাসের দাপাদাপি নেই, তবে মৃদুমন্দ বাতাস মাটির গায়ে হালকা পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। আকাশে-বাতাসে, এমনকি আশেপাশের মাটির বুকে এক অপার শান্তিময় নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন ঝিম মেরে থাকে, গুহার ভেতরে মোল্লা জানান তেমনই থমথমে, শান্ত। একসময় তিনি চুপচাপ ধীর পায়ে বেরোলেন। কিন্তু তিনি তার দেহের ভেতর একধরনের মর্মরধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি মনযোগ দিয়ে শব্দটার উৎস খুঁজতে লাগলেন। নদীর তীরে পৌছানো পর্যন্ত শব্দটা ছিল। তারপর পলকেই শব্দটা থেমে যায়। নদীর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, পানি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এবং চিকচিক করছে। সেই পানিতে ফুটে উঠেছে হাজার হাজার বৌদ্ধমূর্তির ছবি। উপত্যকা পেরিয়ে বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণা নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেছে সাগরের বুকে। খাল-বিল, রাস্তা-ঘাট, শহর-গ্রাম, এমনকি তালেবানদের ঘাটি জুড়ে শুধুই ভাঙা মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। মোল্লা জানান একটি সরু নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। তিনি পানির দিকে তাকিয়ে দেখলেন পানি স্বচ্ছ এবং কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিভাবে এ পানি দূষিত হল, তা কিছুতেই তার বোধগম্য হলো না। কি ভেবে যেন তিনি পানি স্পর্শ করলেন। তিনি তার আঙুলের ডগায় মিহি ধূলিকণা দেখতে পেলেন। সে সময় তিনি মাথা থেকে

www.pathagar.com

পা অবধি একধরনের অলৌকিক শিহরণ অনুভব করলেন। রীতিমতো ভয় পেয়ে তিনি চটজলদি পানি থেকে আঙুল তুলে নিলেন এবং তড়িৎ গতিতে স্থান ত্যাগ করেন।

মোল্লা জানান আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেই, আবার ফুটফুটে চাঁদের আলোও নেই। কেমন যেন ধূসর জ্যোৎস্নায় ঢেকে আছে বিশাল আকাশ। দূরের সাদা মেঘ দেখে মনে হয় ওরা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। আসলে ওরা ধীর গতিতে শান্তিপূর্ণভাবে চলাফেরা করছে। যদিও পাখিরা উড়ছে না, কিন্তু ওরা ডানা মেলে আছে। কোথাও উড়ে যাচ্ছে না, এমনকি উড়ে যাবার কোনো উদ্যোগও নেই। তিনি স্বপ্নময় দৃশ্যের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

মোল্লা জানান উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছেন। ভাবনার অথই সাগরে তিনি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তার কোথাও যাবার কোনো তাড়া নেই।

অবশেষে তিনি গুহায় ফিরে এলেন এবং চুপচাপ কিছুক্ষণ একাকী বসে রইলেন। একসময় তিনি তসবী নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কিন্তু তসবীর গুটিগুলো পাথর হয়ে গেছে। মুহূর্তেই তার আঙুল অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে এবং তিনি গুটিগুলো নাড়াতে পারছেন না। তার আঙুলের ডগা বরফের মতো হিমশীতল। তিনি আঙুলের দিকে তাকালেন। আঙুলের মাথা চুনাপাথরের মতো সাদা হয়ে গেছে, যেন মূর্তিগুলোর হাতের আঙুলের মতো।

মোল্লা জানান মোটেও আশ্চর্যান্বিত হলেন না। কেননা ইতোমধ্যে তিনি এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা কয়েকবার দেখেছেন। লোকেরা এসে তাকে অবহিত করে যে চারজন তালেবানের মুখ মূর্তির রূপ ধারণ করেছিল, ওরা ক্রমশ সম্পূর্ণ পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। তালেবানরা ভয়ে দলে দলে এসে মোল্লা জানানের কাছে জানতে চাচ্ছে এ পরিস্থিতিতে তাদের কি করণীয় আছে।

মোল্লা জানানের মস্তিষ্ক ফাঁকা, আনমনা। তিনি বুঝতে পারছেন না কি বলবেন, এমনকি তিনি জানেন না এই সংকটময় মুহূর্তে তার কি করা উচিত কিংবা অন্যদের কি আদেশ করবেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি পুরোপুরি সবকিছু ভুলে গেছেন। তার নীরবতা দেখে মোল্লা কঁচি আখন্দ চিৎকার করে বলল, 'মোল্লা জানান, বলুন, আমরা এখন কি করব?'

মোল্লা জানানের কাছে কোনো উত্তর নেই। তিনি ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে রেখে চুপ করে রইলেন।

www.pathagar.com

মোল্লা কঁচি কান্দাহারে কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার বৃত্তান্ত জানালেন। তিনি বললেন কেমন করে চারজন তালেবান যোদ্ধা পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কমান্ডারের উত্তর সোজাসাপটা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'সব মূর্তি এবং যেখানে মূর্তির অস্তিত্ব আছে, সবকিছু নষ্ট করে ফেলো। মূর্তির প্রাণ আছে কি নেই, তাতে কিছু যায় আসে না। শীঘ্রই সব মূর্তি ধ্বংস করে দাও।'

মোল্লা কঁচি মোল্লা জানানকে ডেকে গুহার বাইরে নিয়ে এলেন। তিনি অন্য তালেবানদের উদ্দেশ্য করে কমান্ডারের নির্দেশ ঘোষণা করলেন, 'যত ধরনের পাথরের মূর্তি আছে, এখনই সবগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দাও।'

মুহূর্তেই উপস্থিত তালেবানদের মধ্যে উত্তেজনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। প্রত্যেকেই নিজেদের মতামত দিচ্ছিল। কেউ বিরোধিতা করে যুক্তি দিচ্ছিল এবং অন্যরা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি জানাচ্ছিল। কিন্তু আসলে দু'পক্ষের কেউ জানে না ঘটনার পরিণতি কি হবে। সে সময় কয়েকজন তালেবান দৌড়ে গিয়ে ইতোমধ্যে মূর্তি হয়ে যাওয়া তালেবানদের মাঠে নিয়ে আসে। মানব মূর্তিগুলো পাথরের মূর্তির মতো ভীষণ ভারী। তাদের আনতে কষ্ট হয়েছে। শুধু তাদের চোখের মনি নড়ছে এবং দেহের অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থবির। তারা প্রত্যেকেই যেন এক একটা বিশাল পাথর।

এ সব মানব মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ এবং সময় অপচয় না করে তালেবানরা শাবল এবং গাঁইতি দিয়ে মানব মূর্তিগুলোকে ভাঙতে শুরু করে। একসময় ওগুলো ভেঙে খানখান হয়ে যায়। মূর্তিগুলোর শরীর থেকে কোনো রক্ত ঝরেনি। ওদের দেহের ভেতর শুধু ধূলিকণা এবং ছাই, যা বাতাসে ওদের শরীরের মধ্যে জমা হয়েছে।

এক সময় মোল্লা জানান নিজের গুহায় প্রবেশ করেন। তখনও বাইরে মানবমূর্তি ভাঙার অবিরাম উৎসব চলছিল। পুনরায় তার কাছে খবর আসে যে অন্য কয়েকজন যুবক তালেবান পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। মোল্লা কঁচি তাদেরকেও ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন।

এ সব তালেবান যুবকদের মূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়া হয়তো তাদের শারীরিক গঠনের পরিবর্তন। মূর্তিগুলো ভাঙার পর কমান্ডারের প্রচণ্ড রাগ হলো এবং তিনি যারপরনাই ক্ষুব্ধ। তিনি আদেশ করেন যেন মোল্লা জানান আখন্দ যথাশীঘ্রই আমীরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা বয়ান করেন। কমান্ডারের আদেশ পালন করে মোল্লা জানান ভাড়া করা বিমানে চড়ে রওনা

www.pathagar.com

হলেন। তিনি হতচকিত এবং জানেন না পুরো ঘটনাটা আমীরের দরবারে কিভাবে উপস্থাপন করবেন।

সাদা মেঘের উপর দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। মোল্লা জানানের মনে হচ্ছিল প্রতিটি মেঘের টুকরো যেন এক একটা বৌদ্ধ মূর্তির রূপ নিয়েছে। বাতাসে মেঘগুলো উড়ে গিয়ে দূরের দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন মেঘ উড়ে এসে ভেসে বেড়াচ্ছে বিশাল আকাশের বুকে।

আকাশে মেঘের মূর্তি দেখতে দেখতে মোল্লা জানান ক্লান্তি অনুভব করেন। মাটিতেও হাজার হাজার বৌদ্ধমূর্তির কথা তার মনে পড়ে। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ এসে ঢেকে দেয় তার ভাবনার আকাশ। তিনি জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং আনমনা হয়ে গেলেন। একসময় ভয়ার্ত আঙুল আস্তিনের ভেতর লুকোলেন। তার ভয় হচ্ছিল, আঙুলটা হয়তো শক্ত পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

হলঘরের পর্দার সামনে মোল্লা জানানকে উপস্থিত করা হয়। পর্দার অপর পাশে রয়েছেন আমীর। মোল্লা জানান রীতিমতো উৎকণ্ঠিত এবং ভয়ে জড়োসড়ো। ক্রমশ তার সারা শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে। এটাই তার জীবনের প্রথম ঘটনা যে সশরীরে সে আমীরের এত কাছকাছি হতে পেরেছে। আমীরের কণ্ঠস্বর তিনি টেলিফোনে অনেকবার শুনেছেন। যদিও আমীরের কণ্ঠস্বর ভরাট এবং আতংকিত, কিন্তু তিনি মোটেও ভয় পাননি। অথচ এখন একধরনের ভীতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার সারা শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তিনি মাথা নিচু করে স্থিরদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মেঝেতে গালিচা বিছানো। দেয়ালে একটা তরবারি ঝুলছে। বাতাসে জানালার পর্দা দুলছে। তিনি টের পেলেন তার হাতের আঙুল ক্রমশ ভারি হয়ে আসছে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

একদিকে পর্দা সরিয়ে আমীর প্রবেশ করলেন। তিনি জায়নামাজে হাঁটু গেড়ে বসে নামাজ আদায় করলেন। আমীরকে সম্মান জানানোর জন্য মোল্লা জানান উঠে দাঁড়ালেন এবং আঙুলটা পুনরায় আস্তিনের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলেন। চারদিকে তাকিয়ে তিনি আমীরকে অভিবাদন জানানোর জন্য মুখ খুললেন। কিন্তু সালাম শব্দ উচ্চারণের বদলে আচমকা তার কণ্ঠনালী বেয়ে একধরনের অদ্ভুত আওয়াজ বেরোলো, 'এই সেরেছে... আমীর... বিচূর্ণ মূর্তির ধূলিকণা... আমীরের কপালেও... হায় আল্লাহ... শেষ পর্যন্ত আমীরেরও...।'

[গল্পসূত্র : 'বিচূর্ণ মূর্তির ধুলিকণা' গল্পটি জালমে বাবকোহির 'দ্য আইডল'স্ ডাস্ট'

www.pathagar.com

গল্পের অনুবাদ। 'দারি' ভাষা থেকে গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন অ্যান্ডার্স উইডমার্ক। ইংরেজিতে গল্পটি ২০১১ সালের মে সংখ্যা 'ওয়ার্ডস্ উইদআউট বর্ডার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : জালমে বাবকোহি কানাডা অভিবাসী একজন আফগান ছোটগল্প লেখক, কবি এবং টরেন্টো থেকে 'দারি' ভাষায় প্রকাশিত 'জারনেগার' ম্যাগাজিনের প্রকাশক। তিনি ১৯৫১ সালে আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের টেলিভিশন এবং রেডিওর শিল্প-সংস্কৃতি বিভাগে কাজ করেন। পরে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি টরেন্টোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আফগান রাইটার্স এসোসিয়েশনের প্রকাশনায় ১৯৮৮ সালে কাবুল থেকে তার প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'ঈদ'স্ ক্রিসেন্ট ফ্রম বিহাইন্ড দ্য উইন্ডো' প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সালে টরেন্টো থেকে তার দ্বিতীয় ছোটগল্প সংকলন 'বাটারফ্লাইস টেইক্ ফ্লাইট ইন দ্য উইন্টার' প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ হুসেইন মোহাম্মদী

দাশত্-ই লাইলি

দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজের মতো লোহার বিশাল কার্গো কন্টেইনারের ভেতর বাঘের মতো হালুম করে লাফিয়ে পড়ল ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাথার পাগড়ি দিয়ে ওরা আমাদের হাত ও পা বেঁধে রেখেছে। অন্ধকারে আমরা একজন আরেকজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি। যদিও বাইরে প্রখর রোদ, কিন্তু বন্ধ কন্টেইনারের ভেতর অন্ধকারে শুধু আমাদের জ্বলজ্বলে চোখের মনি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাইরের তীব্র রোদের উত্তাপে কন্টেইনারের ভেতরের গুমোট হাওয়া ভীষণ উত্তপ্ত।

সারাদিন ওরা আমাদের কিছুই খেতে দেয়নি। তবে যেসব উর্দিপরা সৈনিক মোটর সাইকেলে চড়ে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে আমাদের পাহারা দিচ্ছিল, বেশ অনেকক্ষণ আগে ওরা রুটি আর পানি দিয়েছিল। উর্দিপরা সৈনিকেরা আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের। এখন আমরা জারগানাগে আছি। গত দু'দিনে রোদের প্রচণ্ড তাপ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কুন্দুজ শহর ছেড়ে দেওয়ার পর আমরা যখন ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তখন ওরা খালি পায়ে উত্তপ্ত বালুর ওপর আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। রশি দিয়ে আমাদের এমন শক্ত করে বেঁধেছিল যে, আমরা একজন আরেকজনের গায়ের সঙ্গে চাপাচাপি করে থেকেছি এবং একটুও নড়াচড়া করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে যাদের কাছে কাদিফা (হাজীদের রুমাল) ছিল, সেগুলো মাথায় বাঁধার পর রোদের উত্তাপ থেকে নিষ্কৃতি পাই। তখন সূর্যের প্রচণ্ড তেজ ছিল। চাপাচাপিতে আমাদের এক জনের দেহ অন্যজনের সঙ্গে লেপ্টে আছে। সবার শরীর থেকে নির্গত গরম ভাপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আমরা শুধু কোনোমতে বসার মতো একটু জায়গা পেয়েছি। হাত-পা বাঁধা একজন আরেকজনের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে কয়েকটি রাশিয়ান কামাজ ট্রাক এসে পৌঁছে। আমাদের অনেককেই কয়েকটি ট্রাকে তোলে। সূর্যের প্রচণ্ড

www.pathagar.com

উত্তাপে কন্টেইনারের ভেতর আমরা রীতিমতো সিদ্ধ হচ্ছি। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কোনো কথা বলে না। তবে কেউ যদি কথা বলত, তবে আমরা কেউ কারোর কথা বুঝতাম না। ধর্মের জন্য শহীদ এবং জান্নাতবাসী হওয়ার বাসনা নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়েছি এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। এর আগে আমি দূর থেকে এসব কালো নর-পিশাচগুলোর একজনকে কুন্দুজে দেখেছি। ওরা অন্য দলে ছিল, আমাদের সঙ্গে ছিল না। রাতের বেলা উল্টোদিকের গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে ঠিকরে পড়েছে আমাদের উপর। রাতের হিম শীতে আমরা হি হি করে কাঁপতে থাকি। কারোর পক্ষে নড়েচড়ে বসার একবিন্দুও জায়গা নেই। আমরা যদি একচুলও নড়ি, তাহলে ওরা গুলি করে। আমরা ভয়ে রীতিমতো পাথরের মূর্তি হয়ে যাই। তখন খানিকটা কাঁপুনি থামে।

দ্বিতীয় দিনে আমাদের পালা। সবাইকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা কন্টেইনার আনা হয়। কয়েকজন সৈনিক 'সুজবেক-উজবেক' জাতীয় একধরনের মজানা ভাষায় ধ্বনি তুলতে তুলতে ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। একসময় ওরা আমাদের বাঁধন খুলে দেয়। ফার্সি ভাষায় আমি বললাম যে আমি ওদের দলে ছিলাম না। ওরা উজবেক ভাষায় গালিগালাজ করে আমাকে লাথি মেরেছে এবং রাইফেল দিয়ে বেদম মারধর করেছে। সৈনিকেরা আমাদের কাদিফা, কুর্তা, জুতা এবং পাগড়ি খুলে নেয়। তখন আমাদের পড়নে ছিল শুধু শার্ট এবং প্যান্ট। সবকিছু খুলে নেয়ার সময় কয়েকজন প্রতিবাদ করে কিছু বলেছে। কিন্তু আমি ওর কথার কিছুই বুঝিনি, এমনকি একটা শব্দের অর্থও জানি না। সৈনিকেরা আমাদের মাথার পাগড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধতে শুরু করে। আমাদের দলের সবাইকে প্রথম বাঁধে। তারপর একে একে সব দলের লোকজনকে বাঁধে। সবাইকে বেঁধে ওরা কামাজ ট্রাকে তোলে এবং অন্য কোথাও নিয়ে যায়। সেখানে নেয়ার পর আমি হলাম তৃতীয় ব্যক্তি, যার বাঁধন ওরা খুলে দিয়েছে। বাঁধন খোলার পরে একজন হ্যাঁচকা টানে পাগড়িটা ছিঁড়ে দু'টুকরো করে। অতঃপর এক টুকরো পাগড়ি দিয়ে আমার হাত বাঁধে এবং অন্য টুকরো দিয়ে পা বেঁধে উত্তপ্ত বালুর উপর ছুড়ে ফেলে। আমি আরেকবার কাকুতি-মিনতি করে বললাম যে আমি ওদের দলে নেই। আমি একজন আফগান। ইচ্ছে করে আমি ফার্সিতে বললাম যেন ওরা বুঝতে পারে। কিন্তু ওরা বোঝেনি। এবার আমি পশতুতে বললাম। ওরা আমার কথা কানে না তুলে অন্যদের হাত-পা বাঁধতে থাকে। উত্তপ্ত বালুর উপর আমি যেভাবে পড়েছিলাম, সেই একই অবস্থায় আছি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার

www.pathagar.com

মতো অন্যদেরও হাত-পা বেঁধে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে গরম বালুর উপর। তবে বিপুল দেহের কালো চামড়ার একজন হাত-পা বাঁধার সময় প্রতিহত করতে চাইছিল। আমার ধারণা, সে পবিত্র কোরান পাঠ করছিল। সৈনিকেরা লোকটার ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি লাথি দিচ্ছিল এবং রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করছিল। জোর জবরদস্তি করে ওরা লোকটার হাত পেছনে নিয়ে ওর নিজের পাগড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। তখনও লোকটা হাত-পা ছুড়ে বাঁধা দিচ্ছিল। তারপর সৈনিকেরা ট্রাক থেকে ধাক্কা দিয়ে আমার ঠিক পাশেই বালুর ওপর ফেলে দেয়। আঘাতের ফলে রক্তে ওর হাত এবং মুখ ভিজে গেছে। সে আগের মতোই চিৎকারের সুরে একটা কিছু বলছে। বোধহয় সে কোরান পাঠ করছে। সৈনিকেরা পরস্পরের সঙ্গে অচেনা সুজবেক-উজবেক ভাষায় কথা বলছে এবং বাদবাকি লোকগুলোর হাত পেছনের দিকে নিয়ে বাঁধছে। কন্টেইনারের লাল রঙের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একে অপরের দিকে তাকাই এবং পরমুহূর্তে আমাদের ভয়ার্ত দৃষ্টি সৈনিকদের মুখের উপর আটকে যায়। পাঁজাকোলা করে ওরা আমাদের এক একজনকে কন্টেইনারের ভেতর সজোরে ছুড়ে ফেলে। আমাকে কন্টেইনারের মেঝেতে ছুড়ে ফেলার পর আমি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে এক কোণায় চলে যাই এবং লোহার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসি। রোদের তাপে দেয়াল গরম। তবে এমন গরম নয় যে আমার পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই বাঁধা হাত-পা নিয়ে নড়েচড়ে বসার জায়গা করে নিচ্ছে। কিন্তু আমরা এত মানুষ যে একে অপরের উপর স্তূপ হয়ে আছি। আমার ছড়ানো পা দু'জন লোকের দেহের নিচে চাপা পড়েছে। আমি কিছুতেই পা ছাড়িয়ে আনতে পারছি না। যে লোকটাকে ওরা মেরেছে, সে আমার শরীরের উপর। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি পা দ'টি ছাড়াতে, কিন্তু পারছি না। আমি ওদের ধাক্কা দিই। লোক দু'জন আমার দিকে কটমট চোখে তাকায়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। একটু বাদে ওরা এমনভাবে নড়েচড়ে উঠল যেন দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এই ফাঁকে আমি ওদের শরীরের নিচ থেকে কোনোরকমে পা দু'টি টেনে বের করি। তারপর পা ভেঙে হাঁটু বুকের কাছে এনে দু'হাতে শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরি।

দরজা বন্ধ করার পর কন্টেইনারের ভেতর ঝুপ করে নেমে এল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমরা কিছুই দেখতে পারছি না। শুধু একে অপরের ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কোনোমতে আমি বাঁধা হাত পাগড়ির গিঁটের উপর রাখি, যেটা পায়ের গোড়ালিতে বেড়ির মতো বাঁধা ছিল, এবং সেটা

www.pathagar.com

খোলার চেষ্টা করি। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো গিঁটটা খুলে যাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে একধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায়। যে লোকটা এতক্ষণ ইতস্তত পায়চারি করছিল, তার দিকে আমি পলকহীন তাকিয়ে থাকি। সে এখন আমার পাশেই। তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, এমনকি আমার পায়ের সঙ্গে লেগে থাকা তার বুকের স্পর্শও অনুভব করছি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে লোকটার বুক উপরে-নিচে ওঠানামা করছে। সে হয়তো কোনো কিছুর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। লোকটি যেদিকে তাকিয়ে আছে, আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি দেয়ালে একটা অতি সূক্ষ্ম ফাটল গলিয়ে বাইরের এক চিলতে অস্পষ্ট আলো এসে ঠিকরে পড়েছে কন্টেইনারের ভেতর। সেই অস্পষ্ট আলোয় আমি চারপাশে, এমনকি উপরে-নিচে তাকাই। হঠাৎ দেখি আমার মাথার উপরে এক ইঞ্চিরও ছোট একটা ছিদ্র, যা হয়তো বুলেটের জন্য হয়েছে। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। দেয়ালের সঙ্গে আমার পিঠ লেগে আছে। উত্তপ্ত দেয়ালের উত্তাপে আমি রীতিমতো ঘামছি এবং বন্ধ কন্টেইনারের গুমোট হাওয়ায় আমার নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। সবাই নিশ্চুপ। কারোর মুখে কোনো টুঁ শব্দটি নেই। ঘামের দুর্গন্ধে কন্টেইনারের ভেতর ফাঁকা জায়গা ভরে আছে। অনেকদিন ধরে কেউ গোসল করতে পারেনি। ক্রমশ ভেতরের হাওয়া ভারী হয়ে আসে এবং আমি অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। কিছুক্ষণ বাদে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আরো গাঢ় হয় এবং আমি অনুভব করতে পারি, নিঃশ্বাসের অদৃশ্য ধোঁয়া গিয়ে আছড়ে পড়ছে কন্টেইনারের দেয়ালে। যে কোনো উপায়ে সবাই দেয়ালের গায়ে আঘাত করার চেষ্টা করছে, এমনকি মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত করছে। প্রত্যেকেই উচ্চস্বরে চেঁচামেচি করছে এবং ঘনঘন আঘাতের আওয়াজ আরো বেশি জোরে হয়ে চারপাশে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। বন্ধ কন্টেইনারের ভেতর নিঃশ্বাস টানতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি আর্তচিৎকার করি এবং জোরে জোরে দেয়ালে মাথা ঠোকাই, ব্যাং... ব্যাং। সবাই চিৎকার করছে। ওরাও হাত-পা এবং মাথা দিয়ে দেয়ালে এলোপাতাড়ি ধাক্কা দিচ্ছে।

ওরা গনগনে সূর্যের নিচে কন্টেইনারের ভেতর আর আমরা বাইরে দেয়ালের আড়ালে সরু ছায়ায়। আমাদের নজর কন্টেইনারের দিকে। ভেতরে ওরা চিল্লাচিল্লি করছে এবং দেয়ালে হয়তো মাথা দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করছে। আমরা যখন মাজার-ই শরীফ দখল করি, তখন ভয়ে এলাকার সবাই পালিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। শহরের রাস্তা-ঘাটে কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। অন্যান্য শহর দখলের পর আমাদের ভয়ে যেমন মানুষেরা ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকত, ঠিক তেমনই এ শহরের লোকজন ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। যদিও সময়টা ছিল গ্রীষ্মের শুরু, তবুও তখন অসহ্য গরম ছিল। আমি মাজার-ই শরীফের গরম উপলব্ধি করেছি। ওখানের গরম হলমান্দ এবং নিমরুজের চেয়েও ভয়াবহ। যারাই রাস্তায় বের হয়েছিল কিংবা যাদের জোর করে ঘর থেকে রাস্তায় আনা হয়েছিল, সবাইকে লোহার কন্টেইনারের ভেতর ঢুকিয়েছিলাম। প্রচণ্ড গরমে তারা সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল এবং চিৎকার করে অনুরোধ করেছিল যেন কন্টেইনারের দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে সময় আমরা দেয়ালের আড়ালে ছায়ায় বসেছিলাম। তবুও প্রচণ্ড গরমে আমাদের শরীর থেকে রীতিমতো ঘাম ঝরেছিল। রাস্তায় যাকেই পেয়েছি, সবাইকে জোর করে কন্টেইনারের ভেতর ঢুকিয়েছি। মাজার-ই শরীফের গনগনে সূর্য তখন আমাদের মাথার উপরে। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছিল, সূর্যও ততই নিস্তেজ হয়ে পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ছিল এবং ক্রমশ দেয়ালের ছায়াও মিইয়ে গিয়েছিল। এক পলকা বাতাস উড়ে এসে আমাদের ঘর্মাক্ত শরীরে একধরনের শীতল পরশ মেখে দেয়। একই জায়গায় বসে আমরা কন্টেইনারের ভেতরের লোকদের চেঁচামেচি শুনছিলাম। আমার সহযোদ্ধারা কেউ ভালো ফার্সি জানে না। তাই তারা নির্বোধের মতো ওদের কথাবার্তা শুনছিল। প্রত্যেকেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। একসময় আমার পাশের লোকটি তেলাওয়াত করার জন্য পবিত্র কোরান শরীফ খোলে। তেলাওয়াতের ফাঁকে সে কোরান শরীফের পৃষ্ঠা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে আশেপাশে ইতিউতি তাকায়, এমনকি হাতের আঙুল দিয়ে দীর্ঘ দাড়িতে আলতো করে পরশ বুলায়। পুনরায় তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করার আগে সে বেশ কিছুক্ষণ কন্টেইনারের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে আমিই একমাত্র উপস্থিত ব্যক্তি যে ওদের কথা বোঝে। ওরা চিৎকার করে বলছে, 'তোরা নিষ্ঠুর, পাষাণ। দরজা খুলে দে। ভেতরে আমরা গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, শরীর পুড়ে যাচ্ছে।' আমার পাশে যে লোকটি কোরান তেলাওয়াত করছিল, সে একবার মাথা তুলে তাকায়। আগের মতোই দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে সে বলল, 'ওরা এখনও বেঁচে আছে।' বলেই পুনরায় কোরান শরীফ তেলাওয়াতে মগ্ন হয়। তখনও অন্য লোকগুলো চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল।

আমরা জোরে চিৎকার করছি। যদিও কন্টেইনারের ভেতর এখনও আমরা

www.pathagar.com

পুরোপুরি সিদ্ধ হইনি, তবুও চিৎকার করে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য আকুলভাবে অনুরোধ করি। আমাদের সবার কণ্ঠস্বর সপ্তমে। আমি কিছুতেই ওদের কথাবার্তা বুঝতে পারিনি। একমাত্র আল্লাহ্ মালুম, ওরা কোন ভাষায় কথা বলছে। আমি ওদের ভাষা জানি না। আমার মনে হল, কেউ যেন কোরান তেলাওয়াত করছে। হয়তো আমার শোনার ভুল হতে পারে। প্রত্যেকে কন্টেইনারের দেয়ালে সজোরে আঘাত করছে। আঘাতের শব্দ শুনে মনে হলো ওরা হয়তো জোরে মাথা ঠুকছে। একসময় নিঃশ্বাস নিতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তবুও আমিও ওদের মতো দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করি। তখন অনবরত আঘাতের শব্দ আমার মস্তিষ্কের ভেতর অনুরণিত হতে থাকে। জোরে জোরে মাথা ঠোকার জন্য আমার মাথা ফেটে রক্ত বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেয়ালে আঘাত করা বন্ধ করি। আঙুলের ডগায় রক্ত নিয়ে আমি রক্তের উষ্ণ এবং লবণাক্ততার স্বাদ নিই এবং পরমুহূর্তে তা টুপ করে গিলে ফেলি। মাথা ফেটে চুঁইয়ে পড়া রক্ত আমার ঠোঁট ভিজিয়ে দিয়েছে। আমি জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটি। যেই মাত্র আমার গলা রক্তে ভিজে গেছে, তখন মনে হলো আমি আরো বেশি জোরে চিৎকার করতে পারব। আমি চিৎকার করি... চিৎকার করি... চিৎকার করি... এবং ভীষণ জোরে চিৎকার করি...। একসময় আমার দম ফুরিয়ে এলে আমি শান্ত হই। তখন অন্যদের কণ্ঠস্বরও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। অন্ধকারে আমি চারপাশে তাকাই। সেই লোকটা এখনও কোরান তেলাওয়াত করছে। এটা একমাত্র ভাষা, যা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি স্মরণ করতে পারছি না, সে কোন সূরা তেলাওয়াত করছে। যে আমার পায়ের উপর পড়েছিল, তার শরীর নিস্তেজ। তবে আমি বুঝতে পারছি, অন্ধকারে তার ফাঁকা দৃষ্টি একটা নির্দিষ্ট কিছুর উপর স্থির হয়ে আছে। হঠাৎ আমার মনে পড়ে আলোর বিচ্ছুরণরেখা এবং দেয়ালের ফাটল। সে যেদিকে তাকিয়ে আছে, আমিও সেদিকে তাকাই। এখনও কন্টেইনারের ভেতর গুমোট হাওয়ায় সেই বিকীর্ণ আলোর রশ্মি কাঁপছে। তৎক্ষণাৎ আমার মনের মধ্যে এক চিলতে আশার রঙিন আলো জ্বলে ওঠে। কালক্ষেপণ না করে আমি উপরের দিকে তাকাই। তখন কিছুতেই মনে হচ্ছিল না যে উত্তপ্ত দেয়ালের তাপে আমার পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, এমনকি সে সময় আমি তৃষ্ণার কথাও বেমালুম ভুলে যাই। কোনোমতেই আমার স্মরণে আসছিল না কতক্ষণ এই অন্ধকারে বন্ধ কন্টেইনারের ভেতর আটকে আছি। নিঃশ্বাস নিতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পলকে ভাবলাম, হয়তো কোনোরকমে মাথাটা উপরের দিকে তুলে ফাটলের কাছে মুখ নিয়ে বাইরের খোলা বাতাস টেনে নিতে পারি। যদি মাথা তুলে

www.pathagar.com

দাঁড়াই, তাহলে পুনরায় বসার মতো বিন্দুমাত্র শক্তি নেই আমার শরীরে। যাহোক, এমন কোনো সুবিধামতো জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না, যেখানে আমি অনায়াসে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারি। ওরা সেই কখন আমাদের কন্টেইনারের ভেতর ঢুকিয়েছে... কতক্ষণ হবে? সত্যি, আমি জানি না, এমনকি আমার মনেও নেই কখন ঢুকেছি। হয়তো এখন সকাল, হয়তো বা বিকেল। ঠিক জানি না। তবে বাইরে ভীষণ গরম। যে সব সৈনিকেরা আমাদের চারপাশে কড়া পাহারা দিয়েছিল, ওদের তিন চাকার মোটর সাইকেলের শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ওদের দু'জনের পড়নে ছিল ছদ্মবেশী পোষাক। আমরা যাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, ওরা ছাড়া আর কোনো সৈনিক আসেনি। আমি বাঁধা হাত দিয়ে বেড়ি পরা পা বুকের কাছে টেনে আনি। আমার আঙুলে কোনো বোধশক্তি নেই। তবুও আমি পা বাঁধা পাগড়ির গিঁট স্পর্শ করি। কিন্তু অবশ আঙুল আমি নাড়াতে পারি না। হাতটা জোরে ঝাঁকি দিই, যাতে আবার রক্ত সঞ্চালন হয়। আরেকবার আমি মাথার উপরের ফাটলের দিকে তাকাই। হয়তো পাশের লোকটা এখনও সে দিকেই তাকিয়ে আছে। এখন আমি তার ভারি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি দাঁড়াতে চাই। নিজেকে একটু উপরের দিকে তুলি। মনে হয় আমি ফাটলের কাছে মুখ নিয়ে সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারব। হয়তো বাইরের বাতাস...। কিন্তু কিছুতেই আমি বাইরের বাতাস টানতে পারছি না। বরং একই জায়গায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকি এবং অনেক কষ্ট করে দুর্গন্ধময় বাতাস টেনে নিচ্ছি। এ অবস্থায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস নেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। কেননা সবার ঘর্মাক্ত শরীরের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে গেছে। শব্দ করে সবাই ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে এবং নিঃশ্বাসের শব্দ কন্টেইনারের ভেতর অক্সিজেনবিহীন ফাঁকা জায়গায় ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের হাত বাঁধা এবং আমাদের সবার পায়ে বেড়ি। কেউ একটুও নড়াচড়া করতে পারছি না। কারোর এমন কোনো উৎসাহ কিংবা শক্তি নেই যে সে নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে একটু সরিয়ে নেয়। আমার হাত যদি বাঁধা না থাকত, তাহলে আমি একটু নড়েচড়ে বসতাম। আমি যখন আঙুল দিয়ে হাতের গিঁট স্পর্শ করি, তখন আমার মনে হলো আমি গিঁট খুলতে পারব। একটু একটু করে গিঁট আলগা করতে থাকি। ওই বেজন্মাগুলো এমন শক্ত করে বেঁধেছে যে কিছুতেই গিঁট খোলা যাচ্ছে না। আমার পা দু'টিও শক্ত করে বাঁধা এবং আমি পায়ে কোনো বোধশক্তি পাচ্ছি না। কন্টেইনারের মেঝেতে পায়ের তালু লেগে আছে। প্রচণ্ড গরমে পা পুড়ে যাচ্ছে। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে আমি আর বসে থাকতে পারছি না। দেয়াল

www.pathagar.com

থেকে পিঠ সরাতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। আশেপাশে নড়াচড়া করার মতো এক বিন্দুও খালি জায়গা নেই। মাথা ও মুখমণ্ডল থেকে রীতিমতো ঘাম ঝরছে এবং নিঃশ্বাসের বাতাসও ভীষণ উত্তপ্ত। বুঝতে পারছি যেখানে হাতের আস্তিন ছিঁড়ে গেছে, সেখানে আমার হাত কেউ জিহ্বা দিয়ে চাটছে। আমি তাকিয়ে দেখি পাশের লোকটা জিহ্বা দিয়ে আমার হাতের নোনা ঘাম চেটে নিচ্ছে। মুহূর্তে আমিও ভীষণ তেষ্টা অনুভব করি। হাত চাটা বন্ধ করে সে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কিন্তু আমি তার চোখের মনিতে কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলাম। মুখে কিছু বললাম না। পুণরায় সে জিহ্বা দিয়ে আমার হাত চাটতে থাকে। আমি মুখের ভেতর চারপাশে একবার জিহ্বা ঘুরিয়ে আনি। আমার মুখ শুষ্ক এবং খড়খড়ে। আমি আরো বেশি তৃষ্ণায় কাতর হই। কেননা আমার শুকনো মুখের ভেতর জিহ্বা আটকে গেছে। আমি লোকটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনি। তখন সেই এক চিলতে আলোর রেখা আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আবারও আমি পায়ের গিঁট খোলার চেষ্টা করি। ক্রমশ গিঁটটা আলগা হচ্ছে এবং আমি পা দু'টি সামান্য এদিক-ওদিক নড়াতে পারছি। আস্তে আস্তে গিঁটটা আরো বেশি আলগা করি এবং একসময় সেটা সম্পূর্ণ খুলে যায়। চটজলদি আমি পা থেকে মোড়ানো পাগড়ি খুলে ফেলি। এখন অনায়াসে দাঁড়াতে পারি। ভাঁজ করে পাগড়িটা পাছার নিচে রাখি। তখন আমি একটু আরাম বোধ করি। তারপর ঘুরে পাগড়ির উপর হাঁটু গেড়ে বসি এবং এক পর্যায়ে হাঁটুর উপর ভর করে উঠে দাঁড়াই। কন্টেইনারের দেয়ালের ফাটলে মুখ স্পর্শ করি এবং হা করে ফাটলের উপর ঠোঁট রাখি। উত্তপ্ত দেয়ালের স্পর্শে আমার ঠোঁট পুড়ে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ আমি ঠোঁট সরিয়ে নিই। তখনও নিঃশ্বাস টানতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। যাক না ঠোঁট পুড়ে—তবুও আমি আবার দেয়ালের ফাটলে ঠোঁট রাখি এবং ফুসফুসের ভেতর খানিকটা বাইরের হাওয়া টেনে নিই। তাতে আমার শরীর জুড়িয়ে যায়। আমি দেহের ভেতর একটুখানি শীতলতার স্পর্শ অনুভব করি। একসময় কন্টেইনার চলতে শুরু করে। কন্টেইনারের দুলুনিতে হঠাৎ লোহার দেয়ালের সঙ্গে আমার মাথা ধাক্কা খায়। যখন পুনরায় ফাটলে ঠোঁট রাখতে যাই, তখন আবারও প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগে। এবার আমি নাকে ও মুখে ব্যথা পাই। মনে হলো দাঁতগুলো সব ভেঙে গেছে। আমার মুখের ভেতর রক্তক্ষরণ হয়। আমি টুপ করে মুখের ভেতরের রক্ত গিলে ফেলি এবং জিহ্বা দিয়ে দাঁত স্পর্শ করি। তারপর থু করে ভাঙা দাঁতের টুকরোগুলো নিচে ফেলে দিই। এ সময় আমি আরেকবার জিহ্বায় উষ্ণ এবং লবণাক্ত রক্তের স্বাদ অনুভব করি।

www.pathagar.com

পুনরায় আমার কণ্ঠনালী শক্তি ফিরে পায়।

যদিও কন্টেইনারের ভেতর অন্ধকার ঘাপটি মেরে আছে, তবুও আমি তাকিয়ে দেখি সবাই রীতিমতো হাঁফাচ্ছে। মনে হলো তারা একে অন্যের ঘাম চেটে নিচ্ছে। হঠাৎ একজন তার ভারি শরীরটাকে আমার পায়ের উপর টেনে আনে। তখন আমার পা কন্টেইনারের মেঝের সঙ্গে চাপ লাগে। আমি হাঁটুতে ভীষণ ব্যথা অনুভব করি। মাথা ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখতে চাইলাম। বিশাল দেহের লোকটা কাত হয়ে আমার পায়ের উপর শুয়ে পড়েছে। আমি তাকে সরে যেতে বললাম। অন্ধকারে তার চোখ জ্বলজ্বল করছিল। সে আমার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করল না। বরং বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময় সে কিছু একটা বলল, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। কেননা সে পশতু ভাষায় বলেনি। আল্লাহ্ মালুম, লোকটা কোথা থেকে এসেছে। মনে হলো আমার পা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। লোকটার বুকের সঙ্গে আমার পা লেগে আছে। সে একটু নড়ে উঠল। আমি মুক্ত হতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। তার বিশাল শরীরের চাপে আমার হাঁটুতে ব্যথা করছে এবং কন্টেইনারের দেয়ালের সঙ্গে আমার উরু ভীষণভাবে চেপে আছে। ঘামে ভেজা প্যান্ট থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আমি মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাই। এতক্ষণ যে লোকটার গায়ের ওপর বসেছিলাম, সে পাশে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন সেই জায়গাটা দখল করে নেয়। লোকটা পেছনে সরে যেতে পারছে না। কন্টেইনারের দুলুনিতে আমরা একবার সামনে যাচ্ছি, আরেকবার পেছনে আসছি। সবাই জোরে জোরে হাঁফাচ্ছি। সবার শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারি শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। গরমে পুড়ে যাওয়া ঠোঁট ফাঁক করে আমি ফুসফুসের ভেতর ঘর্মাক্ত বাতাস টেনে নিই। কিন্তু তখনও শ্বাস নিতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমি হাঁটু গেড়ে বসি এবং কন্টেইনারের উত্তপ্ত দেয়ালের সঙ্গে বুক ঠেকাই। তখন দেয়ালের সঙ্গে ঘর্মাক্ত সার্টের সংযোগের ফলে সার্ট থেকে বাষ্প বের হয়। আমি বুঝতে পারি বাষ্প ক্রমশ জোরে নির্গত হচ্ছে। আমার পায়ে কোনো বোধশক্তি নেই। যে লোকটার উপর বসে আছি, তার কোনো নড়াচড়া টের পাচ্ছি না। আমার পা নাড়াতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। কন্টেইনারের প্রতিটি দুলুনির তালে তালে লোকটার শরীর আমার পায়ে চাপ দিচ্ছিল। ব্যথায় আমি কাতরাতে থাকি। একসময় বাঁধা হাত নিয়ে লোকটাকে সজোরে কয়েকটা ঘুসি দিই। মাথাটা সে সামান্য সরিয়ে আর্তনাদ করে কিছু একটা বলল। কিন্তু আমি তার ভাষা বুঝি না। আমার হাত প্রচণ্ড ব্যথা করছে। তাই আমি তাকে ঘুসি দেয়া বন্ধ করি। জোরে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য পুনরায়

www.pathagar.com

আমি ফাটলের কাছে মুখ এনে ফুটোর সঙ্গে ঠোঁট রাখি। ঘুসি খেয়ে লোকটার সারা মুখ রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে। সে একটু সরে বসে। আরেকবার কন্টেইনারের দেয়ালের সঙ্গে আমার মুখ, নাক আর চিবুক ধাক্কা খায়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুত তরঙ্গের মতো একটা তীব্র ব্যথা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আমি শ্বাস নিই এবং মুখের ভেতরের রক্ত গিলে ফেলি। আবার ফুটোর কাছে মুখ রাখি। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাইরের ধূলোবালি ঢুকে আমার ফুসফুস ভরিয়ে দেয়। আমি কাশতে শুরু করি। পায়ের রক্ত এতক্ষণে নিশ্চয় জমাট বেঁধে গেছে। কেননা আমি পায়ে কোনো ব্যথা টের পাচ্ছি না। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। আমি বুঝতে পারছি, যে লোকটার পেছনে হাত বাঁধা, সে জিহ্বা দিয়ে আমার পিঠের ওপর ঘর্মাক্ত সার্ট চাটছে। আরেকবার আমি ফুটোতে মুখ রেখে নিঃশ্বাস নিই। ধূলোবালিতে আমার কণ্ঠনালী ভরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ফুটো থেকে মুখ সরিয়ে এনে কাশতে থাকি। আমার মুখের ভেতর মিহি বালুকণা। এ মুহূর্তে এটা কোনো ব্যাপার নয়। প্রয়োজন হলে বালুকণা গিলে ফেলব। কিন্তু আমার ফুসফুস জ্বলে যাচ্ছে।

নিঃসন্দেহে এটা সুখবর যে এখন শরৎকাল এসেছে। কিন্তু তখন মাজার-ই শরীফে ছিল গ্রীষ্মকাল এবং আমরা ছায়ায় বসে থাকতাম। আসলে গরম আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। তবে এখন আর কন্টেইনারের ভেতর গরম অনুভব করার বোধশক্তি নেই। অনেকক্ষণ আগে আমাদের কন্টেইনারের ভেতর ঢুকিয়েছে। আমি কন্টেইনারের দেয়াল স্পর্শ করি। সঙ্গে সঙ্গে গরমে আমার হাত পুড়ে যায়। যারা দেয়ালের ছায়ায় বসেছে, আমি তাদের দিকে এক নজর তাকাই। তারা পাগড়ি দিয়ে বাতাস করছে। আগে যে লোকটি কোরান তেলাওয়াত করছিল, সে এখন দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। একসময় সে জানতে চাইল, সবাই এখনও বেঁচে আছে কি না।

এখনও আমরা বেঁচে আছি। হয়তো শরৎকাল আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। কন্টেইনারের ভেতর গোঙানির শব্দ ক্রমশ থিতিয়ে আসছে। যে লোকটা আমার পায়ের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমি তার বুকের উপর বসেছিলাম, তার হৃদস্পন্দনের কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। বোধহয় সে আর নিঃশ্বাস টানতে পারছে না। পাশের যে লোকটা একসময় আমার শরীরের ঘাম চেটেছিল, আমি তার কাঁধে হাত রাখি। তারপর তার হাত ধরি। সে একবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে

www.pathagar.com

নিয়ে পড়ে যায়। যার বুকের ওপর আমি বসেছিলাম, তাকে শক্ত করে ধরি। আমি আর পারছি না। আমার শ্বাস টানতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। যেহেতু লোকটার নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তার নিথর দেহটা প্রচণ্ড ভারি লাগছে। আমার হাঁটু কন্টেইনারের দেয়ালের সঙ্গে চেপে আছে। ফলে আমি একটুও নড়াতে পারছি না। ক্রমশ শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। একসময় শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। ফোসকা পড়া ঠোঁট আবার সেই ফুটোতে রেখে বাইরের গরম এবং ধূলোবালি ভর্তি বাতাস ফুসফুসের ভেতর টেনে নিই। আবার সেই কাশি। আমি অনবরত কাশতে থাকি। কন্টেইনারের ভেতর দুর্গন্ধময় বাতাসে ঘূর্ণায়মান কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একটু পরে কাশি কমে এলে পুনরায় আমি শ্বাস নেয়ার জন্য ফুটোতে মুখ রাখি। যে করেই হোক, আমাকে বাঁচতে হবে। অন্যদের মতো আমি কিছুতেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে পারি না। অবশ্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমি বাঁচতে চাই। কন্টেইনারের ভেতর এক ফোঁটাও বাতাস নেই। ফুটোতে মুখ রেখে আমাকে শ্বাস নিতে হবে। কিন্তু আমার ফোসকা পড়া ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। হায় আল্লাহ্, আমি এখন কি করব? আমার ঠোঁট জ্বলে যাচ্ছে। মুখ শুকিয়ে কারবালা। যদি আমার মুখের ভেতর এক ফোঁটাও থুতু থাকত, যদি আগের মতো মুখের ভেতর রক্ত থাকত, যদি...। আমি হাত এবং মুখ দিয়ে কন্টেইনারের উত্তপ্ত দেয়াল চেপে ধরি। তাতে গরমে চুলের ভেতর মাথায় ঘামের ফোঁটা জমে। একসময় সেই ঘাম কপাল বেয়ে চুঁইয়ে পড়ে চোখের ভেতর। উত্তপ্ত নোনা ঘামে চোখ ভীষণ জ্বালা করছে। হায় আল্লাহ্! আমার চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করছে জোরে দেয়ালে আঘাত করে অনুনয়-বিনয় করে সৈনিকদের দরজাটা খুলে দেয়ার জন্য বলি। সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। শীঘ্রই আমারও একই অবস্থা হবে এবং আমিও ওদের মতো চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যাব। হায় আল্লাহ্! আমার কণ্ঠস্বর থেমে গেছে। এখানে এখন এমন কেউ নেই, যে ওদেরকে দরজা খুলে দিতে বলবে? শেষ শক্তি দিয়ে আমি বাঁধা হাতেই লোহার দেয়ালে শব্দ করি, এমনকি জোরে জোরে মাথা ঠুকি। হয়তো ওরা শুনতে পাবে। আমার মাথা যেন শক্ত পাথরে তৈরি। আমি দেয়ালে আমার পাথরের মাথা ঠুকছি। মাথা ঠোকার শব্দ বন্ধ কন্টেইনারের চার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে অনুরণিত হতে থাকে।

আমি শুনতে পাচ্ছি ওরা কন্টেইনারের দেয়ালে ঘুসি মারছে এবং পা দিয়ে লাথি দিচ্ছে। সম্ভবত ওরা জোরে জোরে মাথা ঠুকছে। আমি দেয়ালের পাশে এক

www.pathagar.com

চিলতে জায়গায় বসে আছি। আমার মতো অনেকেই দেয়ালের পাশে সরু জায়গায় বসে কিল, ঘুসি ও লাথির শব্দ শুনছি। আমাদের মাথার ওপরে মাজার-ই শরীফের গনগনে সূর্য। লোকগুলো হাত-পা এবং হয়তো মাথা দিয়ে দেয়ালের গায়ে ক্রমাগত দুমদাম শব্দ করে যাচ্ছে। ব্যাং... ব্যাং... ব্যাং...। এ সরু জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যখনই ফুটো গলিয়ে আসা বাতাসের টের পাই, তখনই আমি চরম আনন্দে সেটা উপভোগ করি এবং আমার ভীষণ ভালো লাগে।

ইতোমধ্যে কন্টেইনারের দেয়াল অনেকটা শীতল হয়ে এসেছে। দেয়ালের ফুটো গলিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে আমার ফুসফুসে ঢুকে প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কন্টেইনারের ভেতরের পুতিগন্ধময় এবং ভ্যাপসা বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং আমি আর ঘামছি না। তবে শরীরে শুকনো ঘামের উপস্থিতি টের পাচ্ছি, এমনকি গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকা পোশাকের নিচে নোনা ঘামের বিন্দু বিন্দু কণা উপলব্ধি করতে পারছি। মনের মধ্যে ক্ষণিকের ভালোলাগা এবং শীতল বাতাস আমার প্রাণে নতুন করে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। কেন জানি মনে হয়, আমি বেঁচে যাব।

কন্টেইনার এখন বেশ মন্থর গতিতে চলছে। এখনও আমার পা লোকটার নিথর দেহের নিচে চাপা পড়ে আছে। তবে কন্টেইনারের মৃদু দুলুনিতে আমি পায়ে কোনো ব্যাথা অনুভব করতে পারছি না। আমার শরীর খানিকটা শীতল হয়েছে এবং আমি আগের মতো তৃষ্ণার্ত নই। তবুও জিহ্বা দিয়ে ফোসকা পড়া ঠোঁট চাটি এবং ঠোঁটের আশেপাশে শুষ্ক রক্তের স্বাদ অনুভব করি। একটু আগে দেয়ালের ফুটো দিয়ে যে টিমটিম আলো আসছিল, তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় আমি দেয়ালের ফুটোতে মুখ রাখি। ফোসকা পড়া ঠোঁট দেয়ালের স্পর্শে এসে আমার ভেতরজগতে এক অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি করে। আমি বুক ভরে বাতাস টেনে নিই। বারবার একই ভাবে বাইরের শীতল হাওয়া ফুসফুসের ভেতর টানি। তখন আমার বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে মনের মধ্যে আরো বেশি শক্ত করে বাসা বাঁধে। ইতোমধ্যে হয়তো বাদবাকি সবাই মরে গেছে। কেননা তাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি কেবল বাইরের চলন্ত গাড়ির চাকার গরগর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জিজ্ঞেস করি, কেউ কি এখনও বেঁচে আছে কি না। আমি শুধু আমার শুষ্ক কণ্ঠস্বরের ভেতরে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পাই। শব্দটা মুহূর্তেই কন্টেইনারের ভেতর গুমোট হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কয়েকবার আমি জিজ্ঞেস করি, 'কেউ কি বেঁচে আছে? তোমরা

www.pathagar.com

কি এখনও বেঁচে আছো? এখানে কি কেউ বেঁচে আছে? কেউ... ।'

কন্টেইনারের উল্টোদিকের এক কোণা থেকে কারোর দুর্বল এবং শুষ্ক গলার স্বর ভেসে এল, যা কিছুতেই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। গভীর কোনো চৌবাচ্চায় ঢিল ছুড়লে যেমন দূরের কোথাও থেকে ভেসে আসা শব্দের মতো অস্পষ্ট শোনায়, এই শব্দটাও অনেকটা সেরকম। সম্ভবত লোকটা অন্য কোনো ভাষায় বলছে। হাঁফানির শব্দের মতো কণ্ঠস্বর। একটু পরে কন্টেইনার জুড়ে নেমে আসে নিস্তব্ধতার কালো চাদর। ঠাণ্ডা লোহার দেয়ালের সঙ্গে আমি মাথা চেপে ধরি এবং আমার সারা শরীরে শীতল পরশ নেমে আসে। মাঝেমাঝে দেয়ালের ফুটো দিয়ে এক ঝলক আলো এসে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। ক্রমশ আমি একটু একটু শীত অনুভব করি। কন্টেইনারের ভেতর ঘামের এবং সবার শ্বাস-প্রশ্বাসের বিদঘুটে গন্ধ অনেকটা কমে গেছে। শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকা আমার কাপড়-চোপড়ও ইতোমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ক্লান্তি ও অবসাদে শরীর আর চলছে না। পারদের মতো ভারি ঘুম আমার চোখের পাতায়। আমি ঘুমুতে চাই। যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাহলে খুবই ভালো হবে। কেননা ঘুমের ভেতর সবকিছু ভুলে যাব, এমনকি কিছুই টের পাব না। না, না, আমি ঘুমোব না। কিছুতেই না। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাহলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাব। যত বেশিবার ফুটোয় মুখ রেখে ফুসফুসে নিঃশ্বাস নিতে পারি, আমার জন্য তত ভালো। অবশ্যই আমাকে বাঁচতে হবে। আমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে। অবশ্যই ... অবশ্যই ... অবশ্যই ... ।

আবারো শ্বাস টানতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ফুটোতে ঠোঁট রেখে আমাকে শ্বাস নিতে হবে। প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে ধূলোবালির মিহি কণা ঢুকছে। আমি জিহ্বার নিচে বালির কণা টের পাচ্ছি। ঠাণ্ডা বাতাস আমাকে ক্রমশ শীতল করে দিচ্ছে। আমার ঘুম আসছে। আস্তে আস্তে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। না, আমি ঘুমাব না। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাহলে আমি ঠাণ্ডায় মরে যাব। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরমে ভুগেছি। অন্যরা গরমে সিদ্ধ হয়েছে, এমনকি অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু আমি, আমি ঠাণ্ডায় মারা যাচ্ছি। ঠাণ্ডা আমাকে মেরে ফলবে। যে ফুটোটা এতক্ষণ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটাই এখন আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আমি অস্থিমজ্জায় টের পাচ্ছি। মনে হয় আমি যেন দাশত্-ই লাইলিতে আছি। দাশত্-ই লাইলি ... দাশত্-ই লাইলি ... দাশত্-ই লাইলি ... ।

শেবিরগানে আসার পর আমাদের কন্টেইনার থেকে বের করে সমতল

www.pathagar.com

ভূমিতে জড়ো করা হয়। আমরা জানি না কোথায় যাব কিংবা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। আমরা যেদিন শেবিরগান দখল করি, তার কয়েকদিন পরে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। চতুর্দিক থেকে আমাদের লক্ষ্য করে শত্রুরা এলোপাতাড়ি গুলি করে। শহর সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না এবং আমরা জানি না কোথায় পালাতে হবে। আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে দিগ্বিদিক গাড়ি চালিয়েছি। শেষ পর্যন্ত ঢালুতে কোনো এক জায়গায় পালাতে সক্ষম হই। গাড়ি এতো বেশি গতিতে চালিয়েছি যে আসলে বুঝতে পারিনি আমরা কোথায় যাচ্ছি।

ইতোমধ্যে রাত নেমে এসেছে এবং আমরা এখনও গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। একসময় আমরা কোনো এক সমতল ভূমিতে আমাদের আবিষ্কার করি। রাতের বেলা বিশাল মরুভূমির খোলা জায়গায় ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। আমাদের কারোর কাছে কাদিফা নেই যে আমরা সেটা দিয়ে নিজেদের জড়াব। যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন ওরা চতুর্দিক থেকে আমাদের উদ্দেশ্য করে গুলি করে। আত্মরক্ষার্তে আমরা পিছিয়ে যাই এবং প্রাণের ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দৌড়ে গাড়িতে উঠি। প্রচণ্ড শীতে আমরা গাড়ির পেছনের সিটে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকি। ড্রাইভার ভীষণ জোরে গাড়ি চালিয়ে শহর পেরিয়ে আমাদের এই মরুভূমিতে নিয়ে আসে। হেডলাইট বন্ধ ছিল। তাই আমরা কিছুই খেয়াল করতে পারিনি। এক সময় গাড়ি থেমে যায়। ড্রাইভার নেমে ডিজেলের পাত্র বের করে। আমরা বুঝে গেছি, গাড়িতে তেল নেই। রাগে-ক্ষোভে ড্রাইভার ডিজেলের পাত্র মাটিতে ছুড়ে ফেলে। খালি পাত্র মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হয় এবং একসময় সেই শব্দ থেমে যায়। বাধ্য হয়ে আমাদের গাড়িতেই রাত কাটাতে হয়। ভয় আর শীতে আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি। আমাদের সতর্ক চোখ সবদিকে নজর রেখেছিল। পালা করে আমরা পাহারা দিয়েছি। খুব ভোরে সূর্য ওঠার পর আমরা মাটিতে গাড়ির চাকার ছাপ লক্ষ্য করি। একটা চাকার ছাপের উপর অনেকগুলো চাকার ছাপ। আসলে আমরা চক্রাকারে ঘুরেছি।

চারপাশের আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। কোন দিকে যাব—এই নিয়ে আমরা যখন সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে দুলছি, তখন আমাদের মধ্যে একজন সোৎসাহে চিৎকার করে ওঠে, 'এটা দাশত্-ই লাইলি ... দাশত্-ই লাইলি...'। এই জায়গা সম্পর্কে সে আরো বলল যে এ মরুভূমিতে অনেক মানুষ পথ ভুলে হারিয়ে গেছে এবং অবশেষে মারা গেছে। ড্রাইভার, কমান্ডার এবং যে কয়জন গাড়ির ভেতরে বসেছিল, তারা গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে। আমরা যারা গাড়ির পেছনের সিটে ছিলাম, তৎক্ষণাৎ সবাই লাফিয়ে নিচে নেমে

www.pathagar.com

তাদের অনুসরণ করি। আমাদের কাঁধের পেছনে রাইফেল। ক্রমশ তেতে ওঠা সূর্যের উত্তাপ উপেক্ষা করে আমরা এগোতে থাকি। কিন্তু আশেপাশে কোথাও কোনো রাস্তা খুঁজে পাই না। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে আমরা রীতিমতো পুড়ে যাচ্ছি। একসময় রাইফেল এবং কার্তুজের বেল্ট খুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলে হালকা হই। আমরা শুধু নিজেদের শরীর নিয়ে পথ চলছি। আমি জানি না, কতক্ষণ ধরে আমরা দাশত্-ই লাইলির ধু ধু মরুভূমিতে এলোপাতাড়ি ঘুরছি। একসময় পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি দশ বারো জনের মধ্যে একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। অনেক পেছনে দু'জন ক্লান্ত-অবসন্ন শরীর কোনোরকম টেনে টেনে হাঁটছিল, হঠাৎ তারা ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। আরো পেছনে একজন শুষ্ক বালুর ওপর মুখ থুবরে পড়ে আছে।

খুব বেশি দূরে নয়, একসময় আমি সামান্য দূরে রাস্তা দেখতে পেলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে একরকম টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়াই। মধ্য দুপুরের সূর্যের কড়া রোদে আমার মাথা রীতিমতো ঘুরছে। আমি ধপাস করে দাশত্-ই লাইলির উত্তপ্ত বালুর ওপর পড়ে যাই। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আমি একটা কামাজ ট্রাকের ভেতর শুয়ে আছি। কয়েকজনের তির্যক দৃষ্টি সরাসরি আমার উপর। 'ওর জ্ঞান ফিরেছে, চোখ মেলে তাকিয়েছে,' ওদের মধ্যে একজন বলল। আমার দিকে সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ফার্সিতে আমি অনুনয়-বিনয় করে ওদের কাছে পানি চাইলাম। কিন্তু ওরা ফার্সি কিংবা পশতু ভাষার লোক নয়। ওরা উজবেক। ওদের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। আমি ওদের ভাষা বুঝি না। ওরাও আমার কথা বোঝে না। যতই আমি ওদের বোঝাতে চাই না কেন, আমি এসব বন্দিদের দলে নেই। আমি একজন আফগান। কিন্তু কিছুতেই ওরা আমার কথা বোঝে না।

এখন আবার আমি দেখতে পাচ্ছি কন্টেইনারের সরু ফুটো দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ এসে ভেতরের দূষিত বাতাসে থির থির করে কাঁপছে। কন্টেইনারের ভেতরটা খুব দ্রুত গরম হচ্ছে, প্রথমে দেয়াল, যেখানে আমি ঠোঁট চেপে রেখেছিলাম এবং পরে বাতাস, যা মৃতদের শরীরের দুর্গন্ধে ভরা। তবুও আমি ফুসফসে বাতাস টেনে নেয়ার জন্য পুনরায় উত্তপ্ত দেয়ালের ফুটোতে মুখ রাখি এবং আমার ঠোঁট আবারো পুড়ে যায়। কন্টেইনারের প্রচণ্ড দুলুনিতে লোহার দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমার দাঁত ভেঙে যায় এবং গতকালের মতো শ্বাসের সঙ্গে ধূলোবালি এবং মিহি কণা আমার ফুসফুসে ঢুকে পড়ে। আমি কাশতে থাকি। এত জোরে কাশি আসছে যে যেকোনো সময় কাশির সঙ্গে

www.pathagar.com

পেটের নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে আসতে পারে। হায় আল্লাহ্, তাহলে আমিও মারা যাচ্ছি। গরমে আমার শরীর এবং পরনের কাপড় ঘামে ভিজে যাবে এবং আবার শ্বাস টানতে কষ্ট হবে। না, আমার শরীরে এমন তরল পদার্থ নেই, যা এই পুতিগন্ধময় বাতাসের থেকে খারাপ হবে। কন্টেইনারের ভেতরে মৃতদের ঘামের তীব্র গন্ধ, বমির দুর্গন্ধ, এমনকি কারোর হাগুর গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যদি পাশের লোকটা একবার আমার ঘর্মাক্ত দেহ চাটত, তাহলে বুঝতাম যে সে বেঁচে আছে। কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। নিদেন হলেও যদি সেই লোকটা, যার ভাষা আমি বুঝিনি, কিংবা সেই লোকটা, যে আমার পায়ের ওপর পড়েছিল, বেঁচে থাকত, তাহলেও বুঝতাম আমি ছাড়া অন্য কেউ বেঁচে আছে। আমি আশেপাশে কারোর কোনো উপস্থিতি টের পাচ্ছি না। এখন আমার সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু। তবে এখনও আমি কন্টেইনারের দুলুনি উপলব্ধি করতে পারছি। হঠাৎ একটা লাশের ওপর পড়ে যাই। আমি এক ইঞ্চিও নড়তে পারছি না। এ ছাড়া নিঃশ্বাস নেয়ার মতো কোনো বাতাস নেই, এমনকি দাঁড়িয়ে দেয়ালের ফুটোতে ফোসকা পড়া ঠোঁট রেখে বাইরের ধূলোবালি ফুসফুসের ভেতর টেনে নেয়ার মতো কোনো উৎসাহ কিংবা শক্তি নেই। মৃত মানুষের শরীরের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে আমি শুয়ে আছি এবং হাঁটু দিয়ে কন্টেইনারের দেয়াল ঠেলছি, নাকি দেয়াল আমার হাঁটু ঠেলছে ...। আমি কিছুই বুঝি না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি অনুভব করতে পারছি কেউ আমাকে হালকাভাবে দুলুনি দিচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সরু আলোর রশ্মি ফুটো গলিয়ে একবার ঢুকছে, আবার ঢুকছে না। আমি একবার আলোর বিচ্ছুরণ দেখি, আবার দেখি না। আসলে আমি কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। একসময় কেউ আর আমাকে দুলুনি দিচ্ছে না। দূরে মানুষের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ওগুলো কথাবার্তা কি না, ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো আমার ভুল হতে পারে। আলোর কোনো শব্দ নেই, অথচ এখন আছে। হঠাৎ তীব্র আলো এসে ঠিকরে পড়ে কন্টেইনারের ভেতর। আমার চোখ রীতিমত ঝলসে ওঠে। একটু পর আমি বুঝতে পারলাম যে কয়েকজন লোক আমাকে পা ধরে মেঝের ওপর পড়ে থাকা লাশের পাশ দিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের কথাবার্তার আওয়াজ পাচ্ছি এবং ওরা উজবেক ভাষায় কথা বলছে। ওরা আমাকে কন্টেইনারের বাইরে নিয়ে আসে। হঠাৎ পায়ে আমি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি, যা আগে কখনও টের পাইনি। আমার ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে। যদিও আমার বুঝতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, তবুও কেন জানি মনে হলো শব্দটা

www.pathagar.com

অনেকটা ঢিল ছোঁড়া কোনো গভীর কূপ থেকে ভেসে আসা শব্দের মতো অনেক দূরের। আমাকে উপুড় করে শোয়ায়। আমার চোখের ভেতরে ধূলোবালি প্রবেশ করে। আমি বুঝতে পারি, আমাকে উত্তপ্ত বালির ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। কেননা আমার শরীরের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া আমি গরম বাতাস উপলব্ধি করতে পারছি। আগে চোখেমুখে যে ঘাম ঝরেছিল, রোদের তাপে এখন তা শুকিয়ে গেছে। মাথার দীর্ঘ কোঁকড়ানো চুলের জন্য আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে ঠিকই বুঝতে পারছি, আমার দৃষ্টির সীমানায় একটা কিছু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কয়েকজন উজবেক সৈনিকের পা আমার শায়িত দেহের কাছে থেমে আছে। একসময় ওরা পা দিয়ে আমাকে সজোরে লাথি মারে। তারপর আমাকে পা ধরে টানতে থাকে। কোনোমতে আমি আলতো করে একবার চোখ মেলি, আবার বন্ধ করি। আমার চোখে সবকিছু ঝাপসা লাগে। পুনরায় আমি সৈনিকের পা দেখতে পেলাম। মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে আমার দু'চোখ ভরে গেছে এবং ভীষণ জ্বালা করছে। মনে হয় আমি এখনও দাশত্-ই লাইলিতে আছি। একজন এসে আমাকে গরম বালির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে একটা গর্তের ভেতর ছুড়ে ফেলে। আমি নরম মাটির স্পর্শ অনুভব করি। মনে হচ্ছিল আমি এখনও কন্টেইনারের ভেতর আছি। কেননা যে লোকটা আমার হাঁটুর ওপর পড়ে গিয়েছিল এবং পরে আমি তার মাংশল শরীরের ওপর বসেছিলাম, এখন আমি অনেকটা সেই অবস্থায় আছি। আমার চোখে ধূলোবালির কোনো জ্বালা নেই এবং আমার চিবুক একজনের বাঁধা হাতের ওপর নির্ভার বিশ্রাম নিচ্ছে। একটু বাদেই একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম, কিন্তু বলতে পারব না কোন ধরনের গাড়ি। পুনরায় আমার পায়ের ওপর অন্য আরেকজনের শরীরের ওজন উপলব্ধি করি। আমি মুখ হা করে শ্বাস নিতে চাইলাম, কিন্তু তার বদলে মাটি ঢুকে আমার মুখ ভরে গেল। আমি চোখ মেলে তাকাই। কিন্তু চোখের পাতা আর বন্ধ হয় না। আমার চারপাশে শুধু মাটি, মাটি আর মাটি, মাটি ... মাটি ... মাটি ...।

[**গল্পসূত্র :** 'দাশত্-ই লাইলি' গল্পটি মোহাম্মদ হুসেইন মোহাম্মদীর 'দাশত্-ই লাইলি' গল্পের অনুবাদ। 'দারি' ভাষা থেকে গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ড. অ্যান্ডার্স উইডমার্ক। ইংরেজিতে গল্পটি ২০১১ সালের মে সংখ্যা 'ওয়ার্ডস্ উইদআউট বর্ডার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং সমালোচক মোহাম্মদ হুসেইন মোহাম্মদী ১৯৭৬ সালে আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি সপরিবারের ইরানের অভিবাসী হন। সেখানে মাস্টার ডিগ্রি অর্জনের পর প্রডাকশন

www.pathagar.com

ডিরেক্টর হিসেবে ইরানের ব্রডকাস্টিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন। ১৯৯৭ সাল থেকে তিনি ছোটগল্প এবং সাহিত্য সমালোচনা লিখতে শুরু করেন। তার গল্পের মূল বিষয় আফগানিস্তানের যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা, হত্যা, অত্যাচার, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং মৌলবাদী তালেবানদের আত্মঘাতী বোমা হামলার নিষ্ঠুর কাহিনী। এ পর্যন্ত তার চারটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 'দ্য রেড ফিগস্ অব মাজার' গল্প সংকলনের জন্য তিনি ২০০৪ সালে ইরানের সম্মানিত 'গলশিরি অ্যাওয়ার্ড' এবং 'ইস্পাহান লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। এছাড়া ২০০৯ সালে তিনি 'ওব্লিভিঅ্যান' গল্প সংকলনের জন্য 'অ্যাওয়ার্ড অব ক্রিটিকস্ অব দ্য ইরানীয়ান প্রেস' অর্জন করেন। তার গল্প ফরাসী এবং ইটালিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি তার প্রথম উপন্যাস 'স্যাড' প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি জন্মভূমি আফগানিস্তানে ফিরে এসে কাবুলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আসেফ সোলতানজাদে

পেশা

ঠিক সাতটা বেজে দশ মিনিট।

যুবকটি ঘড়ির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনে। প্রত্যেকদিন সকালের মতো আজো সে ধোপদুরস্ত পোশাক পরেছে এবং তার হাতে ব্রিফকেস। অফিসে যাবার জন্য সে তৈরি হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সে আরেকবার প্রশান্ত চোখে ঘরের চারপাশ দেখে নিল। এই ঘরটা তার কাছে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু আচমকা সেই পুরোন চিন্তাটা তার মস্তিষ্কের ভেতর জেগে ওঠে। সে কি আবার ফিরে আসতে পারবে এই ঘরে? সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতর দারুণ কষ্টের এক চিনচিনে ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে। সাবধানে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে এবং ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে। সেই সময় সে ভাবতে থাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কখন ঘর থেকে বেরিয়েছ, তখন সে কি বলবে?

আজ গেটের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় বুড়ো দারোয়ান নেই। কিন্তু গেটের কাছে চেয়ারে বসে বুড়োর বিড়ালটা আলস্যে আড়মোড়া ভাঙে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে বিড়ালটা ঘুম জড়ানো চোখ মেলে বিরক্তির সঙ্গে যুবকটির দিকে তাকায়।

প্যান্টের পকেটে যুবকটির হাত ঢোকানো। বিড়ালকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'আজ তোর জন্য কিছুই নেই।'

দেয়ালে ঝুলানো ঘড়িটা টিক টিক করে বেজে চলেছে। গেটের কাছে বুড়ো দারোয়ান নেই। তাই সে যুবকটিকে জিজ্ঞেস করতে পারছে না, এখন ক'টা বাজে। যাকগে, পরে বুড়ো দারোয়ান রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে সময় জেনে নেবে।

যুবকটি যখন রাস্তায় পা রাখে, তখন তার মনে হলো কেউ যেন আড়চোখে তাকিয়ে তাকে দেখছে এবং তখন সে নিজেকে রীতিমতো বস্ত্রহীন ভাবল। দোকানের কাছে পৌঁছে সে সার্টের আস্তিনের ভেতর হাতঘড়ি আড়াল

www.pathagar.com

করে অন্য দিনের মতো উচ্চকণ্ঠে দোকানিকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন ক'টা বাজে?'

'একটা ঘড়ি কিনে নিন,' সন্দেহের দৃষ্টিতে দোকানি বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে বলল।

'আমি জানতে চাই আসলে কখন আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি, যেন ...।' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সে এক পলক হাসল।

সতর্ক চোখে তাকিয়ে দোকানি বলল, 'আপনি কখন ঘর থেকে বেরিয়েছেন, তাতে আমার কি?'

'অফিসে যাচ্ছি। তাই জানতে চেয়েছি এখন সময় কত।'

'সোয়া সাতটা বাজে।'

'না, সাতটা বেজে তের মিনিট।'

'আপনি যদি সময় জানেন, তাহলে অযথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'মনে রাখার জন্য।'

দোকানির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য যুবকটি অপেক্ষা না করে অফিসের দিকে পা বাড়ায়। এখন সে কিছুটা ভারমুক্ত। তবুও সে মনে মনে ভাবতে থাকে যদি ওরা জিজ্ঞেস করে, কখন তুমি ঘর থেকে বেরিয়েছ? যাক, নিদেন হলেও একজন তো সাক্ষী থাকল। কিন্তু যদি কেউ জানতে চায়, দোকানীকে তুমি কি বলেছ? তাহলে সে কি বলবে? জবাবে সে বলবে, সে দোকানিকে সময় জিজ্ঞেস করেছে। তোমার কি কোনো ঘড়ি নেই? তার হাতঘড়ি আছে, কিন্তু ...। কিন্তু কি? হয়তো তুমি দোকানির সঙ্গে অন্য বিষয়ে আলাপ করছিলে? ওর সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক?

সেই মুহূর্তে নিঃশব্দে যুবকটির মনের ভেতর একধরনের ভয় ঢোকে। তখন সে মাথার ওপর হেলিকপ্টারের বিকট শব্দ শুনতে পেল। সে আকাশের দিকে মাথা তুলে হেলিকপ্টার দেখতে চাইল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। হয়তো ইতোমধ্যে ওটা চলে গেছে, নতুবা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর শুধু ইথারে আওয়াজটাই রয়ে গেছে। একটা বাড়ির তিন তলার জানালায় তার দৃষ্টি আটকে যায়। জানালার পেছন থেকে কোনো এক নারী কিংবা তরুণীর অদৃশ্য ছায়া রাস্তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে। মনে মনে যুবকটি ভাবল, অবশ্যই সে যুবতী এবং লাল পোষাকে তাকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে।

যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে, কেন তুমি জানালার দিকে তাকিয়েছিলে? তখন সে কি জবাব দেবে? অই নারী বা তরুণীর সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক? তুমি কি ওকে চেনো? ও কি করে?

www.pathagar.com

যুবকটি জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে মাথা নিচু করে চিন্তিত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করে। সে কেবল চলমান পথচারীদের পা দেখতে পাচ্ছিল। পথচারীদের জুতা এবং প্যান্ট দেখে সে অনায়াসে বলতে পারে কে পুরুষ বা কে মহিলা, কে যুবা কিংবা কে বুড়ো। এ ছাড়া পথচারীদের হাঁটার ভঙ্গি দেখে তাদের জীবিকা সম্পর্কে সে একটা স্বচ্ছ ধারণা করতে পারে, এমনকি তাদের নাম এবং কখন, কোথায়, কাকে দেখেছে, অনায়াসে তা-ও সে বলে দিতে পারে। সে জানে কোনদিন কাদের দেখেনি। সেই নির্দিষ্ট দিনে কারোর সঙ্গে সাক্ষাত নাহলে সে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। হয়তো কিছু একটা...।

যুবকটি একসঙ্গে অনেক পায়ের শব্দ শুনতে পেল। কাছাকাছি শব্দ আসতেই একজনের এক পা তার দৃষ্টির সীমানায় এসে ধরা পড়ে। নিশ্চয় লোকটি যুদ্ধে আহত হয়েছে। কিন্তু কোথায়?

এখনই তরুণী আবার জানালার পাশে এসে দেখা দেবে। যুবকটি হাঁটার গতি মন্থর করে। সে শুনতে পাচ্ছে সুরেলা পদধ্বনি ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে। পায়ের শব্দে তার উৎকণ্ঠার পারদ একবার বাড়ছে, আবার পরমুহূর্তে নেমে যাচ্ছে। যখন তারা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন যুবকটি এক জোড়া পা দেখতে পেল। তার বুকের ভেতর ধুকপুকানি বেড়ে যায়। যেই হোক না কেন, তাতে তার কিছু যায় আসে না। মেয়েটি হয়তো তার দিকে তাকিয়ে আছে। যদি ওরা জিজ্ঞেস করে... ঠিক আছে, ওরা যা খুশি জিজ্ঞেস করুক। মেয়েটির কাছে সে অনেক কিছু। তাই মেয়েটির দিকে তাকানোর তার অধিকার আছে এবং সে মাথা ওপরে তুলে তাকায়। এই সেই আকাঙ্ক্ষিত নারী। তাদের যখন দৃষ্টি বিনিময় হয়, তখন মেয়েটি শব্দহীন হাসির পরাগ ছড়িয়ে দেয় তার ঠোঁটের ফাঁকে। যুবকটির ঠোঁট আলতো করে সামান্য কেঁপে ওঠে। তার পাশ কেটে মেয়েটি রাস্তার শেষ সীমানায় চলে যায়। মেয়েটি চলে যাওয়ার পরও চারপাশের বাতাসে মৌ মৌ করছিল পারফিউমের সুগন্ধি।

যদি ওরা জানতে চায়, তোমার সঙ্গে কি মেয়েটির পরিচয় হয়েছিল? জবাবে সে কি বলবে? না, মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় হয়নি। তাহলে মেয়েটি কেন হেসেছিল? আমি জানি না। তবে মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে ছিল। না, ওরা তা দেখতে পাবে না।

যত চেষ্টাই করুক না কেন, যুবকটি মাথা তুলে সরাসরি তাকাতে পারেনি। মেয়েটি তার সামনে দিয়ে চলে যাবার পরেও পারফিউমের আকুল করা সুগন্ধ রাস্তার আশেপাশের খোলা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। যদিও ভিন্ন পথে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সোজা পথ ধরে হাঁটতে থাকে। ঘরবাড়ির পাশ

www.pathagar.com

কেটে আঁকাবাঁকা সরু পথে যেতে পারত। এ সব সরু পথ অনেকটা ছোট নালার মতো, যা একসময় বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। বড় রাস্তায় অসংখ্য গাড়ির বহর এবং চলমান মানুষের কোলাহল। ভীড়ের মাঝে নিজেকে অপরিচিত ভাবার এক অলৌকিক আনন্দ তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রাখে। এখানে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। এখন সে মুক্ত।

কিন্তু ওরা যদি জিজ্ঞেস করে, কেন তুমি ওখানে গিয়েছিলে? তখন সে কি বলবে? ওখানে হয়তো কেউ ছিল যাকে তুমি চেনো? তার পরিচয় কি?

যুবকটি বড় রাস্তায় এসে দু'পাশে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। আশেপাশের আওয়াজ শুনে সে বুঝতে পারে তাকে ডান দিকে ঘুরে কয়েক শ' মিটার হেঁটে বাস স্টপে পৌঁছতে হবে। সে তড়িৎ গতিতে বাম দিকে তাকায়।

কোনোদিন সে লক্ষ্য করেনি এই রাস্তাটা কোথায় শুরু হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। যদিও বাড়িতে টেবিলের দেরাজে শহরের একটা মানচিত্র রয়েছে এবং সেই মানচিত্র দেখে সে রাস্তার খুঁটিনাটি সব জানে, কিন্তু বাস্তবে রাস্তা সম্পর্কে তার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অফিস থেকে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি পৌঁছে প্রায় প্রতিদিনই সে মানচিত্র নিয়ে বসে। টেবিল ল্যাম্পের আলোর নিচে মানচিত্র খুলে সে মনে মনে শহরের বিভিন্ন সড়ক পথে হাঁটাহাঁটি করে। এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় যায় এবং অবশেষে সে চৌরাস্তার মোড়ে এসে থামে। কখনও সে সিনেমা কিংবা নাটক দেখে এবং অন্য সময় লাইব্রেরিতে ঢুকে পত্রপত্রিকা পড়ে। ফেরার পথে পানশালায় ঢোকে। অবশেষে সে অবসন্ন শরীর নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। তখন তার খাওয়ার কোনো রুচি থাকে না। সে ক্লান্ত শরীরটাকে সোফার উপর এলিয়ে দেয়। অফিস শেষে ঘরে ফেরার পথে আজ সে দোকান থেকে একটা ঠাণ্ডা স্যান্ডউইচ কিনে এনেছে, কিন্তু এখন সেটা খাওয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই। কাল সকালে বাসি স্যান্ডউইচ বুড়ো দারোয়ানের বিড়ালকে খাওয়াবে। তখন বিড়ালটা কৃতজ্ঞতায় একবার আড়চোখে তাকাবে। এ সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাম দিকে কেন তুমি তাকিয়েছিলে? যদি ওরা জিজ্ঞেস করে, তবে উত্তরে সে কি বলবে? ঠিক আছে, সে বলবে দম নেয়ার জন্য বাম দিকে তাকিয়েছিল। ইদানিং তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাঝেমধ্যে বুকের ভেতর নিঃশ্বাস আটকে যায়। তার কারণ হয়তোবা রাস্তার যানবাহনের দূষণ কিংবা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হজম হচ্ছে না। হয়তো তুমি কারোর জন্য অপেক্ষা করছিলে? না, আমি কারোর জন্য অপেক্ষা করিনি।

www.pathagar.com

চটজলদি যুবকটি ডান দিকে মোড় নেয়। পুনরায় সে মাথা নিচু করে, যাতে রাস্তায় চলমান কারোর চোখাচোখি না হয়। ওদের দিকে তাকাচ্ছ কেন? হয়তো তুমি ওদের চেনো? আমি ওদের দিকে তাকাইনি এবং কাউকেই আমি চিনি না।

বাস স্টপে অনেক মানুষ অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় মশগুল। কেউ কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। মনে হয় আলাপ করার মতো কোনো বিষয় নেই। যুবকটি আবার হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেয়ে ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে থাকে। প্রত্যেক দিনের মতো আজও সে বাসের জন্য ঠিক চার মিনিট অপেক্ষা করে। বাস এসে থামলে কয়েকজন যাত্রী উঠানামা করে। বাস বোঝাই যাত্রী। তিল ধারনের জায়গা নেই। একজন আরেকজনের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে এবং একজনের পায়ের আঙুলে অন্যজনের পায়ের চাপ পড়ছে। কিন্তু কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করছে না। যুবকটি বাসের সিলিংয়ের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনের সিটে বসা এক গ্রাম্য বৃদ্ধলোক। লোকটির হাতে এক টুকরো কাগজ। তাতে ঠিকানা লেখা আছে। সে কাগজটি দেখিয়ে যাত্রীদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করছে। যুবকটি ঠিকানাটা লক্ষ্য করে। 'পোস্ট অফিস স্টপ, শাখা ৪৮।'

বুড়ো লোকটির পাশের যাত্রী শ্রাগ করে বলল, 'দুঃখিত। আমি ঠিকানা জানি না।' বলেই সে জানালার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

লোকটির উন্নাসিক ব্যবহার যুবকটির কাছে কেমন যেন অসহ্য মনে হল। 'আমি কি আপনাকে পথ দেখাতে পারি?' সে বুড়ো লোকটিকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, তাহলে তো খুব উপকার হয়।' কৃতজ্ঞতার মোলায়েম কণ্ঠস্বরে বুড়ো লোকটি বলল।

যুবকটির অফিসের দু'স্টপেজ পরেই পোস্ট অফিস। প্রত্যেকটি বাস স্টপেজ সে খুব ভালো করেই চেনে। কেননা শহরের মানচিত্র দেখে এ সব বাস স্টপেজ সম্পর্কে সে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করে নিয়েছে।

'আমি নেমে যাবার পর দু'স্টপেজ পরে নামবেন।' বৃদ্ধলোকটিকে উদ্দেশ্য করে যুবকটি বলল।

কেমন করে তুমি জানো, ওটাই সঠিক বাস স্টপেজ? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তাহলে সে কি বলবে? হয়তো তুমি ওখানে চিঠি পোস্ট করতে গিয়েছিলে। না, আমি কাউকে কোনো চিঠি লিখিনি। কাকে চিঠি লিখেছ? সে কে? কোথায় থাকে? কি করে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? অথবা হয়তো ...।

যুবকটির মনে পড়ল বেশ কিছুক্ষণ আগে পোস্ট অফিসে যাওয়ার রাস্তায় সশস্ত্র

www.pathagar.com

সৈনিকদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল। এখন তারা যে রাস্তায় আছে, তার সমান্তরাল সেই রাস্তাটা। চৌরাস্তার মোড়ে সেনাবাহিনীর একটা জীপ পাহারা দিচ্ছে। একজন অফিসার এবং দু'জন সাধারণ সৈনিক মারা গেছে। সে সময় যুবকটি অফিসে ছিল এবং সে গুলির শব্দ শুনেছে। ঘটনাটি এখনও খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়নি, এমনকি এ সম্পর্কে রেডিওতেও কোনো সংবাদ প্রচারিত হয়নি। ঘরে ফেরার পথে দোকানে কয়েকজন লোকের ফিসফিসানিতে সে ব্যাপারটা শুনেছে।

একধরনের অদৃশ্য আতঙ্কে যুবকটির চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। হয়তো তুমি গোলাগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিলে? না, তখন আমি অফিসে ছিলাম। কেমন করে তুমি নিশ্চিত হলে? হয়তো সেনাবাহিনীর জিপ আসার আগে তুমি ওখানে গিয়েছিলে এবং তোমার পরিকল্পনা ছিল ...। কার সঙ্গে তুমি পরিকল্পনা করেছিলে?

যুবকটির মস্তিস্কের ভেতর ক্রমশ দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠার কালো মেঘ ঘনীভূত হতে থাকে। সে বুকের ভেতর একধরনের চিনচিন ব্যথা অনুভব করে। ব্যথাটা বুক থেকে নেমে পেটের মধ্যে পরিপাকতন্ত্রের দিকে যেতে থাকে। সে ভাবল, হয়তো না খাওয়ার জন্য তার এমন লাগছে। ইদানিং খাওয়ার প্রতি তার অনীহা বেড়ে গেছে। মনে মনে ঠিক করে, শীঘ্রই অফিস থেকে একটা চিঠি নিয়ে সে ডাক্তারের কাছে যাবে।

'আপনি কি ... অফিসের একজন কর্মচারী?'

ওভারকোট গায়ে একজন লোক পাশে দাঁড়িয়ে যুবকটির চোখের দিকে সরাসরি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে। লোকটির তাকানোর ভঙ্গি যুবকটির কাছে মোটেও ভালো লাগল না। সে মাথা নিচু করে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। কম্পিত গলায় সে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানেন?'

লোকটি এক ঝলক হাসল। হাসি থামিয়ে সে বলল, 'আপনিই তো বলেছেন আপনার অফিসের দু'স্টপেজ পরে পোস্ট অফিস।'

'হুম।'

'আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে গোপন আলাপ করতে চাই।'

'কোন বিষয়ে?'

'আপনার অফিসে চলুন। ওখানে নিরিবিলিতে বলব।'

যুবকটি পুনরায় পেটের ভেতর ব্যথা অনুভব করে। ক্রমশ ব্যথাটা পাকস্থলির ভেতর কুণ্ডলির মতো পেঁচাতে থাকে। এখন সে কি করবে? বাস এসে একটা স্টপেজে থামে। বাস থেকে সে নেমে যেতে উদ্যত হয়। 'দয়া

www.pathagar.com

করে একটু পথ দিন...' বলতে বলতে সে তাড়াতাড়ি বাসের দরজার কাছে যায়। গ্রাম্য বৃদ্ধলোকটি চিৎকার করে ওঠে, 'স্যার, আরো দু' স্টপেজ...?'

বুড়ো লোকটির কথায় কান না দিয়ে যুবকটি দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়ে। যদিও বাইরের খোলা হাওয়ায় তার খানিকটা ভালো লাগে, কিন্তু তখনো সে পেটের মধ্যে ব্যথাটা অনুভব করে। তাড়াতড়ি সে একটা সরু পথ ধরে হাঁটতে থাকে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কেন সে এখানে নেমেছে, তাহলে সে সোজাসুজি বলবে, তার পেট ব্যথা করছিল এবং তাকে টয়লেটে যেতে হবে। আসলেই সে পেটে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করেছে। রাস্তার আশেপাশে কিংবা শেষ মাথায় যদি কোনো টয়লেট খুঁজে না পায়, তাহলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। সে না পারছিল দৌড়াতে, না পারছিল সহজ ভঙ্গিতে হাঁটতে। যাহোক, অবশেষে সে টয়লেটের সন্ধান পেয়ে দ্রুত গতিতে হেঁটে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়। সে ভাবল, এই ডায়রিয়া তাকে নিশ্চয় কয়েকদিন ভোগাবে।

প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে যুবকটি চোখ মেলে সামনের দিকে তাকায়। দরজার কাঠে কাঁচা হাতে আজেবাজে মন্তব্য লেখা এবং মানুষের নগ্ন ছবি আঁকা। দেওয়ালের গায়ে লেখাগুলো পড়ার খুব ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু কেন? আপন মনে সে বলল, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য টয়লেটে ঢুকেছে, আজেবাজে লেখা পড়ার জন্য নয়। তবুও কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে সে লেখা পড়তে শুরু করে। অশ্রাব্য সব লেখা পড়ে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। দরজার একপাশে সুন্দর হাতের লেখায় কেউ একজন লিখেছে, 'আর কতদিন এই স্বৈরাচারী শাসকদের দুঃশাসন সহ্য করতে হবে?'

হঠাৎ যুবকটির মাথা থেকে পা অবধি একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। সে ভয়ে এবং আতংকে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। এটা কে লিখেছে? হয়তো কেউ। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখে। না, কেউ নেই। সে একা। একসময় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকায়। কোথাও কেউ নেই, এমনকি আশেপাশে কোনো গোপন ক্যামেরাও নেই। মোটামুটি সে নিশ্চিন্ত যে কেউ তাকে দেখতে পারছে না। অবলীলায় তার চোখ ফিরে যায় লেখার বাকি অংশটুকুতে। 'দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কেন কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না? শুধুমাত্র গেরিলা যুদ্ধের সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে।'

কেউ তাকে দেখে ফেলার ভয়টা যুবকটির সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কেন জানি তার ধারণা জন্মায় যে সে হয়তো লিখেছে। সত্যি সত্যি

www.pathagar.com

ওরা যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি কি লিখেছ? তাহলে সে কি বলবে? সে লেখেনি। এটা তার হাতের লেখা নয়। হয়তো সে ইচ্ছে করে তার হাতের লেখা বদলে লিখেছে। না, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। লেখাটা হালকা নীল রঙের বলপয়েন্টে লেখা। যদিও তার কাছে একটা নীল রঙের এবং আরেকটা লাল রঙের বলপয়েন্ট রয়েছে, কিন্তু ওগুলো তার পকেটে ভীষণ ভারী মনে হল। এখন যদি সে দরজা খুলে বেরোয় এবং কেউ চট করে তার সার্টের কলার চেপে ধরে, তাহলে...? ঠিক সেই সময় কেউ একজন দরোজার কড়া নাড়ে। ভয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। এখন কে কড়া নাড়ে? কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বুঝা যায় তার টয়লেটে যাবার হয়তো প্রয়োজন নেই। তবে কি সে একজন গুপ্তচর? সম্ভবত সে লেখাটা নষ্ট করে ফেলবে। এলোমেলো ভাবতে ভাবতে যুবকটি তার কোটের পকেট থেকে বলপয়েন্ট বের করে। কোথায় সে নীল রঙের কলমটা লুকোবে? না স্যার, আমার নীল রঙের কোনো কলম নেই। এই যে পকেট দেখুন। টয়লেটের ভেতর এমন কোনো গোপন জায়গা নেই যেখানে সে কলমটা অনায়াসে লুকোতে পারে। সে যদি পানির ট্যাঙ্কের ওপর লুকিয়ে রাখে, তাহলে ওরা অবশ্যই ওটা খুঁজে পাবে। যাহোক, কলমের গায়ে তার আঙুলের ছাপ আছে। তাতে ব্যাপারটা আরো বেশি খারাপ হবে। সে যদি... না, কিছুতেই সে কলমটা গিলতে পারবে না। সে যদি কলমটা কমোডের ভেতর ফেলে দেয়, তাহলে...। তাহলে কলমটা কমোডের ভেতর আটকে যাবে এবং তাতে পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ হবে। আবারো সে দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল।

'অপেক্ষা করুন। এই তো বেরুচ্ছি। এক মিনিট...।'

যুবকটি কমোড থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের জিপার টানতে টানতে পুনরায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকায়। ভেবে পায় না এখন সে কি করবে। পুনরায় কড়া নাড়ার শব্দে সে কলমটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রথমে দেয়ালের গায়ে ধাক্কা লেগে শব্দ হয় এবং পরে মেঝেতে পড়ার সময় আরেকবার শব্দ হয়। তখনই পাশের টয়লেটে কেউ একজন ঢোকে। সে দরোজা খুলে বেরিয়ে আসে। একজন লোক চোখেমুখে রাগের চিহ্ন ফুটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করে।

যে কোনো মুহূর্তে নিশ্চয় লোকটি লেখাটা দেখতে পাবে। যুবকটি হাত না ধুয়ে তাড়াতাড়ি টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসে। আরেকজন লোকের সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল। কোনোরকম ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক দৌড়ে সরু রাস্তার শেষ মাথায় এসে থামে।

www.pathagar.com

লোকটা যদি তাকে অনুসরণ করে, তাহলে...? পলকের জন্য সে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকায়। না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। বড় রাস্তায় এসে সে ডান দিকে মোড় নিয়ে তার অফিসের দিকে হাঁটতে থাকে। অফিসে পৌছানোর এই বিলম্বের কি কৈফিয়ত সে দেবে? সে তার হাতঘড়ির দিকে তাকায়। পৌনে আটটা বাজে। ইতোমধ্যে অফিসে পৌছানোর কথা। কিন্তু অফিসে পৌছতে তার আরো পনের মিনিট লাগবে। যদি সে একটা ট্যাক্সি করে যায়, তাহলে হয়তো কিছুটা সময় আগে যেতে পারবে। কিন্তু তাতে সময়ের খুব বেশি তফাৎ হবে না। দেরি মানেই দেরি। অল্প সময় কিংবা বেশি সময় দেরি করার মধ্যে তেমন কোনো ফারাক নেই। আসল কথা হচ্ছে, অফিসে যেতে তার দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে এবং সঙ্গে কে ছিল?

যুবকটির কাছে মনে হয় তার এ জীবন অভিশপ্ত। আক্ষেপের সুরে সে আপন মনে বলল, এই অভিশপ্ত জীবনে কিছুই হবে না। বলতে বলতে সে অফিস পেরিয়ে বাম দিকে ঘুরে সজোরে হাঁটতে থাকে। রাস্তায় কালো পিচের উপর ট্যাংকের চেইনের দাগগুলোর উপর দিয়ে সে রীতিমতো লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। একটা চলন্ত মোটরবাইকের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল। কোনোরকম নিজেকে রক্ষা করে সে অন্য রাস্তা ধরে দ্রুত দৌড়াতে থাকে।

'এত তাড়াহুড়া কিসের?'

একজন পথচারী যুবকটির ঘাড় চেপে ধরে প্রচণ্ড ঝাকুনি দেয়। পথচারীকে স্বাভাবিক মনে হলো না। তার পড়নে ওভারকোট এবং মাথায় টুপি। চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করছে এবং সে একটা কিছু খুঁজছে। হয়তো সে একজন গুপ্তচর।

'তোমাকে সন্দেহজনক লাগছে।'

'আমি কিছুই করিনি।'

'কে জানে ...?'

পথচারী লোকটি ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে হেসে বলল। সে সময় তার চোখেমুখে বিদ্বেষের ছবি ফুটে ওঠে। যুবকটি চোখেমুখে হাসি ফোঁটানোর চেষ্টা করে। সে খুব আস্তে কথা বলে যেন আশেপাশের কেউ শুনতে না পায়। তারা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

'তাহলে তুমি কি করেছ?'

'ওটা আমি লিখিনি।'

'অবশ্যই তুমি ওটা লিখেছ। ওটা তোমার হাতের লেখা।' যুবকটির

www.pathagar.com

মুখের উপর হাসতে হাসতে লোকটি বলল।

চটজলদি যুবকটি ভাবল, কেন সে অযথা জীবনটা খোয়াবে।

হঠাৎ যুবকটি দৌড়াতে শুরু করে। সে কিছুতেই বলতে পারবে না লোকটি কি আদৌ তাকে অনুসরণ করছিল। চৌরাস্তার মোড়ে এসে সে একটা ট্যাঙ্কের আড়ালে লুকায়। সে জানে, এক শ' ফুট দূরে কাছাকাছি কোথাও নদী আছে। মানচিত্রে সে অনেকবার এই নদী পেরিয়েছে। অনেক সময় সে নদীর পাড়ে নেমে পাথরের উপর বসে মাছ ধরেছে। যে মেয়েটিকে সে প্রতিদিন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, সে-ও ওখানে আসে। বহুবার তারা বাজি ধরেছে, যে আগে মাছ ধরতে পারবে, সে অন্যজনকে সিনেমা দেখাবে।

যুবকটি নদীর ধারে এসে পৌঁছায়। আশেপাশের সবকিছু দেখতে এমন যেন সে মনে মনে আগেই ভেবেছিল এ রকম দৃশ্য সে দেখতে পাবে। ব্যতিক্রম শুধু নদীর পানি নীল রঙের নয়। পানির রঙ ভয়ংকর ঘোলাটে, যা তার মনের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় তৈরি করে। এ পানিতে ডুবে মরা খুবই কষ্টদায়ক। পুলের রেলিং ধরে সে নিচের দিকে তাকিয়ে নদীর গভীরতা পরখ করে। পানির উপর হলুদ রঙের একধরনের ফেনা ভাসছে এবং স্রোতের সঙ্গে শ্যাওলার মতো ময়লা ভেসে যাচ্ছে। সে কি ঝাঁপ দিবে, নাকি দেবে না? এ দোটানায় সে দুলতে থাকে। একসময় যুবকটি ঝাঁপ দেওয়াই সঙ্গত বলে মনে করল। তার এই ক্ষুদ্র জীবনের কিই-বা দাম। মরে যাওয়াই ভালো। তাহলে সে নিষ্কৃতি পাবে, মুক্তি পাবে। ওরা কি জিজ্ঞেস করবে না, কেন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে? ওরা জিজ্ঞেস করুক। তাতে তার কিছু যায় আসে না। কেননা মৃত মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় না। মনে মনে সে সামান্য খুশি হল। কিন্তু ঝাঁপ দেওয়ার পর যদি সে মারা না যায়, তাহলে কি হবে? না, অবশ্যই সে মারা যাবে। অন্যদের মুখে শুনেছে অনেকেই এ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অতলে ডুবে গেছে। কিন্তু সে যদি মারা না যায়, তখন কি হবে? যদি লোকেরা তাকে উদ্ধার করে এবং জানতে চায়, কেন তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে? প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকা কিংবা আত্মহননের অধিকার আছে। তাতে অন্যের নাক গলানোর কি দরকার? যুবকটি নিজেকে বলল, এখন তোমার জীবন তোমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু তুমি এমন কি কাজ করেছ যে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাও? কিছুই না। কিছু না হলে কেউ কখনও আত্মহত্যা করে না। সত্যি করে বলো। মিথ্যা বললে কোনো লাভ হবে না। অবশ্যই এমন কিছু করেছ, যার হাত থেকে মুক্তি পেতে তুমি আত্মহত্যা করতে চাও। আসলে এটা তার অসহায়ত্ব, একধরনের নিরাশা। নিরাশা? কিন্তু

www.pathagar.com

কেন তোমার মনে নিরাশা? তাহলে কি তুমি বলতে চাও, তোমার কোনো আশা নেই? না, তার কোনো আশা নেই। কিন্তু কেন নেই? এমন কি হয়েছে যে তার আশার আলো নিভে গেছে? কোনো কিছুতেই কি তার কোনো আশা নেই? হ্যাঁ, আছে এবং সবকিছুতেই তার আশা আছে।

যাহোক, শেষপর্যন্ত যুবকটি মত পরিবর্তন করে পিছন ফিরে রেলিংয়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। একসময় সে চোখ বন্ধ করে। তার প্রতি কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ না করে পথচারীরা পাশ কেটে যে যার মতো চলে যাচ্ছে। কেন সে আত্মহত্যা করবে? কেন সে নিজের জীবন ধ্বংস করবে? বেঁচে থাকা কি অর্থপূর্ণ নয়?

কিছুক্ষণ পরে যুবকটি মন্থর গতিতে চৌরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায়। তখনও সেখানে আর্মির ট্যাংক থেমে আছে। একজন সৈনিক ট্যাংকের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে এবং চলমান মানুষের দিকে তাকিয়ে হাসছে। যুবকটি সরাসরি সৈনিকের কাছে যায় এবং প্রচণ্ড ঘৃণায় তার চোখের দিকে তাকিয়ে কলার চেপে ধরে। সে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের কাছে কি চাও?'

সৈনিকের বন্দুক থেকে বিকট শব্দে বুলেট বেরোনোর ঠিক আগের মুহূর্তে যুবকটি প্রচণ্ড রাগে এবং ক্ষোভে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলল, 'শালারা, এখান থেকে তোরা চলে যাস না কেন?'

[গল্পসূত্র : 'পেশা' গল্পটি মোহাম্মদ আসেফ সুলতানজাদের 'অকিউপেশন' গল্পের অনুবাদ। 'ফার্সি' থেকে ইংরেজিতে গল্পটি অনুবাদ করেন সিমা নাহান। ইংরেজিতে গল্পটি ২০০৯ সালে 'ইরানীয়ান.কম'-এ প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : আধুনিক আফগান সাহিত্যে যে সব অভিবাসী লেখক এবং লেখিকারা সাহিত্যাঙ্গনে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করতে পেরেছেন, তাদের মধ্যে মোহাম্মদ আসেফ সুলতানজাদে অন্যতম। তিনি ১৯৬৪ সালে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দু'বছর তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসিতে পড়াশুনা করেন। সোভিয়েত আগ্রাসনের সময়ে ধরা পড়ার ভয়ে ডিগ্রি শেষ না করেই তিনি ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানে পালিয়ে যান। পরের বছর তিনি ইরানের অভিবাসী হন। পরবর্তীতে ২০০২ সালে ইরান সরকার আফগানদের উচ্ছেদ করলে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ডেনমার্কে গমন করেন। তিনি ছোটগল্প এবং উপন্যাস ছাড়াও বেশ কিছু নাটক রচনা করেন। তার প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে 'উই ডিসঅ্যাপিয়্যার ইন ফ্লাইট', 'নিউইয়ার্স ডে ইজ ডিলাইটফুল অনলি ইন কাবুল', 'দিস ইজ ডেনমার্ক' এবং 'দ্য ডেজার্টার' উল্লেখযোগ্য। 'উই ডিসঅ্যাপিয়্যার ইন ফ্লাইট' এবং 'দ্য ডেজার্টার' গল্প সংকলনের জন্য তিনি যথাক্রমে ২০০১ এবং ২০০৭ সালে ইরানের সম্মানিত 'গলশিরি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। তার গল্প আরবী সহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

www.pathagar.com

জরীন আনজুর

এভাবেই শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে থাকে

[**পূর্বকথা :** আফগানিস্তানের সিরহিন্দ জেলায় পাশতুনদের উপর আক্রমণ করার জন্য ১৪৬২ সালে তৎকালীন দিল্লির রাজা সুলতান মোহাম্মদ শাহ তার গভর্নরকে আদেশ দিয়েছিলেন। বর্তমান গল্পটি ঐতিহাসিক এ ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা, যা 'দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য পাশতুনস্' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রফেসর আব্দুল শাকুর রেশাদ তার এলিজিতে মর্মান্তিক এ ঘটনার কথা উল্লেখ করে গেছেন। এ ছাড়া এ ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।]

সারা গ্রামে ওরা শুধু তাকেই একমাত্র পুরুষ খুঁজে পেয়েছে। ওখানে আর কোনো পুরুষ ছিল না। গ্রামে যেসব পুরুষদের খুঁজে পাওয়া যাবে, জেলার গভর্নর তাদের সবাইকে তার বাড়ির উঠোনে উপস্থিত করার জন্য সেনাবাহিনীকে হুকুম জারি করেছে।

গ্রামের যেসব পুরুষেরা প্রতিবাদী, গভর্নর নিজেই তাদের মোকাবেলা করবে। সৈন্যবাহিনীকে যা আদেশ করা হয়েছে, তারা তাই করেছে। সারা গ্রামে চিরুনী অভিযানে শুধু এই বৃদ্ধ লোকটিকে ছাড়া তারা আর কোনো পুরুষকে খুঁজে পায়নি। গ্রামটি ছিল সিরহিন্দ জেলায়। তবে 'পাশতুনদের গ্রাম' নামেই এই গ্রামটি সুপরিচিত ছিল। গভর্নরের পাশবিক অত্যাচার, বর্বরতা এবং নৃশংসতার বিরুদ্ধে একসময় গ্রামের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। যার জন্য ধরা পড়ার ভয়ে পুরুষেরা বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকত। ওখান থেকে তারা গভর্নরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করত এবং কোনো অবস্থাতেই অত্যাচারী গভর্নরের কাছে আত্মসমর্পণ না করার শপথ নিয়েছিল। তবে নারী এবং শিশুদের দেখভালের জন্য এই বৃদ্ধকে তারা গ্রামে রেখে গিয়েছিল। যেহেতু সৈনিকদের আদেশ করা হয়েছিল, তাই তারা বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গভর্নরের সম্মুখে উপস্থিত করেছিল। সৈন্যরা সে রাতের জন্য বৃদ্ধ লোকটিকে একটা প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রেখেছিল।

পরদিন গভর্নর আরো নতুন সেনা নিয়োগ করলে রাজা তাকে পূর্ণ

www.pathagar.com

সহযোগিতা করেছিল। অত্যন্ত নির্দয় এবং পাষণ্ড এক সৈনিককে দলের নেতা বানানো হয়েছিল, যাতে সে ক্ষুদ্র এবং গ্রামের নিরস্ত্র মানুষের উপর নির্বিবাদে অত্যাচার করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, সৈনিকেরা বিনা প্রতিরোধে গ্রামে ঢুকতে পারেনি। গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুরো দু'দিন তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। একজনও বেঁচে থাকা পর্যন্ত গ্রামের পুরুষেরা প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিল। অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের সবাইকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। তারা দেশের জন্য শহীদ হতে রাজী ছিল, কিন্তু গভর্নরের আদেশের কাছে নতজানু হতে মোটেও রাজি ছিল না। পরে সৈনিকেরা তাদের শিরচ্ছেদ করে সাক্ষী হিসেবে রক্তাক্ত মুণ্ড ছালার থলিতে ভরে গভর্নরের সম্মুখে উপস্থিত করেছিল।

সেই সময়ে বৃদ্ধ লোকটি বন্দি ছিল। সে রীতিমতো বিভ্রান্ত এবং কিছুতেই জানতে পারেনি কি ঘটেছে কিংবা তার জন্য কি ধরনের দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে। একসময় তার মনে হয়েছিল সৈনিকেরা হয়তো তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভেবেছে, হয়তো তাকে অন্য কোনো বড় কারাগারে স্থানান্তরিত করবে। অবশেষে সে দেখতে পেল পাহারাদাররা তাকে নিয়ে যাবার জন্য আসছে। পাহারাদাররা তাকে গভর্নরের সম্মুখে হাজির করেছে। সেখানে গভর্নর বিজয়ের আনন্দ উৎসব পালন উপলক্ষে হরেক রকমের খানাপিনার আয়োজন করেছিল। শাহী ভোজে উপস্থিত হয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

বৃদ্ধ লোকটিকে উঠোনে হাজির করার জন্য গভর্নর হুকুম দিয়েছে। বৃদ্ধ লোকটি ভাবল, এটা রীতিমতো এক আশ্চর্যের বিষয় যে তার মতো একজন গ্রামের গোবেচারা মানুষকে আড়ম্বর ভোজ সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। ঘুণাক্ষরেও সে জানতে পারেনি, এই শাহী ভোজ কেন আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে শাহী ভোজের কারণ বুঝতে পারল। গভর্নর অট্টহাসির সঙ্গে প্রায় চিৎকারের মতো করে বলল, 'রক্তাক্ত মুণ্ড ভর্তি ছালার ব্যাগ নিয়ে আসো। বুড়োকে জিজ্ঞেস করব মাথাগুলো কাদের। সবগুলো মাথা এখানে নিয়ে আসো।' বৃদ্ধ লোকটি ভয়ে জড়োসড়ো এবং রীতিমতো বিচলিত। গভর্নরের পরিকল্পনা সম্পর্কে সে মোটেও ওয়াকিবহাল নয়।

উঠোনে বড় বড় ছালার ব্যাগ ভর্তি রক্তাক্ত মুণ্ড এনে হাজির করে। উচুঁ মঞ্চে তোলার পথটুকুতে ব্যাগ থেকে চুঁইয়ে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। তারপর ব্যাগ থেকে রক্তাক্ত মাথাগুলো বের করে স্তূপাকারে সাজানো হয়। এ

www.pathagar.com

দৃশ্য দেখে বৃদ্ধ লোকটির গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল অশ্রুর নহর। তার শুভ্র দাড়ি ভিজে সয়লাব এবং চোখেমুখে ঘৃণা আর প্রতিশোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ঝলকানি। আকস্মিকতা এবং অনুশোচনায় তার মাথার চুল খাঁড়া। নিঃশব্দে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে সে রক্তপিপাসু বর্বরদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

এ সময় গভর্নর কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে গম্ভীর গলায় আদেশ করে, 'সনাক্ত করার জন্য এক একটা করে মাথা বের করে বুড়োর সামনে ধরো।' দেহহীন মাথাগুলোর দিকে বুড়ো নির্বাক তাকিয়ে আছে এবং মনে মনে ভাবছে, মাথাগুলো তরতাজা যুবকদের ছিল। বৃদ্ধ লোকটির ভাবনার নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ছুড়ে ছন্দপতন ঘটিয়ে গভর্নর বলল, 'এখানে যে মাথাগুলো আছে, তার প্রত্যেকটির নাম বলো। এগুলো যাদের মাথা, তাদের পরিবার সম্পর্কে বলো এবং সামাজিক পরিচয় দাও।' ভয়ার্ত চোখে বৃদ্ধ লোকটি গভর্নরের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু যা বলা হয়েছে, তাই তাকে বিনাবাক্যে পালন করতে হবে। কেননা তার সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই।

ছালার ব্যাগ থেকে প্রথম মাথা বের করে বৃদ্ধ লোকটির সামনে রাখল। মাথাটা দেখেই তৎক্ষণাৎ সে চিনতে পারল। লোকটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সে বলল, যেমন নাম, পারিবারিক পরিচয়, পেশা ইত্যাদি। তারপর আরেকটি মাথা তার সামনে রাখল। তারপর আরো একটি। এ ভাবে একের পর এক মাথা বের করে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখানো হল। প্রতিটি মাথা সম্পর্কে সে বিশদ তথ্য পরিবেশন করল।

বৃদ্ধ লোকটি প্রত্যেককেই ভালোভাবে চিনে। কেননা একসময় সে একই গ্রামে শৈশব কাটিয়েছে এবং মৃত যুবকদের সঙ্গে গভীর ভাবে মেলামেশা করেছে। যখনই সে এক একজন যুবক সম্পর্কে বলা শুরু করে, তখনই গভর্নর এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা অবাক বিস্ময়ে এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে থাকে। মাঝে মাঝে তারা বৃদ্ধ লোকটিকে ভর্ৎসনা করে। কখনও বা তাদের হালকা এবং চটুল গল্প উপস্থিত দর্শক মহলে বেশ হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি ক্রমাগত মৃত যুবকদের বীরত্ব এবং সাহসিকতার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করছিল।

এক যুবক সম্পর্কে বলার মাঝখানে হঠাৎ বৃদ্ধ লোকটির সামনে একটি দেহহীন রক্তাক্ত মাথা উপস্থিত করা হয়। মাথাটার দিকে কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুট গলায় সে বলল, 'না, আমি একে চিনি না।'

গভর্নর বাঘের মতো গর্জন করে উঠে বলল, 'দেখো, ভালো করে তাকিয়ে

www.pathagar.com

দেখো। অবশ্যই তোমার চেনার কথা। আমি বিশ্বাস করি না, তুমি ওকে চেনো না।'

বৃদ্ধ লোকটি আরেকবার ভালো করে মাথাটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করে। একসময় সে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'দুঃখিত, আমি ওকে চিনি না, এমনকি কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহপাক ভালো জানেন।'

রাগে-ক্ষোভে গভর্নর চিৎকার করে বলল, 'কেমন করে তুমি চেনো না? ওর মাথাটা তো ভিন্ গাঁ থেকে আনা হয়নি। ভালো করে দেখে বলো। ওর সম্পর্কে বলো। তোমাকে বলতেই হবে।'

বৃদ্ধ লোকটি পুনরায় রক্তাক্ত মাথাটা উল্টে-পাল্টে দেখল এবং আলতো হাতে মৃত যুবকের গাল স্পর্শ করে বলল, 'ওকে আমি চিনি না। এখন কি করবো? কিছুতেই আমি চিনতে পারছি না।'

আবারো গভর্নর চিৎকার করে বলল, 'ওকে অন্য মাথাগুলো দেখাও। এ মাথা সম্পর্কে পরে আবার জিজ্ঞেস করবো। হয়তো তখন বুড়ো চিনতে পারবে। তা নাহলে ওকে জোর করে বলতে বাধ্য করব।'

বৃদ্ধ লোকটির সামনে অন্য মাথাগুলো বের করে। কয়েক ঘণ্টা ধরে এ ঘটনা চলতে থাকে। বৃদ্ধ লোকটি প্রতিটি যুবকের ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব এবং তাদের ত্যাগ সম্পর্কে বিশদ বলল। এ সময় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন যুদ্ধের সময় মৃত যুবকদের ভূমিকা এবং কলাকৌশল সম্পর্কে বলতে শুরু করে। তারা এ-ও বলল, কেমন করে ওদের পাকড়াও করেছে এবং পরে শিরশ্ছেদ করেছে, এমনকি যুবকদের অসীম সাহসের ঘটনাও বলল। বিবরণ শুনে উপস্থিত রাজসভার লোকজন একে অন্যের আশ্চার্যান্বিত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

শেষের দিকে বৃদ্ধ লোকটি মুষড়ে পড়ে। ইতোমধ্যে তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে এবং কণ্ঠস্বর বসে গেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে, একটা মাথা ছাড়া সে সবগুলো মাথার পরিচয় দিয়েছে।

বৃদ্ধ লোকটি বুঝতে পারল যে, গ্রামের কিছু যুবক এখনও বেঁচে আছে। কেননা এখানে তাদের মাথা নেই। চোখেমুখে এক চিলতে আশার আলো জ্বালিয়ে সে মনে মনে ভাবল, আপাতত তার নিজের ছেলে বাহলুল বেঁচে আছে। অন্য কেউ তার কথা শুনতে পারে, সেদিকে খেয়াল না করে সে অবচেতন মনে নিজের সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলছিল, 'বাহলুল এবং অন্য যুবকেরা নিশ্চয় এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নেবে। অবশ্যই ওরা একদিন এই

www.pathagar.com

অত্যাচার এবং অবিচারের সঠিক বিচার করবে। ওদের বিচার করতেই হবে। নিশ্চয়ই ওরা প্রতিশোধ নেবে।'

রাজসভার কর্মকর্তারা পুনরায় একে অপরের মুখের দিকে তাকায় এবং বৃদ্ধ লোকটিকে নিয়ে হাস্য-উপহাস করে। তখনও বৃদ্ধ লোকটি ভাবনার অতলে ডুবে আছে। গভর্নর আবারো চিৎকার করে আদেশ করে, 'এটি সেই মাথা, যা সে আগে যে মাথাটা সনাক্ত করতে পারেনি, সেটা নিয়ে এসো।'

বৃদ্ধ লোকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কম্পিত গলায় বলল, 'আমি জানি না। পরম করুণাময় আল্লাহপাক ভালো জানেন।'

'এর মানে কি? ধৈর্যহীন গভর্নর চিৎকার করে জানতে চাইল। 'এই বুড়ো, তুমি একটা মুর্খ। হয় তুমি এ মাথাটার পরিচয় দাও, নইলে তোমার নিজের মাথা যাবে। বুঝতে পারছ?'

গভর্নরের বদমেজাজী ভরাট কণ্ঠস্বর শুনে রাজসভার কর্মকর্তারা ভয়ে কেঁপে ওঠে। বৃদ্ধ লোকটি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেহহীন রক্তাক্ত মাথাটা পুনরায় সনাক্ত করার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পরে সে মিনমিনে গলায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'বলেছি তো আমি ওকে চিনি না। এখন আপনার যা খুশি, আমাকে নিয়ে তাই করতে পারেন।'

বৃদ্ধ লোকটির কথা শুনে রাগে-ক্ষোভে গভর্নর ফেটে পড়ে। তার চোখেমুখে হিংস্রতার রক্তিম আভা ফুটে ওঠে। প্রচণ্ড রেগে সে বলল, 'বুড়ো, যে করেই হোক আমি তোমাকে জানতে বাধ্য করব।'

বলেই গভর্নর আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। সারা উঠোন জুড়ে ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। গভর্নরকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে সবাই রীতিমতো কাঁপছিল। আরেক কদম এগোনোর আগেই সেনাবাহিনীর প্রধান এগিয়ে এসে বলল, 'এই যুবক সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই, অর্থাৎ এই মাথাটা সম্পর্কে।'

গভর্নর সেনাবাহিনীর প্রধানকে বলার অনুমতি প্রদান করে। বৃদ্ধ লোকটি সেনাবাহিনীর প্রধানের দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। সেনাবাহিনীর প্রধানও বুড়োর দিকে তাকাল, এমনকি গভর্নরও। একসময় সেনাবাহিনীর প্রধান যুদ্ধের বর্ণনা শেষে মৃত যুবকের সাহসিকতা সম্পর্কে এভাবে বলতে শুরু করে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ও যদি আমাদের সেনাবাহিনীতে থাকত, তবে খুব ভালো হতো। ও ভীষণ সাহসী। আমাদের অনেক ঝামেলায় ফেলেছিল। ও একাই আমাদের অনেক সৈনিককে খতম করেছে। ওকে ধরতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। প্রথমে আমরা ওকে কিছুতে ধরতে পারিনি। ও সৈন্যবাহিনীর যাবতীয় কলা-কৌশল ব্যবহার করেছে। আসলে ও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।'

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর প্রধান কথা শেষ করার আগেই বৃদ্ধ লোকটি কম্পিত স্বরে বলল, 'এখন আমি ওকে চিনতে পেরেছি।' উপস্থিত সবার চোখেমুখে আশ্চর্যের ঝিলিক ফুটে ওঠে এবং সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। কেউ টুঁ শব্দটিও করেনি, এমনকি গভর্নরও না। বরং গভর্নর অবাক বিস্ময়ে বৃদ্ধ লোকটির মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'আমি ওকে চিনি। ওর নাম শাহীন।'

এক মুহূর্ত নিরবতার পর বৃদ্ধ লোকটির ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো কঠিন হাসি ফুটে ওঠে। পরমুহূর্তে তার চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে তার শুভ্র দাড়ি। নিচু স্বরে সে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি বলেছিলাম, শাহীন একটা ভীতু। আপনারা যখন ওকে জবাই করেছেন, আশা করি শাহীন তখন কোনো ধরনের লজ্জার কাজ করেনি। আমার ভয় হচ্ছিল, ও হয়তো যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে এবং সবাইকে বিপদে ফেলবে বা আত্মসমর্পণ করতে সুযোগ দেবে। এখন আমার কাছে মেঘহীন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে আমার ছেলে শাহীন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের মতো দেশবাসীর মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। দেশের এবং অন্যদের সম্মান রক্ষা করার জন্য শাহীন জীবন উৎসর্গ করেছে। কেমন করে এতক্ষণ আমি ওকে চিনতে পারিনি।'

বলেই বৃদ্ধ লোকটি আকুল কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

[গল্পসূত্র : 'এভাবেই শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে থাকে' গল্পটি জরীন আনজুরের ইংরেজিতে 'দিস ইজ হাউ দ্য লীভস্ লিভ' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি ২০০১ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গল্পটি 'শর্ট স্টোরিজ্ ফ্রম আফগানিস্তান' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।]

লেখক পরিচিতি : জরীন আনজুর আফগানিস্তানের একজন সাংবাদিক, সমালোচক, ঔপন্যাসিক, কবি এবং গল্পলেখক। ১৯৫৭ সালে তিনি নাঙ্গাহার প্রদেশের গার্দি গাউসে জন্মগ্রহণ করেন। কাবুল এবং পাকিস্তানের পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা এবং পশতু ভাষার উপর পড়াশুনা করে তিনি কাবুলে শিল্প-সংস্কৃতি বিভাগে যোগদান করেন। আফগান সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি লেখালেখি করেন। এ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'দিজ হেডস্ এন্ড দিজ পিকচার্স', 'পয়েমস্ এন্ড ক্রিটিসিজম্' এবং 'দ্য রুইন্ড স্ট্রিটস্'। ২০১১ সালে তিনি 'সার্ক লিটারারি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। বর্তমানে তিনি সপরিবারে জার্মানীতে বসবাস করেন এবং 'দ্য সোসাইটি অফ কালচারাল প্রমোশন অফ আফগানিস্তান' সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য।

www.pathagar.com

মাহমুদ মারহুন

কবরের আলিঙ্গন

আমি বোধহয় দেরি করে ঘুমিয়েছি। এ জায়গাটা খুবই সঙ্কীর্ণ এবং নিঃশ্বাস নিতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। একটু থামুন, আলোটা জ্বালিয়ে দিই। এখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে আমার এত কষ্ট হচ্ছে কেন? উফ্! মাথাটা কিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। ঘরের ছাদের সঙ্গে মাথা তো ধাক্কা লাগার কথা নয়। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? দয়া করে আমাকে এক মুহূর্ত ভাবতে দিন। আমি এখন কোথায় আছি এবং কেন?

মনে হয় কেউ একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হয়তো তার হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। দূর থেকে আগন্তুককে দেখে আমার কোনো বন্ধু বলে মনে হলো না। না, আমি তাকে চিনতে পারছি না। আসলে তার হাতে কোনো লণ্ঠন নেই। তাহলে কি দু'জন আমার দিকে এগিয়ে আসছে? আলোটাই বা কিসের? কোন আলো হতে পারে? মনে হয় ওরা আমাকে নিয়ে আলাপ করছে। একটু সবুর করুন। আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করছি, 'এ্যাই, তোমরা কারা? এ জায়গাটা কোথায়?'

'আমরা বলব না। একটু পরে তুমি নিজেই জানতে পারবে। ভেবে দেখো। এক মুহূর্তের জন্য নিজের কথা চিন্তা করো। সব কিছু মনে পড়বে। তখন তুমি তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যাবে।'

'হুম! এখন আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। আমি তো ডুজাখ গ্রামের পাশে ছিলাম। ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে এবং আমার বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য আমি কয়েকজন সৈনিক জোগাড় করেছিলাম।

'ইসলামকে নিন্দা করার জন্য তুমি সৈনিকদের জোগাড় করেছিলে।'

'আমি? মোটেও না। কিছুতেই না। আমি ধর্মযুদ্ধে জড়িত ছিলাম। আমি একজন মুজাহিদ।'

'না। কখনই না। কোনোদিনই তুমি মুজাহিদ ছিলে না। ওটা ধর্মযুদ্ধ ছিল না। ধর্মযুদ্ধ হচ্ছে পবিত্র কাজের মধ্যে অন্যতম। তুমি ধর্মযুদ্ধের প্রতিটি

www.pathagar.com

অক্ষরকে অবমাননা করেছ।'

'আমি ... আমি ... আমি কি তাহলে মুজাহিদ নই? কিন্তু কেন? কি করে এটা সম্ভব?'

'অতীতের কাজ নিয়ে ভাবো। তাহলেই বুঝতে পারবে আসলে তুমি কি ছিলে।'

'একটু থামুন। আমাকে ভাবতে দিন। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ধর্মযুদ্ধ করেছি। ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাকে পাহাড়ী এলাকায় পাঠানো হয়েছিল।'

'ঠিক আছে, ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাকে পাহাড়ী এলাকায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কে তোমাকে পাঠিয়েছিল?'

'কে আমাকে পাঠিয়েছিল? আমি নিজেই গিয়েছি। না, আসলে আমি স্বেচ্ছায় যাইনি। প্রথমে আমি ডুজাখে কয়েকজন জেনারেলের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হই। পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য তারা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং বলেছে যে ওখানে আমাদের যুদ্ধের আসল ময়দান, 'দার আল-হার্ব'।'

'তাই। তারা তোমাকে পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিল। তোমার কাছে ইসলাম কি ডুজাখের পাহাড়ী এলাকা থেকে তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল না? ওখানে যুদ্ধ করা কি অবৈধ নয়? তুমি কি তোমার মুসলমান ভাইদের হত্যা করতে ধর্মযুদ্ধে শরীক হওনি?'

'না, কিছুতেই আমি হত্যাকারী নই।'

'ভালো করে ভেবে দেখো, তুমি কোথায় গিয়েছিলে এবং কি করেছ।'

'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে। আমি যখন পাহাড়ী এলাকায় যাই, তখন ওরা আমাকে একটা স্কুলের ঠিকানা দিয়ে বলেছিল ওখানে আমি যেন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। কেননা বিধর্মীরা এসে ঐ স্কুলের ছেলেমেয়েদের ইসলামের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিচ্ছিল।'

'বিধর্মী, ঠিক আছে। কিন্তু ওরা তো অন্য ধর্মের মূল্যবান কথা বলেছে। এবং তুমি ওখানে গিয়ে অবুঝ ছেলেমেয়েদের, যারা বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শেখেনি, নির্দ্বিধায় হত্যা করেছ।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এ জায়গাটা কোথায়?'

'এখনও কি তুমি বুঝতে পারোনি? এটা একটা কবর এবং তুমি মৃত।'

'আমি মৃত? না, আমি মৃত হতে পারি না। আমি যদি মারাই যাই, তাহলে আমি একজন শহীদ।'

'এই নাও তোমার কিতাব।'

www.pathagar.com

'এতে কি আছে?'

'এতে তোমার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ লেখা আছে।'

'আমার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ! দাঁড়ান, ডান হাত দিয়ে নিতে দিন। আপনি জানেন, আমি একজন শহীদ। এ কি! আমার তো ডান হাত নেই। এখন আমি কি করব? অগত্যা আমি বাম হাতে কৃতকর্মের কিতাব গ্রহণ করি। হায় আল্লাহ্, আপনি কেন আমাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছেন? আমি কি শহীদ নই?'

'না, তুমি শহীদ নও। তুমি একজন হত্যাকারী ছাড়া আর কিছু নও। নির্বিচারে তুমি নিরীহ মুসলমানদের হত্যা করেছ।'

'না, না, না। অসম্ভব, এ কিছুতেই হতে পারে না।'

আহ্, জায়গাটা ভীষণ উত্তপ্ত।

আমার মুখ শুকিয়ে কারবালা।

চারপাশে কি ভীষণ অন্ধকার।

সত্যি এখানে নড়াচড়া করার মতো এক চিলতে জায়গাও নেই।

আল্লাহ্, আমাকে বাঁচান।

হে সর্বশক্তিমান পরওয়ারদেগার।

[গল্পসূত্র : 'কবরের আলিঙ্গন' গল্পটি মাহমুদ মারহুনের ইংরেজিতে 'এমব্রেসড্ বাই দ্য গ্রেভ' গল্পের অনুবাদ। পশতু ভাষা থেকে মূল গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অ্যান্ডার্স উইডমার্ক। ইংরেজিতে গল্পটি ২০১১ সালের মে সংখ্যা 'ওয়ার্ডস্ উইদ্আউট্ বর্ডার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : মাহমুদ মারহুন একজন গল্পকার, কবি এবং অনুবাদক। তিনি ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তানের কান্দাহারে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কাবুলে বসবাস করেন।

www.pathagar.com

পীর মোহাম্মদ কারওয়ান
লোকটি পাহাড়ে উঠেছিল

সরু গলি ধরে সে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল। তার চোখের পাতা সম্পূর্ণ খোলা এবং সে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে সোজা সামনে তাকায়। একদল লোক রাস্তার মাঝখানে কলার খোসা ফেলে রেখেছে। পথচারী লোকটি কলার খোসার পাশ কেটে তাড়াতাড়ি যাওয়ার সময় হঠাৎ কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যায়। তাকে দেখে রাস্তার লোকজনেরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। চোখেমুখে রাগ ও ক্ষোভের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে পথচারী লোকটি উঠে দাঁড়ায় এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়া লোকগুলোকে অভিশম্পাত দিতে থাকে, 'এই, তোমরা সবাই তাকিয়ে দেখো। দেশে কত রক্ত ঝরছে, আর তোমরা দাঁত বের করে হাসছ। তোমাদের সবার লজ্জিত হওয়া উচিত।'

পথচারী লোকটি ওখান থেকে দ্রুত সরে পড়ে এবং স্বগতোক্তির মতো করে বলে, 'হায় আল্লাহ্, আমি কি কখনও এ রাস্তায় নিরাপদে যাতায়াত করতে পারব? এখনই রেডিও অন হবে এবং সংবাদ পাঠক আহত ও নিহতদের খবর প্রচার করবে।'

পথচারী লোকটি কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার দু'পাশের সব দোকান থেকে রেডিওর আওয়াজ ভেসে আসে। সংবাদের শুরুতেই আহত এবং নিহতদের খবর। সব রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত হচ্ছে দেশ সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা খবরগুলো যেন ধারালো ছুরির মতো তার বুকটা চিরে দু'ফালি করে ফেলছে। সে চিৎকার করে বলে, 'সবাই মিথ্যা বলছে। ওদের সবাইকে কিনে নেয়া হয়েছে। ওরা ঘুষখোর।'

পথচারী লোকটি কানের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে দৌড়াতে থাকে। কলার খোসায় পা পিছলে রাস্তায় পড়ে যাবার জন্য তার পরনের সাদা পোশাক ময়লা হয়ে গেছে। তার অবস্থা দেখে রাস্তার লোকগুলো আরেকবার হো হো করে হেসে ওঠে। লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে জনাকীর্ণ রাস্তা ছেড়ে দ্রুত

www.pathagar.com

কেটে পড়ে। চৌরাস্তার মোড়ে এসেও সে একই গতিতে দৌড়াতে থাকে। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হকার তারস্বরে ডাকতে থাকে, 'খবর, খবর, এই নিন খবর। সর্বশেষ তাজা খবর পড়ুন।'

প্রত্যেকটি সংবাদপত্র জুড়ে রয়েছে লাল অক্ষরে নিহত এবং আহতদের খবর। প্রথম পৃষ্ঠায় আছে দেশের মানচিত্র। মানচিত্রটা দেখতে অনেকটা মাছের আকৃতির। দেখে মনে হয় কোনো এক তাণ্ডব ঘূর্ণিঝড় যেন মাছটিকে নদীর তীরে ফেলে রেখেছে। মানচিত্রের মাঝখানে কাটা এবং দ্বিখণ্ডিত। পথচারী লোকটি ঘুণাক্ষরেও হকারের দিকে তাকাল না। সে আগের মতো দ্রুত গতি এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দৌড়াতে থাকে। আচমকা তার সামনে এসে এক হকার বলল, 'এই নিন তাজা খবর পড়ুন।' বিরক্তিকর কণ্ঠস্বরে হকার তার মুখের সামনে খবরের কাগজ তুলে ধরে।

পথচারী লোকটি প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিখণ্ডিত মানচিত্রের উপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে আনে। পুরো মানচিত্রে অসংখ্য ছিদ্র। তার চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। সে চিৎকার করে বলল, 'হায় আল্লাহ্, কোন অত্যাচারী এই মাছটিকে দ্বিখণ্ডিত করেছে? দেখো, একাংশ এদিকে, বাকি অংশ অন্যদিকে।'

হকার প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে বলল, 'আপনি একটা আস্ত পাগল। ওটা মাছ নয়। ওটা আমাদের দেশের মানচিত্র।'

ওখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাবার সময় পথচারী লোকটি গালিগালাজ করতে থাকে। 'সব খবরের কাগজই টাকার কাছে বশ মেনেছে। ওরা সবাই মিথ্যাবাদী। ওদের সব কথাই বিষাক্ত। হে জনগণ, আপনারা কোনো খবরের কাগজ পড়বেন না। এগুলো আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে চায় এবং আমাদের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। হে জনগণ, মিথ্যাবাদীরা দেশের জন্য দুর্যোগ ডেকে আনবে এবং স্বাধীন জাতির নাগরিকত্ব থেকে আমাদের বঞ্চিত করবে। হে জনগণ...।'

পথচারী লোকটির কথা শুনে রাস্তার লোকগুলো পুনরায় হো হো করে হেসে উঠে। সে দ্রুত ওখান থেকে সরে পড়ে।

জনতার ভিড় থেকে পথচারী লোকটি সোজা তার ঘরে ফিরে আসে। দরজায় তালা লাগানো। চাবি বের করার জন্য সে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকায়। কিন্তু পকেট ফুটো এবং সেই ফুটো গলিয়ে তার হাত ঢুকে যায়। নিজের ওপর তার ভীষণ রাগ হলো এবং ক্ষিপ্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। তালার ফুটোর ভেতর একটা শক্ত সরু লোহার তার ঢুকিয়ে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালাটা খুলে যায়। তৎক্ষণাৎ তার রাগী চোখেমুখে একঝলক হালকা

www.pathagar.com

হাসির ঢেউ খেলে গেল। ঘরে ঢুকে সে মেঝেতে ধপাস করে বসে পড়ে। ঘরের ভেতর সবকিছু অগোছালো। একসময় সে মেঝেতে একটা চাদর বিছিয়ে তার সবগুলো বই রাখে। ঘরের এক কোণে পুরনো সংবাদপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

'সবকিছু আমি টাকা দিয়ে কিনেছি,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল লোকটি। তারপর সে দাঁত কড়মড় করে আরো বলল, 'আমি একটাও রাখব না।' আপন মনে বলেই সে খবরের কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে থাকে। সেই সময় সে বারন্দায় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। প্রায় চিৎকার করে সে বলল, 'কে ওখানে? আমাকে কি ঘরেও একা থাকতে দিবে না? শহরের খোলা জায়গায় যদি আমি খবরের কাগজ ছিঁড়তে না পারি, তাহলে আমার ঘরের ভেতর খবরের কাগজ নিয়ে অন্যের মাথাব্যথা কেন? আমি টেলিভিশন ভেঙে ফেলব, এমনকি রেডিওটাও। টাকা দিয়ে আমি এসব কিনেছি। মেঝের উপর বাদ্যযন্ত্রটাও বাদ যাবে না। এগুলোর ওপর আমি প্রতিশোধ নেব। তারপর পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাব। এ শহর আমাকে ভাল কিছু দিবে না। সব জয়গাতেই মিথ্যার ছড়াছড়ি। এমন ধরনের মিথ্যা, যেন বিশ্বাসী কোনো মুরগি ডিম দেওয়ার বদলে গরুর মতো দুধ দিচ্ছে।'

লাঠি দিয়ে টেলিভিশনের স্ক্রিনে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সে সময় ঘরের ভেতর কয়েকজন বন্ধু প্রবেশ করে। একজন বলল, 'আহা, তুমি এ কি করছ? তুমি তো টেলিভিশন ভেঙে ফেলেছ।'

'সে ঠিকই বলেছে। আসলে ওটার মূল্য অনেক বেশি। এছাড়া যে খবরের কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলেছ, সে কাগজগুলোও মূল্যবান। খবরের কাগজগুলো যদি না ছিঁড়তে, তাহলে ওগুলো দিয়ে তুমি অনায়াসে বইয়ের মলাট দিতে পারতে।' মন্তব্যের সুরে বলল আরেক বন্ধু।

বন্ধুদের কথা শুনে লোকটি ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'মিথ্যা দিয়ে আমি বইগুলোকে আড়াল করতে চাই না। যদিও টাকা খরচ করে আমি বইগুলো কিনেছি, তবুও সবগুলো আমি নষ্ট করব, এমনকি রেডিওটাও ভেঙে ফেলব।'

বলার পরপরই এমন একটা বিকট শব্দ হলো যেন রেডিওটা ভেঙে ফেলা হল।

তখনো লোকটি রাগে-ক্ষোভে গজরাতে থাকে। 'সবকিছু আমি টাকা দিয়ে কিনেছি। কিন্তু কিছুই রাখব না। সবগুলো খবরের কাগজের গায়ে লেগে আছে বিষাক্ত বুলেটের দাগ। এসব বুলেট আমাদের মাথা বিদীর্ণ করেছে। রেডিও এবং টেলিভিশনের খবরের প্রত্যেকটা শব্দই এক একটা শাণিত ছুরি,

www.pathagar.com

যা আমাদের হৃদয়কে দ্বিখণ্ডিত করেছে, যেমন করে মাছকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। খবরের কাগজ, রেডিও এবং টেলিভিশন—সবই আমি কিনেছি, কিন্তু কিছুই আস্ত রাখব না।'

লোকটির এক বন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি পাগল হয়ে গেছো। আমরা জানি, সবকিছুই তুমি টাকা দিয়ে কিনেছ। কিন্তু কেন তুমি পাগলের মতো সবকিছু নষ্ট করছ? টাকা দিয়ে জিনিস কিনে নষ্ট করা একধরনের পাগলামি।'

লোকটি রাগে ফুঁসতে থাকে। একসময় রাগের আগুন খানিকটা নিভে এলে সে হাসি মুখে বন্ধুকে বলল, 'তুমি কিছুই জানো না। আসলে তুমিই পাগল। হে আল্লাহ্, ওরা সব পাগল, অথচ আমাকে পাগল বলে অপবাদ দিচ্ছে। শোনো, তুমি যা বলছ, তার জবাব দেবার মতো আমার কোনো ধৈর্য্য নেই। তোমরা সবাই মিথ্যার বেড়াজালে বন্দি হয়ে আছ। যাহোক, আমাদের কথাবার্তা এখানেই শেষ। আমি ধৈর্য্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছি। এছাড়া তোমাদের ব্যাখ্যা করে বলার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

বলেই লোকটি বইগুলো একটা চাদরে বেঁধে পুঁটলি করে। তারপর উচ্চ স্বরে বলল, 'বিদায় বন্ধুরা, আমি এখন তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এই শহর তোমাদের জিম্মায় রেখে গেলাম।'

[গল্পসূত্র : 'লোকটি পাহাড়ে উঠেছিল' গল্পটি পীর মোহাম্মদ কারওয়ানের ইংরেজিতে 'দ্য ম্যান হু ওয়েন্ট ইনটু দ্য হিলস্' গল্পের অনুবাদ। পশতু ভাষা থেকে মূল গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অ্যান্ডার্স উইডমার্ক। ইংরেজিতে গল্পটি ২০১১ সালের মে সংখ্যা 'ওয়ার্ডস্ উইদ্আউট্ বর্ডার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : পীর মোহাম্মদ কারওয়ান আফগানিস্তানের তানি জেলার নারিজি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি শরণার্থী হয়ে পাকিস্তানের পেশোয়ারে গমন করেন। তালিবানদের পতনের পর পুনরায় আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি বিবিসি-র 'আফগান এডুকেশন প্রজেক্ট'য়ের নাট্যকার হিসেবে কর্মরত। সমকালীন আফগান পশতু সাহিত্যে তিনি একজন প্রতিশ্রুতিশীল কবি এবং গল্পকার হিসেবে সুপরিচিত। ১৯৯৩ সালে তার প্রথম কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি আরো দু'টি কবিতার বই প্রকাশ করেন। এছাড়া তার দু'টি ছোটগল্প সংকলন রয়েছে।

www.pathagar.com

খান মোহাম্মদ সিন্ধ

প্রদর্শনী

যখন সে বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তার স্ত্রী ঘরের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকেই সে সোজা বিছানায় শুয়ে থাকা পাঁচ বছরের অসুস্থ ছেলের কাছে যায়। গায়ে জড়ানো শাল খুলে সে তার মাথা এবং দাড়ি মুছে ছেলের শরীরের কুশলাদি সম্পর্কে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে।

প্রায় কান্না জড়ানো চোখে স্ত্রী বলল, 'এখনও বারীর প্রচণ্ড জ্বর। ও খুবই দুর্বল এবং সারাদিন বিছানায় শুয়েছিল। খাবারের প্রতি ওর কোনো আগ্রহ নেই। কয়েকবার স্যুপ দিয়েছিলাম, কিন্তু ও কিছুই খেতে পারেনি।'

বিছানায় ঝুঁকে সে কণ্ঠস্বরে সোহাগের সামান্য বরফকুচি মিশিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা বারী, আমার আদরের ছেলে, কলিজার টুকরা। কেমন আছিস? কোথায় ব্যথা?'

আব্বাজানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বারী আলতো করে চোখের পাতা মেলে তাকায়। সে আব্বা-আম্মা দু'জনের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমার সমস্ত শরীরে ব্যথা।'

হাঁটু গেড়ে বসে সে তার হাতের ওপর ছেলের মাথা রেখে বলল 'ঠিক আছে। আল্লাহর রহমতে শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবি। এখন উঠে বস। একটু কিছু খেয়ে নে। তোর জন্য কলা এনেছি।'

বলেই সে ছেলেকে শোয়া থেকে আলতো করে তুলে বসায়। তাড়াতাড়ি বারীর আম্মাজান খাবার তৈরি করে নিয়ে আসে। আব্বা-আম্মা দু'জনেই চামচে করে তাকে খাওয়ায়। সমস্ত রাত বারী একটুও ঘুমোতে পারেনি। প্রচণ্ড ব্যথায় সে গোঙাতে থাকে। বিছানার পাশে বসে আব্বা-আম্মা তাকে পর্যবেক্ষণ করে।

পরদিন সকালে সারোয়ার তার স্ত্রীকে দুইশ' রুপি দিয়ে বলল, 'আজ আমার অনেক কাজ। বাজারে যেতে হবে। ছেলেকে তুমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেও।'

www.pathagar.com

বিল্ডিংয়ের যেখানে ঠেলাগাড়ি বাঁধা আছে, সারোয়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে সেখানে এসে দারোয়ানকে পাঁচ রুপি দিয়ে একটা ঠেলাগাড়ি ভাড়া নেয়। তারপর ঠেলাগাড়িটা ঘুরিয়ে সে বাজারের দিকে রওনা হয়। সে যখন বাজারে পৌঁছে, তখনও সূর্য ওঠেনি। একটা দোকানের সামনে ঠেলাগাড়ি থামিয়ে দোকানীকে সম্বোধন করে বলল, 'বদর, সালাম আলাইকুম।'

শার্টের বোতাম খুলে ভুঁড়িওয়ালা দোকানি বিছানায় শুয়েছিল। সামান্য নড়েচড়ে সে তার টাক মাথায় হাত রাখে। তারপর দাড়িতে আঙুল বুলিয়ে দীর্ঘ গোঁফ টেনে সোজা করে। সারোয়ারের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এখানে এসো, সারোয়ার। শোনো, তোমাকে আজ আমি কোনো আখ দিব না। কেননা তুমি এখনও আগের ঋণ পরিশোধ করোনি।'

বেশ মোলায়েম স্বরে সারোয়ার বলল, 'বিশ্বাস করুন, সেদিন কোনো আখ বিক্রি করতে পারিনি। ট্রাফিক পুলিশ আমাকে সারাক্ষণ তাড়া করেছে। কোথাও বসতে দেয়নি। ফলে সমস্ত আখ শুকিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস করুন, গতকালই আপনার ঋণ পরিশোধ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার ছেলেটা ভীষণ অসুস্থ। তাই ওকে ডাক্তার দেখানো এবং ঔষধ কেনার জন্য বাড়িতে স্ত্রীর কাছে রুপি রেখে এসেছি।'

জবাবে দোকানি বলল, 'দেখ সারোয়ার, অনেকেই আমার কাছ থেকে বাকিতে আখ নিয়ে বিক্রি করে। প্রতিদিন সকালে আমি ওদের আখ দেই। ওরা সারাদিন ঠেলাগাড়িতে নিয়ে বিক্রি করে রাতে এসে ঠিকমতো ঋণ শোধ করে। অনেকদিন ধরে তোমার সঙ্গে আমার লেনদেন। অথচ তুমি আখ বিক্রি করে সব টাকা তোমার কাছে রেখে দাও। আগে ভালো ছিলে, কিন্তু এখন তুমি শয়তানের পাল্লায় পড়েছ এবং এ ধরনের মিথ্যা অজুহাত দিচ্ছ।'

অনুনয়-বিনয় করে সারোয়ার বলল, 'বদর, একবার ভেবে দেখুন, গত তিন বছরে আপনার কাছ থেকে আমি কতদিন আখ নিয়েছি এবং কতবার ধার শোধ করতে গড়িমসি করেছি? কিন্তু অনেকদিন ধরে ছেলেটা খুবই অসুস্থ। তাই ওর চিকিৎসার জন্য প্রচুর খরচ করতে হচ্ছে। এটা হয়তো আপনার জন্য ভালো। আমাকে ঋণী করে রাখুন। কোনো চিন্তা করবেন না। আল্লাহপাক মহান। আমি সব ঋণ শোধ করে দেব।'

সারোয়ারের অজুহাতের সঙ্গে দোকানি যদিও সহমত পোষণ করল না, কিন্তু সারোয়ার এমনভাবে কাকুতি-মিনতির সুরে নিজের অক্ষমতাকে স্বীকার করে ক্ষমা চাইল যে, বদর শেষপর্যন্ত তাকে পাঁচ শ' রুপির আখ দিতে সম্মত হল। ঠেলাগাড়িতে আখ তুলে সারোয়ার তড়িঘড়ি পঁচা খান এবং চারসাদা

www.pathagar.com

সড়কের মোড়ের দিকে রওনা হল। প্রতিদিন ওখানেই সে আখ বিক্রি করে। ব্যাগ থেকে একটা ছুরি বের করে সে আখের খোসা ছাড়াতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় বিশ-ত্রিশটি আখের খোসা ছাড়ায়। তারপর সেগুলোকে সুন্দরভাবে সামনে সাজিয়ে রাখার জন্য ছোট ছোট টুকরো করে। সে সময় ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে চিৎকার করে বলে, 'তাজা আখ ... মিষ্টি আখ আছে।' সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় দশ-পনের কিলো আখ বিক্রি করেছে, কিন্তু অনবরত ডাকাডাকির পরও বিকেলের দিকে বিক্রি অনেক কমে যায়। তখন সে দশ, পাঁচ ও দুই রুপির নোটগুলো স্তূপাকারে সাজায় এবং ছেঁড়া নোটগুলো আলাদা করে। তারপর বিক্রির সব রুপি গোনে। এর মধ্যে সাত বা আটটা বিশ রুপির নোট আছে। বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের গরম হাওয়া ছেড়ে আপন মনে বলল, 'হায় আল্লাহ, এই অল্প রুপি নিয়ে এখন আমি কি করব? ছেলের জন্য ঔষধ কিনতে হবে। কেমন করে আমি দোকানিকে আখের দাম পরিশোধ করব?'

বিকেল বেলা বাজারে প্রচুর লোকজনের সমাগম হয়। ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সারোয়ার জোর গলায় বলতে থাকে, 'তাজা আখ আছে ... মিষ্টি আখ।' একসময় সে দেখতে পেল একদল লোকের পরনে ক্রিকেট খেলার পোষাক। তাদের হাতে ব্যাট ও বল। প্রায় দশজন লোক তাদের অনুসরণ করছে। তারা কিংস্ গার্ডেনের দিকে যাচ্ছে। স্বগতোক্তির মতো করে সারোয়ার বলল, 'বোধহয় শাহিবাগে কোনো খেলা হবে। ওখানে গেলে আল্লাহর রহমতে হয়তো বাকি আখগুলো বিক্রি করতে পারব।' এই বলেই সে শাহিবাগের দিকে সজোরে ঠেলাগাড়ি ঠেলতে থাকে। বড় রাস্তা ধরে সে তাড়াতাড়ি চৌরাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছে। সেখানে একজন ট্রাফিক পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল। কোনো কারণ ছাড়াই ট্রাফিক পুলিশ তার উদ্দেশে চিৎকার করতে থাকে এবং কাছে এসে ঠেলাগাড়িকে জোরে লাথি মেরে ধমকের সুরে বলল, 'এখান থেকে ভাগ।'

কাঁচুমাচু করে নরম গলায় সারোয়ার বলল, 'আমি ওখানে অই শাহিবাগের গেটের কাছে যাব।'

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ লোকটি বলল, 'সেদিন তুই ভালো ব্যবহার করিসনি। তাই তোকে মেরেছিলাম। কিন্তু আজ এমনভাবে মারব, যেন তুই চিরদিনের জন্য তোর নাম ভুলে যাস।'

সারোয়ার বলল, 'স্যার, সেদিন আপনি আমাকে যেতে দেননি। তাই আমি কয়েক কিলো আখ বিক্রি করতে পারিনি। শেষে সব আখ শুকিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। আমার অনেক লোকসান হয়েছে। ঘরে ছেলেটা আমার ভীষণ অসুস্থ। বাকিতে এই আখগুলো এনেছি। আখগুলো বিক্রি করে ধার শোধ করব এবং ছেলের জন্য ঔষধ কিনব।'

সারোয়ারের কথা শুনে দাঁত বের করে পুলিশ বলল, 'তুই মোহাজির। তোকে যেতে দেব না। এখনই দূর হ'।' বলেই সে সারোয়ারকে কয়েকটি চড় দেয়।

সে সময় সারোয়ারের গা থেকে শাল খসে পড়ে এবং সে ওটা তুলতে যায়। কান্না ভেজা চোখে সে ট্রাফিক পুলিশকে বলল, 'আমাকে মারুন, যত খুশি পেটান, আপনার যা খুশি তাই করুন, কিন্তু দয়া করে আমাকে শাহিবাগের গেটের কাছে যেতে দিন।'

সারোয়ারের কাকুতি-মিনতি শুনে ট্রাফিক পুলিশের মেজাজের পারদ হু হু করে বেড়ে যায়। প্রচণ্ড রাগী গলায় সে বলল, 'এখনই ভাগ। নইলে তোকে আমি ঠেলাগাড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখব।'

সারোয়ার যতই অনুরোধ করুক না কেন, তাতে ট্রাফিক পুলিশের সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন হলো না এবং সে কিছুতেই সারোয়ারকে শাহিবাগের গেটের কাছে যেতে দিল না।

অবশেষে সারোয়ার পুলিশকে বলল, 'আমি খুব অসহায়। আমাকে মারবেন না। যদি তাই করেন, তাহলে আমি আত্মঘাতী হব এবং আমার গায়ের রক্তে আপনার হাত রঞ্জিত হবে।'

'দূর হ'। নইলে তোকে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত গাড়ির নিচে ফেলে দেব।' পুলিশ লোকটি বলল।

কোনো কিছু না ভেবেই অশ্রুভেজা চোখে সারোয়ার বলল, 'গাড়ি চালকের জন্য আমি কোনো দুর্ভোগ ডেকে আনতে চাই না। আমি আত্মঘাতী হয়ে আপনাকে দায়ী করব।'

রাস্তায় চলন্ত গাড়ি নিয়ন্ত্রণের ফাঁকে ট্রাফিক পুলিশ উচ্চস্বরে সারোয়ারকে বলল, 'যা, যা, অই বৈদ্যুতিক থামের উপর উঠে গিয়ে মর।'

সঙ্গে সঙ্গে সারোয়ার দৌঁড়ে লোহার বৈদ্যুতিক থামের উপর উঠতে থাকে। তখন আতঙ্কিত পথচারিরা এবং আশেপাশের দোকানিরা বলাবলি করে, 'দেখো, দেখো, লোকটা ...।'

সারোয়ার থামের চূড়ায় উঠে ট্রাফিক পুলিশের উদ্দেশে পুনরায় চিৎকার করে বলতে থাকে, 'সবাইকে আমি এখন এমন একটা প্রদর্শনী দেখাব, যা আপনি আমাকে দেখাতে বাধ্য করেছেন।'

www.pathagar.com

নিচ থেকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশ বলল, 'দেখা, দেখা তোর প্রদর্শনী।'

সারোয়ার দু'টি বৈদ্যুতিক তার তুলে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়াল। বিকট শব্দে শর্ট সার্কিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার উপর নিথর শরীর লুটিয়ে পড়ার আগে সারোয়ার একটা ঝলমলে পাখির মতো বাতাসে ছিটকে পড়ল।

[**গল্পসূত্র :** 'প্রদর্শনী' গল্পটি খান মোহাম্মদ সিদ্ধের ইংরেজিতে 'দ্য স্পেকট্যাকল্' গল্পের অনুবাদ। পশতু ভাষা থেকে মূল গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অ্যান্ডার্স উইডমার্ক। ইংরেজিতে গল্পটি ২০১১ সালের মে সংখ্যা 'ওয়ার্ডস্ উইদ্আউট্ বর্ডার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : খান মোহাম্মদ সিদ্ধ আফগানিস্তানের একজন কবি, ছোটগল্প লেখক এবং সাংবাদিক। বর্তমানে তিনি কাবুলে বসবাস করেন। ২০০৭ সালে তার প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশের পর তিনি আরো কয়েকটি গল্প অনলাইনে প্রকাশ করেন। নিপীড়িত আফগান শরণার্থীদের অনিশ্চিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা এবং টানাপোড়েন তার গল্পের মূল বিষয়।

www.pathagar.com

ওয়ালী শাকের
পরিচয়পত্র

'আমি এখন পাকিস্তানে। এরপর আমি কি করব?'

ছোট্ট একটা কক্ষে বসে আহমেদ জহীরের গান 'তানহা সোদাম তানহা' শুনতে শুনতে নিজেকেই প্রশ্ন করি। এই কক্ষে আমি ছাড়া আরো চারজন আফগান যুবক থাকে।

মনে আছে, পাকিস্তানের পথে রওনা হবার আগে আমি সেখানে কি করব, সে বিষয়ে আব্বাজান এবং আম্মাজান আমাকে নানান বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন।

'শোনো বৎস,' বিছানায় বসে আব্বাজান বলেছিলেন। তার চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অসংখ্য বই। 'যেখানেই যাও না কেন, আমরা চাই তুমি স্কুলের পড়াশুনা শেষ করো। আশা করি, তুমি অনেক বড় হও। যখন দেশে ফিরে আসবে, তখন আমরা চাই তুমি তোমার দেশ ও পরিবারকে সাহায্য এবং সেবা করবে।'

মনে মনে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি যদি স্কুলে যাই এবং একদিন দেশে ফিরে গিয়ে দেশের সেবা করার সুযোগ পাই, তাহলে প্রথমেই আমার শরণার্থীর পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা দরকার। এই পরিচয়পত্রের জন্য আমি গত দেড় মাস ধরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যোগাড় করেছি।'

পরিচয়পত্রে সীলমোহর সংগ্রহের জন্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি শরণার্থী অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।

বাস থেকে নেমে দেখি একজন আফগান লোক রাস্তার পাশে বসে বিক্রির জন্য ফলের ঝুড়ি থেকে এলোপাতাড়ি মাছি তাড়াচ্ছে। শরণার্থী অফিসের দিক-নির্দেশনার জন্য আমি তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে খাল বরাবর ধূলিময় রাস্তায় আমাকে নিদেন হলেও কুড়ি মিনিট হাঁটতে হবে।

ইতোমধ্যে দু'টো বেজে গেছে। চারপাশে প্রচণ্ড গরম হাওয়ার ছড়াছড়ি। তাড়াতাড়ি শরণার্থী অফিসে পৌঁছানোর জন্য আমি জোরে হাঁটতে থাকি।

www.pathagar.com

আমার সার্টের প্রায় পুরোটাই ঘামে ভিজে গেছে। রাস্তার পাশে খালের পানিতে আমি হাত-মুখ ধুতে চাইলাম। তাকিয়ে দেখি একপাল মহিষ খালের মাঝখানে নেমে মনের সুখে জলকেলি করছে। ফলে আমি মত পরিবর্তন করে পুনরায় হাঁটতে থাকি।

শরণার্থী অফিসের কাছে পৌঁছে দেখি, কমপক্ষে এক শ' আফগান লোক ভেতরে ঢোকার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম আমি যদি এই লাইনের শেষ মাথায় দাঁড়াই, তাহলে কখনই ভেতরে ঢুকতে পারব না। প্রবেশ দ্বারের রক্ষীর সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলাম যে, আসলে এ দীর্ঘ লাইনটা যারা খাদ্য নেয়ার জন্য সই নিতে চায়, তাদের জন্য। অফিসের সামনে আরেকটা ছোট লাইন। যেখানে অল্প কয়েকজন লোক। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য তারা রাস্তার পাশে দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে গিয়ে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিই। এখানে অবশ্যই আমার বলা উচিৎ যে, লাইনের লোকজন অত্যন্ত মন্থর গতিতে এগোচ্ছে।

মিনিট কয়েক পরে এক বৃদ্ধ লোককে দেখতে পেলাম। লোকটির বয়স হয়তো সত্তরের কাছাকাছি। সে খুবই চিন্তিত এবং ইতস্তত পায়চারি করছে। সে প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ গড়নের। তার চোখের চারপাশে গাঢ় করে পীচ-কালো সুরমা লাগানো। শীতকালের বরফের মতো শুভ্র দাড়ি তার উজ্জ্বল মুখটাকে ঢেকে রেখেছে। তবে লম্বা সাদা দাড়ি তার চেহারায় একধরনের মর্যাদা এবং উৎকর্ষতা এনে দিয়েছে।

কয়েক মিনিট পরপর বৃদ্ধ লোকটি উঠে গিয়ে রাস্তা পার হয়ে প্রায় শেষ মাথায় অপেক্ষারত এক যুবকের সঙ্গে কথা বলে। একসময় যুবকটি আমাদের দেখিয়ে দেয়। আমার ধারণা, যুবকটি বুড়োকে বলেছে তার আগের জায়গায় ফিরে যেতে এবং তার নাম না ডাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।

দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আমি রাস্তার উল্টোদিকের লোকজনের চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করছি এবং নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি। 'আফগানিস্তানের কোথা থেকে এত লোক এসেছে?' এদের অনেককেই আমি কাবুলে কখনও দেখিনি।

দেখলে বোঝা যায় লোকগুলো পরিশ্রান্ত এবং চোখেমুখে বিষণ্নতার মলিন ছায়া। পেশোয়ারের দুপুরের গনগনে রোদে তাদের মাথা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ধূলোবালিতে ঢেকে আছে। তাদের পরনে রঙ-বেরঙের মলিন পোশাক। অনেকেই মাথা নিচু করে আছে, যেন তারা হারানো মূল্যবান কিছু খুঁজছে।

পেশোয়ার শহরের বাইরের তাবুগুলোতে নিশ্চয় লোকগুলোর পরিবার

www.pathagar.com

খাবার এবং ঔষধের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা কি আমার মতো স্কুলের পড়াশুনা শেষ করতে চায় না? ওদের পিতা-মাতা কি চায় না ওরা শিক্ষা লাভ করুক? বুড়ো লোকটির কি অবস্থা? হয়তো ওর কোনো অসুস্থ ছেলেমেয়ে কিংবা নাতি-নাতনি ঘরে অপেক্ষা করছে কখন সে খাবার বা ঔষধ নিয়ে যাবে। হয়তো বৃদ্ধ লোকটি নিজেই ক্ষুধার্ত। হয়তো যুদ্ধে সে তার প্রিয় কাউকে হারিয়েছে। হয়তো...?

এত সব প্রশ্ন আমি নিজেকেই করছি। মনে হয় প্রশ্নগুলোর জবাব আমি ইতোমধ্যে জেনে গেছি। যে লোকগুলো আমার সঙ্গে রাস্তার উল্টোদিকে ছায়ায় বসে অপেক্ষা করছে, তাদের অবস্থাও আমার চেয়ে ভালো নয়। গোমড়া মুখে চুপচাপ তারা অপেক্ষা করছে কখন তাদের নাম ডাকা হবে। ইতোমধ্যে বুড়ো লোকটি রাস্তা অতিক্রম করতে চাইলে তাকে পুনরায় আগের জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। লোকটি আমাকে চাচার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, এমনকি তার ব্যবহার আমাকে আফগানিস্তানে চাচার পোষা খাঁচার ভেতর আটকে পড়া ডানা ঝাপটানো পাখির কথা মনে করিয়ে দিল।

কয়েক ঘন্টা লাইনে অপেক্ষা করে অবশেষে অফিসে ঢোকার সুযোগ পেলাম। পাঁচজন কেরানি টেবিল ঘিরে বসে আছে। ভেতরে ঢুকেই টের পেলাম সিগারেটের ধোঁয়া এবং উৎকট গন্ধ ঘরের আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছে। লোকগুলো হয়তো কোনো জটিল এবং মূল্যবান বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল, কেননা দীর্ঘ কয়েক মিনিট তারা কেউ আমার আগমনকে মোটেও আমল দেয়নি। তবুও সাহস করে আমি ধীর পায়ে একজনের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। সীলমোহর দেয়ার জন্য তার হাতে পরিচয় পত্র তুলে দিলাম। নাকের উপর বসানো পুরো লেন্সের চশমার ফাঁক গলিয়ে সে আমার পরিচয়পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করল।

সত্যি বলতে কি, আমি খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম। একধরনের অনিশ্চয়তার ভয় এবং আশংকা আমাকে ঘিরে ধরে। 'যদি সে আমার পরিচয় পত্রে সীলমোহর না দেয়, তাহলে কি হবে? শরণার্থী হিসেবে আমি এ দেশে কিভাবে থাকব?' মনে মনে বললাম।

'দশ রুপি!' একসময় সে বলল। আমি বুঝতে পারিনি আসলে সে কি বোঝাতে চাচ্ছে।

'কি বললেন?' সঙ্গে সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'দশ রুপি!' পুনরায় সে বলল।

আমি চোখেমুখে এমন ভঙ্গিমা ফুটিয়ে হাসলাম যেন সে আমার সঙ্গে

www.pathagar.com

মশকরা করছে। কিন্তু আমার হাসির প্রতিদানে সে একটুও হাসল না।

সামান্য সময়ের জন্য আমাদের মাঝখানে নীরবতার অদৃশ্য ছায়া নেমে আসে। সেই ফাঁকে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি, নাকি তার কথা ভুল শুনেছি?' কিন্তু আমি বাজি ধরতে পারি যে, সে মনে মনে এমন একটা সহজ কথা ভাবছে, যা বললে আমি অনায়াসে বুঝতে পারি সে আমার কাছে টাকা চাইছে।

অবশেষে লোকটি মুখ খুলল এবং বেশ কঠিন স্বরে বলল, 'পরিচয়পত্রে সীলমোহরের জন্য তোমাকে দশ রুপি দিতে হবে। তুমি কি চাও, নাকি চাও না? না যদি চাও, তবে অহেতুক আমার সময় নষ্ট করো না। আমার অনেক কাজ আছে।'

কক্ষের অন্যান্য কেরানিদের মুখের দিকে একবার দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে আনি। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের আলাপ উপেক্ষা করছিল। ঠিক সে মুহূর্তে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি পকেটে হাত ঢুকাই এবং দশ রুপি বের করে টেবিলের উপর রাখি। মাথার ওপর হেলিকপ্টারের ব্লেডের মতো বন্ বন্ করে পাখা ঘুরছে। তবুও আমার কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। কয়েক ঘণ্টা আগে হেঁটে আসার সময় শরীর থেকে যেটুকু ঘাম ঝরেছিল, এখন তারচেয়ে দ্বিগুন ঘাম ঝরছে। একটু পরে লোকটি সীলমোহর দিয়ে কার্ডটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

যদিও আমার কোনোরকম ইচ্ছে ছিল না, তবুও লোকটির দিকে না তাকিয়ে মনের অগোচরে কেন জানি বিড়বিড় করে বললাম, 'ধন্যবাদ।' তারপর অপরাধীর মতো লজ্জায় মুখ নিচু করে অফিস থেকে বেরিয়ে আসি।

যেই মাত্র আমি বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলাম, তখনই শুনতে পেলাম দু'জন তারস্বরে কথা কাটাকাটি করছে। অই তো সেই সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোকটি এক যুবক সৈনিকের সঙ্গে ঝগড়া করছে। যুবক সৈনিকটি বিল্ডিংয়ের পাহারাদার এবং তার দায়িত্ব হচ্ছে লাইনে দাঁড়ানো জনতাকে সোজা রাখা। বাক-বিতণ্ডার রহস্য উদঘাটনের জন্য আমি আরো কাছাকাছি গেলাম।

বৃদ্ধ লোকটির অভিযোগ যে, লাইনটা ভীষণ লম্বা এবং অনেক সময় লাগবে। অথচ সে তাড়াতাড়ি তার মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে যেতে চায়।

'ক্যাম্পে আমার নাতি ভীষণ অসুস্থ। ওর জন্য ঔষধ নিয়ে যেতে হবে এবং ওর সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। ও আর অপেক্ষা করতে পারছে না। আল্লাহর দোহাই, এই লোকগুলোর আগে আমাদের যেতে দিন।' বৃদ্ধ লোকটি

www.pathagar.com

রীতিমতো অনুনয়-বিনয় করে বলল।

মনে হলো যুবক সৈনিকটি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে এবং সে কিছুতেই বৃদ্ধ লোকটিকে আগে যেতে দিচ্ছে না। বৃদ্ধ লোকটিকে শান্ত করার জন্য হঠাৎ একটি বাচ্চা ছেলে পেছন থেকে দৌড়ে এলো। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। আসলেই যুবক সৈনিকটি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। সে বৃদ্ধ আফগান লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে এবং ভীষণ জোরে তাকে চড়-থাপ্পড় দিচ্ছে। আমার ধারণা, লাইনে দাঁড়ানো এমন কোনো লোক নেই যে থাপ্পড়ের শব্দ শোনেনি। আসলে আমি নিশ্চিত, সবাই শব্দ শুনতে পেয়েছে, এমনকি রাস্তার উল্টোদিকের লোকগুলোও শুনেছে।

বৃদ্ধ লোকটির ঠিক পেছনেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। তৎক্ষণাৎ সে জনতার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। পলকেই তার চোখ থেকে নেমে আসে অশ্রুধারা। সেই অশ্রুধারার স্রোত তার গাল বেয়ে নেমে সাদা দাড়ির ফাঁকে হারিয়ে যায়।

বৃদ্ধ লোকটিকে আমি বলতে চাইলাম, 'ঠিক আছে, কাকা। একদিন আমাদের এই দুর্দশা শেষ হবে এবং আমরা মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারব। শুধু ধৈর্য্য ধরুন এবং পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করুণ যেন তিনি কমিউনিস্টদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দান করেন।'

কিন্তু আমি বলতে পারিনি, এমনকি একটা শব্দও আমার মুখ থেকে বেরোয়নি। অনুশোচনায় আমার বুকের ভেতর একটা অদৃশ্য কাঁটা খচখচ করে। অশ্রুতে বৃদ্ধ লোকটির মুখ ভেজা। সে ওপরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন আল্লাহপাকের সঙ্গে কথা বলছে। আমি ঘুরে যেই মাত্র ধূলি-ধূসরিত রাস্তার দিকে পা বাড়াই, তখনই আমার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে। আমি কান্না চেপে রাখতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না।

সূর্য প্রায় ডুবতে শুরু করেছে। আসন্ন দীর্ঘ এবং অন্ধকার রাত্রির জন্য বিশাল আকাশ অপেক্ষা করছে। গোধূলি বেলায় আকাশের গায়ে বিভিন্ন রঙের আলোর মেলা— লাল, নীল, বেগুনি, সোনালি এবং রুপালি রঙ। তখনো খালের পাড়ে গাভীগুলোর হাম্বা রব শোনা যাচ্ছিল। অকস্মাৎ আমি থামলাম এবং পকেট থেকে আমার নতুন পরিচয়পত্র বের করে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকি।

পরিচয়পত্রের এক কোণে লাগানো আমার ছবির দিকে তাকাই। ছবিটা শক্ত করে লাগানো। প্রথমে আমি পরিচয়পত্রটা দু'টুকরো করি। তারপর ছিঁড়ে আরো টুকরো টুকরো করে খালের পানিতে ছুঁড়ে ফেলি। আস্তে আস্তে

www.pathagar.com

কাগজের টুকরোগুলো পানিতে ভেসে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। আমি ওখানেই বসে পড়ি এবং বেশ অনেকক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদেছি।

আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন আমার মনে হলো আমি আব্বাজানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। 'কখনওই কাপুরুষ হবে না। এই কি তোমার মনোবল?'

আব্বাজানের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি। বেঁচে থাকতে হলে আমাকে অবশ্যই আরো কঠিন হতে হবে। আমি কান্না থামিয়ে চোখ থেকে মুছে ফেলি অশ্রুকণা।

হ্যাঁ, আমি চোখ থেকে নোনা পানি মুছে ফেলেছি। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটির কান্নার দৃশ্য আমি কখনই আমার মন থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে পারব না।

[**গল্পসূত্র :** 'পরিচয়পত্র' গল্পটি ওয়ালী শাকেরের ইংরেজিতে 'আইডেন্টিটি কার্ড' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি ২০০১ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গল্পটি জোহরা সায়িদ এবং সাহার মুরাদির সম্পাদনায় 'ওয়ান স্টোরি, থার্টি স্টোরিজ : অ্যান এনথ্রোলজি অব কন্টেম্পোরারি আফগান আমেরিকান লিটারেচার' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া গল্পটি ইটালিয়ান ভাষায়ও অনূদিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : ওয়ালী শাকেরের জন্ম আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের পর তিনি ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের শরণার্থী হন। পরে ১৯৯০ সালে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তিনি পলিটিক্যাল ইকোনমি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সে ব্যাচেলার ডিগ্রি অর্জ করার পর সান ফ্রানসিস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। মূলত তিনি 'দারি' ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন। তিনি পশতু, ইংরেজি এবং উর্দু ভাষায়ও দক্ষ। তার কবিতা এবং ছোটগল্প বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। কবিতা এবং ছোটগল্প লেখা ছাড়াও রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

www.pathagar.com

পারভিন ফায়েজ জাদাহ্ মালাল

ঘৃণা

'ঠিক চার কিলোগ্রাম হয়েছে।'

মহিলা যখন দোকানির মুখে কথাগুলো শুনল, তখন তার ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে এক টুকরো আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসি-মাখা দৃষ্টিতে সে তার ছোট ছেলের দিকে তাকায়।

দোকানি বলেই চলেছে, 'বহেনজি, এই নিন। আট রুপি হয়েছে।'

মহিলা আরেকবার চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করে দোকানির কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে শেষ বিকেলের নরোম রোদে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য পা বাড়ায়। ছোট ছেলের হাত শক্ত করে ধরে সে দ্রুত গতিতে হাঁটতে থাকে। মহিলা এত শক্ত করে ছেলের হাত ধরেছে যে একসময় ছেলেটি বলল, 'আম্মাজান, আপনি আমার হাতে ব্যথা দিচ্ছেন।'

'তোমার আম্মাজান যা কিছু করে, সবই তোমার ভালোর জন্য করে। ঠিক আছে, হালকাভাবে ধরছি। এখন আর ব্যথা পাবে না।' আন্তরিকতা এবং সমবেদনার সঙ্গে মহিলা বেশ মোলায়েম স্বরে বলল।

প্রায় এক বছর হলো মহিলা এবং তার ছোট ছেলে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে এখানে এসেছে। এখন এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে দিনরাত মহিলাকে হতাশা গ্রাস করে রেখেছে। প্রতিদিন সাত-সকালে সে এবং ছেলেটি শরণার্থী তাবু থেকে বেরিয়ে শহরের বাজারে এবং সরু গলির আনাচে-কানাচে পুরনো কাগজ কুড়ায়। যখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে আসে, তখন তারা সমস্ত দিনের কুড়ানো কাগজ বিক্রি করার জন্য একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাধারণত তারা কুড়ানো কাগজ বিক্রি করে দৈনিক চার কিংবা পাঁচ রুপি উপার্জন করতে পারে। কিন্তু আজ তারা দারুন খুশি। কেননা কাগজ বিক্রি করে আট রুপি পেয়েছে। অনেক দিন, যেদিন তারা কোনো কাগজ সংগ্রহ করতে পারে না, খালি হাতেই দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন কেন জানি তার মনে হয়, সমস্ত কাগজ যেন বাতাসে উড়ে গেছে কোন এক অচিন দেশে, সাথে নিয়ে

www.pathagar.com

গেছে তার সুখ আর আনন্দ। সেদিন তার মন খারাপ থাকে। কিন্তু আজ সে ফুরফুরে মন নিয়ে ফিরে আসে তাবুতে। ফেরার পথে দোকান থেকে রুটি, চা-পাতা এবং সামান্য চিনি কেনার পরও তার কাছে দুই রুপি রয়ে গেছে। গাদাগাদি অনেকগুলো ছাই এবং কালো রঙের তাঁবু পেরিয়ে সে তার নিজের তাবুতে পৌঁছায়। যখন সে তাঁবুর সামনের মোটা কাপড়ের পর্দা তুলে ভেতরে ঢোকে। ঠিক তখনই মাগরিব নামাজের আযান হয়। অজু করে সে নামাজ আদায় করে। তারপর হ্যারিকেন তুলে দেখে কোনো তেল নেই। ছেলের দিকে ঘুরে সে বলল, 'বৎস, হ্যারিকেনে কোনো তেল নেই। রুপি আর বোতল নিয়ে যাও এবং দোকান থেকে তেল নিয়ে আসো।'

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। মায়ের কাছ থেকে রুপি এবং বোতল নিয়ে সে বলল, 'আম্মাজান, এটা হয়তো ভালো হবে ...'

'যদি তুমি অন্য ছেলেদের সাথে খেলার জন্য রাস্তায় না থামো। এখন তাড়াতড়ি যাও। খুব শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যাবে।'

এ কথা বলার পর মহিলা চুল্লিতে অগ্নিসংযোগ করে। যেই মাত্র অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল, ঠিক তখনই তার মনের কোণে ভয়ংকর এক স্বপ্নের মতো ভেসে উঠে যন্ত্রণার দগ্ধ স্মৃতি। চোখ থেকে ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু। বাতাসের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা লিকলিক করে, যেমন করে নির্বাসন আর উদ্বাস্তু জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার দগ্ধ শিখা জ্বলে তার ক্ষত-বিক্ষত মনের ভেতর। তখন মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার বাসনা তীব্র হয়।

অন্ধকার তাঁবুর ভেতর মহিলা দিন-রাত শুধু অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। অতীত নিয়েই তার সমস্ত ভাবনা। তবে অতীত খুব বেশি দিন আগের নয়, মাত্র গত বছরের। তখন তার সবই ছিল। স্বামী ছিল, সংসার ছিল, এমনকি রুজি-রোজগারও ছিল। তারচেয়ে বড় কথা, তখন তার নিজের একটা দেশ ছিল। কিন্তু এখন এসবের কিছুই নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু তার ছোট্ট ছেলেটি। মহিলা জানে না, তার আত্মীয়-স্বজনেরা কেমন আছে, কোথায় আছে, আদৌ তারা বেঁচে আছে, নাকি মরে গেছে। যে জিনিসটা তাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয়, তাহলো এখানে ছেলেটি কোনো শিক্ষা পাচ্ছে না। অথচ এ বয়সে ছেলেটির স্কুলে গিয়ে ভালো শিক্ষা পাবার কথা ছিল। তার মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা, যখন সে নিজের দেশের একটা এলিমেন্টারি স্কুলের শিক্ষিকা ছিল। তার ক্লাসে ছিল দশজন ছেলেমেয়ে। অথচ এখন তার নিজের ছেলে স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে না। তবে সময় ও সুযোগ পেলে সে নিজেই ছেলেকে সামান্য পড়াশুনা দেখিয়ে দেয়। তার প্রচণ্ড

www.pathagar.com

ইচ্ছে, ছেলেকে সে স্কুলে পাঠাবে। কিন্তু এখন সে ইচ্ছেয় গুড়েবালি। তাঁবুর ভেতরে যখন মনে পড়ে বিকেল বেলা স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়, তখন তার মনের ভেতর সমস্ত যন্ত্রণা মুছে গিয়ে অন্যরকম এক সোনালি স্বপ্ন এসে মনকে ভরিয়ে দেয়।

অন্যান্য সব সকালের মতোই আজ সকালে মহিলা যখন ছেলেকে নিয়ে তাবু থেকে বের হয়, তখন বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। আকাশে মেঘেরা এলোমেলো ওড়াওড়ি করছিল এবং মাটিতে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েছিল। আকাশে মেঘ জমতে দেখলেই সে তার মনের ভেতর একধরনের আশংকা বোধ করে। বৃষ্টি হলে তারা বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারে না। এছাড়া বৃষ্টিতে কাগজ ভিজে যায়। তবুও তাড়াতাড়ি পা ফেলে তারা বাজারের দিকে রওনা হয়। বাজারের কাছাকাছি পৌছানোর পরপরই তুমুল বৃষ্টি নামে। তারা একটা বন্ধ দোকানের সামনে এসে থামে। ছেলেটি তার মায়ের গা ঘেষে দাঁড়ায় এবং বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করে। এক ঘণ্ঠা বাদে বৃষ্টি থেমে গেলে তারা আবার রাস্তায় নেমে আসে এবং শুকনো কাগজের আশায় শহরের অলিগলিতে হাঁটতে থাকে। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করেও কোনো শুকনো কাগজ খুঁজে পেল না। গতকাল থেকে মহিলা এবং তার ছেলে অভুক্ত। তাদের কাছে খাবার কেনার মতো কোনো অর্থকড়ি নেই। বিকেলে ছেলেটি দারুণ ক্ষুধা অনুভব করে। কি আশ্চর্য, এ বছর তারা বেশ অনেকদিন না খেয়ে কাটিয়েছে। সে সব দিনগুলোতে তাদের কোনো উপার্জন কিংবা সঞ্চয় ছিল না। তখন ছেলেটি সকালবেলা শুধু চা খেয়ে বিকেল, এমনি অনেকদিন সন্ধ্যে অবধি অভুক্ত থেকেছে। যেদিন কাগজ সংগ্রহ করতে পেরেছে, সেদিন কুড়ানো কাগজ বিক্রি করে খাবার কিনেছে। মহিলা তার ছেলেকে এরকম অভ্যেসে গড়ে তুলেছে। তবে ইদানিং ছেলেটি ক্ষুধার্ত হলে প্রতিবাদ করে। তখন মহিলা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। মহিলা জানে না সে মুহূর্তে তার কি করা উচিত। কার কাছে যাবে, কোন দোকান থেকে ধারে খাবার আনবে, কিংবা কোন পথচারীর কাছে ভিক্ষা চাইবে। এ ধরনের কাজ করার জন্য যথেষ্ট মনোবল থাকা চাই। কিন্তু অনেক সাহসী মানুষ এ কাজ করতে পারবে না। সে কল্পনাও করতে পারে না যে এ ধরনের কাজ তাকে দিয়ে হবে। তাই বাস্তবে কেমন করে সম্ভব? ছেলেটি ভীষণ একগুঁয়ে। কোনো অজুহাতই শুনতে চায় না। অনেক সময় সে মনে মনে ভেবেছে কোনো দোকান কিংবা পথচারীকে বলবে, কিন্তু সে তা করতে পারেনি। না পারার কারণ হল, ঠিক তখনই অন্য আরেক চিন্তা এসে তার মস্তিষ্কে ভর করে। তখন স্বগতোক্তির

www.pathagar.com

মতো করে সে বলল, 'যদি কারোর দরোজায় করাঘাত করি, তবে হয়তো...।' এ পরিকল্পনাটি তার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল। কেননা বেশির ভাগ সময় মহিলারাই এসে দরোজা খুলে দেয়। মনে মনে ভেবে নিয়ে সে একটা বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। তার হাত কাঁপছিল, এমনকি শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল। দরোজার কাছে পৌঁছে সে ভাবছিল আদৌ করাঘাত করবে কি করবে না। সে মুহূর্তে তার মনের ভেতর এক সাথে দু'টো বিষয় কাজ করছিল। একদিকে ছেলের জন্য মায়ের ভালোবাসা আর রক্তের টান, অন্যদিকে একধরনের লজ্জা এবং ভয়। এই দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে সে রীতিমতো বিভ্রান্ত। ফলে তার বুকের ধুকপুকানিও সে নিজের কানে শুনতে পায়নি। মুখ শুকিয়ে কারবালা। অবশেষে সে দরোজায় কড়া নাড়ে। একজন বৃদ্ধা দরোজা খুলে দেয়। কম্পিত গলায় সে বৃদ্ধাকে বলল, 'আমার ছেলে... আমার ছেলেটা খুবই ক্ষুধার্ত। আমার কাছে কোনো রুপি নেই। দয়া করে যদি...'

কথা শেষ করার আগেই বৃদ্ধা মহিলা ঘুরে দাঁড়ায় এবং ঘরের ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে বলল, 'এ বাড়িটা তোমাদের।'

কিছুক্ষণ বাদে অর্ধেক খোলা দরোজার ফাঁক গলিয়ে মহিলা দেখল বৃদ্ধা ফিরে আসছে। এক হাতে বাটি এবং অন্য হাতে রুটি। তখনই মহিলা ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। 'আম্মাজান, আপনাকে অনেকবার বলেছি, এগুলো কুকুরকে দেন, কক্ষণো কাবুলিদের দেবেন না।'

বাটি হাতে বৃদ্ধা দরোজার কাছে এসে দেখে মহিলা এবং তার ছেলে চলে গেছে। অর্ধেক খোলা দরোজা পেরিয়ে সে বাইরে এসে ডানে-বায়ে তাকিয়ে দেখে ইতোমধ্যে ওরা সরু গলির শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে।

[**গল্পসূত্র :** 'ঘৃণা' গল্পটি পারভিন ফায়েজ জাদাহ্ মালালের 'পশতু' ভাষায় রচিত এবং অ্যান্ডার্স উইডমার্কের ইংরেজিতে অনূদিত 'হেইট্' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি ২০১১ সালের মে সংখ্যা 'ওয়ার্ডস্ উইদআউট বর্ডার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। গল্পটি তেলেগু ভাষায়ও অনূদিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : পারভিন ফায়েজ জাদাহ্ মালাল একজন কবি এবং ছোটগল্প লেখিকা। তিনি আফগানিস্তানের কান্দাহারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যান। প্রথমে তিনি কিছুদিন পেশাওয়ারে ছিলেন এবং পরে করাচীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তিনি 'পশতু' ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে তিনটি কবিতার বই ছাড়াও ১৯৯৬ সালে তার একমাত্র ছোটগল্প সংকলন 'হোয়াইট পেইজেস্' প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

হামিদ আলিপুর

মাহিনা

আল্লাহ্ জানেন, সম্ভবত প্রতিদিন আমি হাজার বারেরও বেশি এই রেস্টুরেন্টের ভেতর একদিক থেকে অন্য দিকে হাঁটি। প্রতিবার খালি ট্রে হাতে ডাইনিং রুমের শেষ মাথায় যাই এবং টেবিল থেকে নোংরা থালাবাসন, চায়ের কাপ, পানি, মদ ও কোমল পানির খালি গ্লাস তুলে আনি। আমার কাজ হলো এঁটো থালাবাসন ধোওয়া এবং খাবার শেষে টেবিল থেকে ময়লা জিনিসপত্র তুলে এনে টেবিল পরিষ্কার করা।

এটা খুবই মজার ব্যাপার যে আমি এমন এক পরিবেশ থেকে এসেছি, সেখানে মানুষেরা রান্না করে এবং থালাবাসন ধুয়ে এত টাকা উপার্জন করতে পারে না। কিন্তু এখানে এসব কাজ করে অনায়াসে জীবনযাপন করা যায়। রেস্টুরেন্টে কাজ না করলে হয়তো আমার কোনো রোজগার থাকত না।

রেস্টুরেন্টের মালিক দোকান খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কাজ করে। সে ছাড়া আমরা সাতজন কর্মচারী। আমরা বিভিন্ন দেশের এবং সম্প্রদায়ের, যেমন কালো, সাদা, চায়নীজ, হিস্পানিক, ইরানীয়ান এবং আফগান। আমার বেশির ভাগ সময় কাটে রান্নাঘরে। ওখানে একজন পাচক, তার সহকারী এবং আমি কাজ করি। হাড়িপাতিলের টুং টাং, স্যুপের টগবগানি এবং কলের পানি পড়ার শব্দ মিলে রান্নাঘরের গুমোট বাতাসে এক অন্যরকম আওয়াজ সৃষ্টি হয়। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য কেউ কারোর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার ফুরসত পাই না।

রেস্টুরেন্টের মালিক একজন ইরানীয়ান। সে অঢেল ধন-সম্পত্তির মালিক, কিন্তু বেশি কথা বলে। সময় ও সুযোগ পেলে সে মদ্যপান করে মাতাল হয়। তখন সে দীর্ঘ সময় ধরে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে রীতিমতো জ্ঞান দান করে। একদিন সে বলেছে, আকাশ থেকে লাফিয়ে এই বিশাল সম্পত্তি তার কোলে এসে পড়েনি, কিংবা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেও পায়নি।

www.pathagar.com

সে আমাকে প্রায়ই বলে, 'এ অবস্থায় এসে পৌঁছানো পর্যন্ত আমি তোমার মতো কঠিন পরিশ্রমের কাজ করেছি।'

আমি জানি না, কেন সে আমাকে এ ধরনের কথা বলে। তবুও মাঝে মাঝে ভাবি, মালিক কি চায় আমি তার জন্য আরো বেশি কাজ করি, নাকি সে আমার অসহায় জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে কটাক্ষ করে স্মরণ করিয়ে দেয়?

আমার মামা মালিকের বন্ধু। আমেরিকায় আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই মামা আমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে এ কাজটি যোগাড় করে দিয়েছিলেন। তবে প্রথম দিন থেকেই আমি কাজটি মোটেও পছন্দ করতে পারিনি। যে মানুষ জীবনে কখনও একটা থালা-বাটি, কাপ কিংবা গ্লাস ধোয়নি, এ ধরনের কাজ তার জন্য অনেক কঠিন।

যেদিন আমি প্রথম রেস্টুরেন্টের রান্নাঘর দেখি, সেদিন কিছুতেই আমার মাথায় আসেনি এই এতটুকু রান্নাঘরে কেমন করে এতো মানুষের জন্য খাবার তৈরি করা হয়। একজন বেরসিক ম্যানেজারের অধীনে সবাই কাজ করে। কাজের সময় আমরা যন্ত্রের মতো কাজ করি। তবে কদাচিৎ কাজের ফাঁকে সময় পেলে আমি চুপচাপ আপন মনে ভাবি।

আমেরিকায় না এলে আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে এখানে এ রকম ঢাউস সাইজের পাতিল আছে। এগুলো দেখলে আফগানিস্তানে আমার ভাইয়ের বিয়ের কথা মনে পড়ে, এমনকি চোখের সামনে আগা লালার মুখটা ভেসে ওঠে। ভাইয়ের বিয়ের সময় আগা লালা রান্না করেছিল। যদিও সে ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ এবং রসকষহীন, কিন্তু একবার তার সঙ্গে আলাপ করলে বুঝা যায় আসলে সে একজন অত্যন্ত দয়ালু এবং জ্ঞানী লোক।

এই রেস্টুরেন্টে পোলাও রান্না করা হয় না। এ সব বিশাল পাতিলে ওরা আফগানি 'শোরবা'র মতো এক ধরনের খাবার রান্না করে, যা ওদের ভাষায় স্যুপ। এ স্যুপ কয়েক শ' মানুষের জন্য পর্যাপ্ত এবং রেস্টুরেন্টের মালিক হাজার হাজার ডলার আয় করে। মাঝরাতে এই হতভাগা আমি এ সব বিশাল পাতিল, থালা-বাসন, চামচ এবং গামলা ধুয়ে মুছে সাফ করি। আমি কখনই কারোর সঙ্গে আমার মন খারাপের গল্প কিংবা বিরক্তি নিয়ে আলাপ করি না, বরং এ হেন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি।

অনেকের মুখে আমি শুনেছি যে তারা আমেরিকায় এসে হয় পেট্রোল পাম্পে কাজ করে, নতুবা আমার মতো কোনো রেস্টুরেন্টে সপ্তাহে ৬০ বা ৭০ ঘণ্টা থালা-বাসন ধোওয়ার কাজ করে। সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের কথা আলোচনা করার আগে আমি ওদের একই মর্মান্তিক জীবনকাহিনী বারবার

www.pathagar.com

শুনতে রীতিমতো বাধ্য হই। আমার কানের ভেতর সারাক্ষণ ওদের কথা অনুরণিত হয়। অথচ আমার পকেট গড়ের মাঠের মতো ফাঁকা। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে আমাকে এ কাজ করতে হয়। ঘরে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। আমি তো অবুঝ বালক নই যে, আমার কাজের চাপ বুঝব না। আমি ভালো করেই বুঝি, কিন্তু তারপরেও আমার কাজকে অপছন্দ করি।

আমেরিকা আমাকে ভালো কিছু দিতে পারেনি। কেননা অনেক বছর ধরে পাঠক মহলে আমার একটা পরিচিতি ছিল। আমি ছিলাম একজন লেখক এবং কবি। স্কুল জীবন শেষ করার পরপরই আমি লেখালেখি শুরু করি। কিন্তু আমি জানি, এখানে নিজের ঢোল নিজে বাজালেও কারোর কিছু যায় আসে না। অনেকের সঙ্গে কবিতা কিংবা শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে তাদের কাছে হয় এটা হাস্যকর, নতুবা পাগলামির বহিঃপ্রকাশ। একবার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা বই ধার করে এনেছিলাম। বইটার নাম ছিল 'পশ্চিমাদের সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না'। তিন রাতেই আমি বইটা পড়ে শেষ করেছিলাম। এখন আমি পশ্চিমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

যাহোক, কোনো কাজ না থাকার চেয়ে রেস্টুরেন্টে ধোওয়া মোছার কাজটা ঢের ভালো। অর্থাৎ কোনো কাজ না থাকলে আমার কোনো উপার্জনও থাকত না। আমি প্রথম মাহিনা পাবার প্রতীক্ষায় ছিলাম। এ টাকা দিয়ে আমি পাঁচ বছর বয়সী ছেলের জন্য কিন্ডারগার্টেনে যাওয়ার আগে স্কুলের পোশাক, খাতা ও পেন্সিল কিনতে চেয়েছিলাম। কিছু টাকা যাতায়াতের খরচ বাবদ স্ত্রীকে দেওয়ার জন্য ভেবেছিলাম, যাতে সে শহরের কলেজে গিয়ে ইংরেজি ভাষাটা শিখতে পারে। এ সব খরচের পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা দিয়ে সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিনতে চেয়েছিলাম।

বেলা দু'টো থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করি। রেস্টুরেন্টের মালিক জানে যে আমার সীমিত ইংরেজি দিয়ে আমি ভালো কোনো কাজ পাবো না। তাই আগ্রহ নিয়ে যত ভালো কাজ করি না কোন, সে কখনই আমার মাহিনা বাড়াবে না।

সব সময় অনুযোগের ভঙ্গিতে আমার স্ত্রী বলে, 'কাজের জন্য রেস্টুরেন্টের মালিক মিস্টার জাবেদ তোমার মতো একজন অসহায় মানুষকে পেয়েছে।'

যদিও আমি স্ত্রীর সঙ্গে সহমত পোষণ করি, কিন্তু তার কথার পিঠে কোনো কিছু বলি না।

www.pathagar.com

এখনও আমার কোনো গাড়ি হয়নি। মনে মনে ভেবে রেখেছি প্রথম যে গাড়ি কিনব, সেটা হবে স্ত্রীর জন্য। যদিও আমরা গাড়ি চালানোর কোনো নিয়ম-কানুন জানি না, তবুও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার স্ত্রী এবং আমি গাড়ি চালানোর গাইড বই পড়ি।

আমি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করি, সেটা বাসা থেকে অনেক দূরে। পুরো পথ বাসে যাওয়া যায় না। প্রথমে বাস স্টপেজে যেতে আমাকে প্রায় দু' মাইল পথ হাঁটতে হয়। সেখানে বাসের জন্য পনের-কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করে রেস্টুরেন্টের কাছাকাছি বাস স্টপেজে যেতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে। তারপর ওখান থেকে রেস্টুরেন্টে পৌঁছতে আরো কুড়ি মিনিট হাঁটতে হয়।

বাসা থেকে আমি আনুমানিক দুপুর সাড়ে বারোটায় বের হই এবং ফিরি রাত একটার পরে। স্ত্রীকে সব সময় বলি, সে যেন আমার জন্য রাত জেগে অপেক্ষা না করে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুতেই সে আমার কথা শোনে না। আমি না ফেরা পর্যন্ত সে তন্দ্রালু চোখে আমার জন্য অপেক্ষা করে। এ কারণেই রেস্টুরেন্টের এ চাকরিটা আমার জীবনের সব আনন্দ ও সুখ কেড়ে নিয়েছে।

মাঝরাতে ফেরার সময় বাস অনেকটা খালি থাকে। আগের রাতে আমি যে সমস্ত যাত্রীদের বাসের সিটে বসা দেখেছি, তারা আজও সেই একই সিটে বসা। গতরাত থেকে আজ তাদের আচরণ একটুও বদলায়নি। মনে হয় আমরা সবাই এই বাসের অংশ।

বাসের ভেতর একজন মোটা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা। আমার মতো সেও হয়তো কোনো হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ শেষে বাসায় ফিরছে। ক্লান্তিতে সে বাসের সীটে হেলান দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। যতবার ড্রাইভার বাস থামায়, ততবারই বাসের ভেতর ঝাকুনি লাগে। তখন সে চোখের পাতা খানিকটা খুলে একটু নড়েচড়ে বসে এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়।

বাসে একটা যুবক ছেলেও আছে। দেখে মনে হয় সে ছাত্র। কেননা তার সঙ্গে স্কুলের ব্যাগ এবং হাতে বই। ছেলেটি বাসের প্রথম সিটে বসে আপন মনে বই পড়ে। বইয়ের পৃষ্ঠায় তার গভীর মনোযোগ। সে কখনও জানালা গলিয়ে বাইরে তাকায় না, এমনকি অন্য যাত্রীদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কিছুতেই আমার বোধগম্য হয় না, সে কেমন করে বুঝতে পারে কখন তার গন্তব্যে বাস থামবে।

সাধারণত আমি বাসের মাঝামাঝি সিটে বসি এবং জানালার কাচের ভেতর থেকে বাইরের দোকানপাট আর রাস্তাঘাট দেখি। তখন আমার

www.pathagar.com

মস্তিষ্কের ভেতর হাজার চিন্তার ঠোকাঠুকি টের পাই, কিন্তু এসব চিন্তা কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।

কয়েকজন মাতাল ছাড়া বাসের যাত্রীদের ভেতর তেমন কোনো তারতম্য দেখা যায় না। গুটিকয়েক যাত্রী বাসের শেষ দিকে লম্বা সিটে সটান শুয়ে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে বেশ জোরে কথা বলে। অনেক সময় তরুণীরা কোলের শিশুদের নিয়ে বাসে ওঠে। আবার অনেক সময় অন্য বয়স্কা মহিলারাও বাসে ওঠে। আল্লাহ্ মালুম, তারা এত রাত পর্যন্ত কি করে।

বাসের চালক বয়স্ক, কিন্তু খুবই বন্ধুবৎসল। কখনও কখনও সে সামনের আয়নায় তাকিয়ে দেখে পেছনে কারা জোরে কথা বলে। তখন সে তাদের উদ্দেশে বলে, 'আস্তে কথা বলুন।'

তখন যাত্রীরা চুপ করে, কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আবার জোরে কথা বলা শুরু করে।

এখনও সেই রাতের ভয়ঙ্কর স্মৃতি আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সেদিন ছিল ১১ জুন এবং কাজে যোগদানের ঠিক পনের দিন। সেদিনই আমি মাহিনা পেয়েছি, যা এক এবং পাঁচ ডলারের নোট। যদিও আমার সামনেই মালিক বেশ ধীরেসুস্থে ডলারগুলো গুনে আমার হাতে দিয়েছে, তবুও আমি নিজে আবার গুনেছি। সর্বমোট দু'শ পঁচিশ ডলার। আমি ডলারগুলো ওয়ালেটের ভেতর রাখি। আমার মামা আমাকে ওয়ালেটটি উপহার দিয়েছিলেন। প্রথম মাহিনা পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভেবেছিলাম ডলারগুলো দিয়ে জীবনের কি কি সুখ কেনা যেতে পারে।

যাহোক, সবকিছুর আগে আমি ভেবেছি আমার ছেলের কথা। ও সবেমাত্র কিন্ডারগার্টেনে যাওয়া শুরু করেছে। ওর জন্য স্কুলের পোশাক, একটা ব্যাগ এবং কয়েকটা খেলনা কিনতে হবে।

অনেকেই আমাকে অনেকবার বলেছে যে আমেরিকায় সাথে করে বেশি ডলার নিয়ে চলাফেরা করা উচিত নয়। কেননা পথে ছিনতাইকারীর হাতে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু আমি চাইলেই হবে না। মালিক আমাকে পনের দিন পরপর প্রতি মাসে দু'বার নগদ মাহিনা দেবে। কাজ শেষে আমার চেহারা বড়ই শোচনীয়। চোখেমুখে ক্লান্তি, এলোমেলো চুল এবং পরনে জীর্ণ পোশাক। আমাকে দেখে কারোর মনে হবে না যে আমার সঙ্গে এতগুলো ডলার আছে।

রাত সাড়ে বারোটায় বাড়ি ফেরার জন্য যখন আমি বাস থেকে নামলাম, তখন আমার দারুণ তেষ্টা পেয়েছে। এই মধ্যরাতে তেষ্টা পাওয়া আমার

www.pathagar.com

জীবনে প্রথম। কোমল পানীয় কেনার জন্য আমি একটা দোকানে ঢুকলাম।

দোকানের ভেতর কয়েকটা যুবক অনাগ্রহে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টিয়ে দেখছিল। যখন কোনো খদ্দের দরোজা দিয়ে ঢোকে, তখন বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে যুবকগুলো ট্যারা চোখে তাকিয়ে আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় জোরে হাসাহাসি করে। আমি জানি এ সময় ওদের দিকে ফিরে না তাকানোই শ্রেয়। যেখানেই আমি যখন বিপদের কোনো সম্ভাবনা আঁচ করতে পারি, তখনই আমি ভিন্ন পথে যাওয়ার চেষ্টা করি।

যাহোক, আমি একটা কোমল পানীয় নিয়ে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে দোকানীকে দাম পরিশোধ করি।

সারাদিন রেস্টুরেন্টে প্রচণ্ড পরিশ্রম করার জন্য আমি ভীষণ ক্লান্ত। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। আমি ঢকঢক করে প্রায় এক নিঃশ্বাসে সবটুকু খেয়ে ফেলি। মনে হল, আমার দেহের সমস্ত ক্লান্তি যেন এক নিমিষে উবে গেল।

তাড়াতড়ি বাড়ি পৌছানোর জন্য আমি পা বাড়ালাম। কয়েক কদম যাওয়ার পরই প্রচণ্ড জোরে গাড়ি থামানোর আওয়াজ পেলাম। গাড়ির ভেতর থেকে কয়েকজন যুবক প্রায় চিৎকার করে বলছে, 'সে একা। সঙ্গে কেউ নেই।'

আমি ভালো করে তাকালাম, কিন্তু ভয় পাবার মতো কোনো আলামত দেখতে পেলাম না। কিন্তু এ রাস্তাটা ছিনতাই এবং রাহাজানির জন্য প্রসিদ্ধ। যাহোক, মাঝরাতে এ ধরনের নির্জন রাস্তায় একদল যুবকের মুখোমুখি হলে যে কেউ ভয় পাবে।

চটজলদি ওরা গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ওদের মধ্যে একজনকে আমি কিছুক্ষণ আগে দোকানে দেখেছি। চেহারা দেখে ওকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হল। ওর হাতে এক বোতল মদ এবং দু'ঠোটের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। আরেকজন আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল, যা আমি মোটেও বুঝতে পারিনি।

একসময় সে আমাকে রীতিমতো হুকুমের স্বরে বলল, 'যদি বাঁচতে চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি তোমার ওয়ালেট বের করে দাও।'

এ ব্যাপারে লোকজনেরা আগেই আমাকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু এটা যে সহসাই আমার জীবনে ঘটবে, তা আমি মোটেও ভাবতে পারিনি। যাহোক, আমি এক মুহূর্তের জন্য ভাবলাম। আমি যদি এখন এই মাতালদের বাঁধা দিই, তবে হয়তো সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারব। কিন্তু এই ঘটনা যদি আমার দেশে হতো, তাহলে এতক্ষণে

www.pathagar.com

তুমুল মারাপিট শুরু হয়ে যেত।

কোনো ধরনের বাঁধা না দিয়ে আমি ধীরে সুস্থে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করি। যে যুবকটি আমাকে গালাগালি করছিল, ওয়ালেটটা আমি ওর হাতে তুলে দিই। তারপরও ও আমাকে চিৎকার করে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল। যাহোক, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, যদি স্বেচ্ছায় ওয়ালেট না দিই, তবে নির্ঘাত ওরা আমাকে মারত। ওয়ালেট পেয়ে ওরা গাড়িতে চেপে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল। আমার পেছনে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক পুরো ঘটনা দেখেছিল। যুবকগুলো চলে গেলে তারাও ভিন্ন রাস্তা ধরে চলে যায়।

হতভম্বের মতো আমি কয়েক মিনিট নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকি। অবশেষে একসময় বাড়ির দিকে পা বাড়লাম। আমার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। সত্যিকার দুঃখ পেলে কিংবা কঠিন কোনো দুঃসংবাদ পেলে পুরুষ মানুষের চোখে এ ধরনের বোবা কান্নার উষ্ণ ফোঁটা জমা হয়। কিন্তু টাকার জন্য আমার চোখে অশ্রু জমেনি, বরং আমার অসহায়ত্বের জন্যই হয়েছে। আমার কেন জানি মনে হল, এই নির্জন রাস্তায় ওরা আমাকে একা পেয়ে ধর্ষণ করেছে। আমি ওদের বাঁধা দিতে পারিনি, এমনকি হালকা প্রতিবাদও করতে পারিনি। ওরা শুধু আমার মাহিনার সব ডলার ছিনতাই করেনি, বরং সঙ্গে করে আমার অহংকারটুকুও নিয়ে গেছে। ওরা আমার সব আশা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। সে সময় আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাঁচ বছর বয়সী ছেলের নিষ্পাপ মুখ। ও হয়তো গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। আর স্ত্রী হয়তো তন্দ্রালু চোখে আমার আগমনের জন্য দীর্ঘ প্রতিক্ষার প্রহর গুনছে।

ইতোমধ্যে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে এবং আমি বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করি।

[**গল্পসূত্র :** 'মাহিনা' গল্পটি হামিদ আলিপুরের 'দ্য ওয়েজেস্' গল্পের অনুবাদ। 'দারি' ভাষা থেকে গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ফরহাদ আজাদ। ইংরেজিতে গল্পটি ২০০০ সালের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গল্পটি জোহরা সাঈদ, ওয়ালী আহমাদি এবং ফরহাদ আজাদ সম্পাদিত 'ড্রপ বাই ড্রপ উই মেইক এ রিভার' অডিও সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।]

লেখক পরিচিতি : হামিদ আলিপুর একজন আফগান লেখক। তার সম্পর্কে বিশদ জানা যায়নি।

www.pathagar.com

নুশীন আরবাবজাদাহ্

স্পটলাইটের নিচে থমকে থাকা খরগোশের মতো

তুমি জিজ্ঞেস করলে, 'ঘটনা কি আমেরিকায় ঘটেছে?'

তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলেছি, 'না, ঘটনা ওখানে ঘটেনি।'

তুমি বললে, 'আমেরিকা সম্পর্কে আমি জানি। ওখানে মেয়েরা উড়নচণ্ডী হয়। আফগান মেয়েরা ওখানে গিয়ে খারাপ হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'কেমন করে?'

তুমি বললে, 'ওখানে ওরা নাচের পার্টিতে যায়। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে, এমনকি নোংরামীও করে।' বলেই সঙ্গে সঙ্গে তুমি বললে, 'তওবা' এবং গায়ের লাল শালটা টেনে ঢেকে দিলে তোমার শরীর।

তোমার আচরণ দেখে আমি কিছু বললাম না।

তুমি বললে, 'আমি জানি, এ সব আমেরিকাতে ঘটে।'

এবারও আমি কিছু বললাম না।

তুমি বললে, 'মনে আছে, যখন ছোট ছিলাম, তখন কার্পেটের উপর আমরা খেলতাম।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মনে আছে।'

বলেই প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দু'ঠোঁটের ফাঁকে চেপে অগ্নি সংযোগ করি।

'সব সময় তুমি আমেরিকার পক্ষপাত করতে, আর আমি ছিলাম সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে। আমরা একে অন্যকে বোমা মারতাম,' হাসতে হাসতে তুমি বললে। হাতের ইশারায় বাতাসে একটা অদৃশ্য যুদ্ধবিমান উড়িয়ে মুখে দীর্ঘ সময়ের জন্য উশ্ শব্দ করে বললে, 'ঠিক এ রকম।' তারপর বোমা ফাটার মতো বিকট আওয়াজ করলে 'বুম'।

'এবং সেটা আফগানিস্তানে,' আমি বললাম।

তুমি জিজ্ঞেস করলে, 'তাহলে তুমি কি আমেরিকাতেই সিগারেট ধরেছ?'

আমি কিছু বললাম না।

www.pathagar.com

'ও দেশের মেয়েদের সম্পর্কে বলো,' প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে তুমি বললে।

আমি বললাম, 'আমেরিকার প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের কথা বলব। ইউটাহ্ সম্পর্কে বলব, যেখানে অবাধ্য লোকেরা পাথর হয়ে গিয়েছে।'

তুমি ভুরু কুঁচকে বললে, 'ওটা বিরক্তিকর।'

আমি বললাম, 'তাহলে ভল্লুক সম্পর্কে বলব। ও দেশে ভল্লুকদের নিয়ে অনেক জায়গার নাম আছে, যেমন ধরো 'স্মোকি বেয়্যার'।'

তুমি বললে, 'ভল্লুকরা বিরক্তিকর। ও দেশের মেয়েদের সম্পর্কে বলো। ওরা কি সুন্দরী?'

এবারও আমি কিছু বললাম না।

তুমি বললে, 'মনে আছে, ওরা কাবুলের আমেরিকার দূতাবাসের বাইরে প্রতিবাদ সভা করতে রীতিমতো আমাদের বাধ্য করেছিল?'

আমি বললাম, 'এবং শুরুতে সেখানে কোনো বিদ্যুৎ ছিল না। মাইক্রোফোন কাজ করেনি। তখন দূতাবাসের ভেতর থেকে এক লোক একটা জেনারেটর নিয়ে এসেছিল।'

বলেই আমি আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে তাকালাম।

তুমি বললে, 'সেই লোকটা জেনারেটর চালু করে মাইক্রোফোনের সুইচ অন করে দিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'এবং আমরা চিৎকার করে বলেছিলাম, আমেরিকা দীর্ঘজীবী হোক।'

আমার কথা শুনে তুমি হাসলে।

আমি বললাম, 'সেদিন আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।'

তুমি বললে, 'সত্যি? আমি খেয়াল করিনি।'

তোমার হেঁয়ালী মুখ উপেক্ষা করে আমি আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করি।

তুমি বললে, 'সেই সব দিনগুলো মধুর ছিল।'

আমি বললাম, 'আমরা তখন ছোট ছিলাম।'

তুমি বললে, 'আমরা চিৎকার করে বলেছিলাম, আমেরিকা দীর্ঘজীবী হোক।'

আমি বললাম, 'আসলে ওরা খারাপ মানুষ নয়।'

ওদের সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য শুনে তুমি সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকালে।

'ওরা মন্দ লোক নয়,' পুনরাবৃত্তি করে আমি বললাম।

www.pathagar.com

তুমি বললে, 'আমি জানি, তুমি কেন এ কথা বলছ।'

আমি কোনো কথা বললাম না।

তুমি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললে, 'আমেরিকার মেয়েদের সম্পর্কে বলো।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কোনটার কথা বলব?'

তুমি বললে, 'যাদের তুমি চেনো।'

আমি বললাম, 'ওরা তো মেয়ে।'

তুমি বললে, 'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।'

চোখেমুখে না বোঝার ভাণ করে আমি বললাম, 'আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি জানতে চাচ্ছ।'

তুমি নিশ্চিত হয়ে বললে, 'তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ আমি কি জানতে চাচ্ছি।'

আমি বললাম, 'তোমার কি মনে আছে, সেদিন আমেরিকার দূতাবাসের বাইরে কি ঘটেছিল?'

তুমি বললে, 'ওরা আমাদের জোর করে শ্লোগান দিতে বাধ্য করেছিল, আমেরিকা নিপাত যাক।'

আমি বললাম, 'এবং আমরা সোচ্চার কণ্ঠে বলেছিলাম, আমেরিকা নিপাত যাক।'

তুমি বললে, 'ওটা আজ অতীত, আর এখন হলো বর্তমান।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ওরা একই মানুষ। একই আমেরিকাবাসী।'

তুমি বললে, 'তখন ওরা বন্ধু ছিল, এখন আর নেই।'

আমি জানতে চাইলাম, 'তাহলে এখন ওরা কারা?'

তুমি বললে, 'ওরা এখন আমাদের শত্রু।'

আমি বললাম, 'আমি জানি, কেন তুমি এ কথা বলছ, কিন্তু তোমার ধারণা ভুল।'

তুমি বললে, 'তুমি তোমার বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ। আমি জানি, কেন?'

আমি কিছু বললাম না।

আমার মৌনতা দেখে তুমি অভিমানে মুখ গোমড়া করলে।

আমি বললাম, 'ও রকম করো না।'

তুমি প্রশ্ন করলে, 'কি রকম?'

আমি বললাম, 'তুমি জানো, কোন রকম।'

www.pathagar.com

বলেই আমি আমার দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।

তুমি বললে, 'তুমি যদি জানোই, তাহলে বলছ না কেন?'

আমি বললাম, 'কোন বিষয়ে বলব?'

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তুমি পাল্টা প্রশ্ন করলে, 'ঘটনা কি আমেরিকাতেই ঘটেছিল?'

আমি কিছু বললাম না।

তুমি জোর দিয়ে বললে, 'জানি, এটা আমেরিকাতেই ঘটেছিল।' তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে, 'মেয়েটি কে?'

আমি বললাম, 'তুমি কি সত্যি জানতে চাচ্ছ?'

আমার প্রশ্ন শুনে তুমি কয়েক পলক ভাবনার অথই পানিতে সাঁতার কাটলে। আমি এই ফাঁকে আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বার কয়েক সুখটান দিই এবং তুমি তোমার জন্য চায়ের কাপে আরেকবার চা ঢাললে। তারপর চায়ে আলতো ঠোঁটে চুমুক দিয়ে বললে, 'তোমার কি মনে আছে, আমাদের শিক্ষক কিভাবে 'Peace Corps'কে ভুল উচ্চারণ করতেন?'

আমি বললাম, 'তিনি উচ্চারণ করতেন, Piss Corps.'

একই সঙ্গে দু'জনে হেসে উঠলাম।

তুমি বললে, 'তিনি প্রায়ই বলতেন আমেরিকানরা বাথরুমে ঢুকে 'pee perfume' করে।'

আবারো একই সঙ্গে দু'জনে হেসে উঠলাম।

তুমি বললে, 'ছোটবেলার সেইসব দিনগুলো কতই না মধুর ছিল।'

আমি বললাম, 'আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম, কিন্তু সবকিছু বুঝতে পারতাম।'

তুমি বললে, 'আমি বুঝতাম না।'

আমি বললাম, 'কারণ তুমি একজন মহিলা।'

তুমি বললে, 'আমাকে খোঁচা দেবে না, নইলে তোমাকে চড় মারব।'

আমি বললাম, 'দেখো, আমেরিকা নাহলে তুমি এমন সাহসী হতে পারতে না।'

সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রশ্ন করলে, 'কি বললে?'

আমি বললাম, 'ওরা নারীদের স্বাধীকার আদায়ের জন্য উৎসাহ দেয়। কি, দেয় না? ওরা মহিলাদের চাকুরিতে দরখাস্ত করার জন্য উৎসাহ দেয়। কি, দেয় না?'

www.pathagar.com

তুমি বললে, 'আমি কাজ করি, কিন্তু ওদের জন্য করি না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ওদের ছাড়া তো এদেশে তালেবানদের রাজত্ব চলত এবং তুমি কিছুতেই বাইরে কাজ করতে পারতে না।'

তুমি বললে, 'আমি তালেবানদের ঘৃণা করি।'

আমি বললাম, 'এদেশে আমেরিকার সৈন্যরা না থাকলে ওরা আবার দেশটাকে দখল করে নেবে।'

কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের খানিকটা প্রলেপ মেখে তুমি বললে, 'না, ওরা আর ফিরে আসবে না। এলে আমরা ওদের রুখব।'

আমি বললাম, 'ওরা ফিরে এলে আমি ওদের রুখব না। আমার ভয় করে।'

তুমি বললে, 'আমি জানি, কেন? তুমি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ।'

আমি বললাম, 'আমি ঘরের ভেতর থাকব এবং তোমাদের যুদ্ধ করার সুযোগ করে দেব। তবে ওরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। কেননা, তুমি একজন অবলা নারী।'

তুমি বললে, 'তখন তো ওরা মহিলাদের মেরেছে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

বলেই আমি পুনরায় আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করি।

তুমি বললে, 'তোমাকে পেলে ওরা মারবে। বলবে, তুমি একজন গুপ্তচর।'

আমি বললাম, 'হয়তো বা।'

তুমি বললে, 'এটা বিরক্তিকর। আমেরিকা সম্পর্কে আরো বলো।'

আমি বললাম, 'কল্পনা করো, সাদা একটা খরগোশ স্পটলাইটের নিচে ধরা পড়েছে।'

তুমি বললে, 'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'যখন তুমি আমেরিকায় যাবে, ঠিক এ রকম মনে হবে।'

তুমি বললে, 'কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'স্পটলাইটের নিচে ধরা পড়া খোরগোশের মতো তুমি অবাক বিস্ময়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবে।'

সঙ্গে সঙ্গে তুমি মাথা নেড়ে বললে, 'তওবা।'

আমি বললাম, 'বিশ্বাস করো, যখন তুমি আমেরিকায় যাবে, তখন তোমার অবস্থা এ রকমই হবে।'

তুমি জোর দিয়ে বললে, 'না, হবে না।'

www.pathagar.com

আমি বললাম, 'তুমি কেমন করে জানলে?'

তুমি বললে, 'কারণ আমি একজন নারী এবং আমি আমার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।'

আমি কিছু বললাম না।

'Piss Corps,' একটু বাদে চারপাশের নীরবতাকে ভেঙে আমি বললাম।

'Piss Corps,' তুমি আমার কথার সঙ্গে তাল রেখে বললে এবং হাসতে শুরু করলে। হাসতে হাসতে আরো বললে, 'এবং ওরা বাথরুমে গিয়ে 'pee perfume' করে।'

'এবং ওদেশের মেয়েদের শরীরে একটাও পশম নেই,' আমি বললাম।

'এবং রাস্তাঘাট ফাঁকা। কেননা সবাই তখন কাজে,' তুমি বললে।

'শুধুমাত্র সকালবেলা ছাড়া। তখন নিউইয়র্কের সড়কে দলে দলে নারী এবং পুরুষরা পায়ে হেঁটে কাজে যায়,' আমি বললাম। একটু থেমে আরো বললাম, 'দালানের অনেক উঁচু থেকে ওরা নিচের একটা পিঁপড়াও খুঁজে নিতে পারে।'

'কিন্তু ওরা তালেবানদের খুঁজে পায় না,' মন্তব্যের সুরে তুমি বললে।

'এটা ভিন্ন বিষয়,' আমি বললাম।

'কতটুকু ভিন্ন?' সরাসরি তুমি জানতে চাইলে।

'তালেবানরা অন্য আর দশজনের মতোই,' আমি বললাম।

'এটা বিরক্তিকর,' ভুরু কুঁচকে তুমি বিরাগ প্রকাশ করলে। তারপর বললে, 'আমেরিকার মেয়েদের সম্পর্কে বলো। ওরা দেখতে কেমন?'

'আমাদের চেয়ে ওরা আলাদা,' আমি বললাম।

'ওরা কিভাবে আলাদা?' তুমি জিজ্ঞেস করলে।

'জানতাম, তুমি এ প্রশ্নটাই করবে,' আমি বললাম।

'তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ,' তুমি বললে।

'ওরা আলাদা,' পুনরায় আমি বললাম।

'কিন্তু কিভাবে আলাদা?' তুমি আবারো জিজ্ঞেস করলে।

'জানি না,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি জানো,' আস্থার সঙ্গে জোর গলায় বলেই তুমি চাপা অভিমানে মুখটা গম্ভীর করে ফেললে।

তোমার অভিমানী মুখটা দেখে আমি বললাম, 'ওরা সবাই এক ধরনের না। অনেকেই বেশ দয়ালু এবং ভালো। তবে অনেকে আবার তেমন নয়।'

www.pathagar.com

তুমি জিজ্ঞেস করলে, 'দয়ালু, কেমন ধরনের দয়ালু?'

আমি বললাম, 'এই আর কি!'

তুমি বললে, 'ওরা কি সুন্দরী?'

আমি পাল্টা জানতে চাইলাম, 'কোন মেয়ের কথা বলছ?'

তুমি বললে, 'কোন মেয়ে বলতে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'আমেরিকায় অভিবাসী আফগান মেয়ে, নাকি খোদ আমেরিকার মেয়ে?'

তুমি বললে, 'উভয়ই।'

আমি বললাম, 'ওহ, তাই!'

তুমি ফের জিজ্ঞেস করলে, 'তাই মানে কি?'

আমি বললাম, 'ওরা সবাই দেখতে বেশ সুন্দরী।'

তুমি কিছু না বলে চুপ করে থাকলে।

আমি বললাম, 'এই, কি হল?'

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে তুমি নিশ্চুপ থাকলে।

তোমার মৌনতা দেখে আমি বললাম, 'দেখো, সে জন্যই আমি তোমার কথার কোনো জবাব দিতে চাইনি।'

আমার কথা শুনে তুমি হাসলে।

আমি বললাম, 'জানতাম, তোমার প্রশ্নের জবাব দিলে এ ধরনের কিছু একটা ঘটবে।'

বলেই আমি আবারো আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করি। তুমি তোমার জন্য আরেক কাপ চা ঢাললে। তারপর সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালে। আমরা একসঙ্গে হেসে উঠলাম। একসময় হাসি থেমে গেলে তুমি জিজ্ঞেস করলে, 'মেয়েটি কে?'

আমি বললাম, 'আরেক সময় বলব।'

[**গল্পসূত্র** : 'স্পটলাইটের নিচে থমকে থাকা খরগোশের মতো' গল্পটি নুশীন আরবাবজাদাহর ইংরেজিতে 'লাইক এ রেবিট কট ইন দ্য স্পটলাইট' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি জোহরা সায়িদ এবং সাহার মুরাদি সম্পাদিত 'ওয়ান স্টোরি, থার্টি স্টোরিজ : অ্যান এনথ্রোলজি অব কন্টেম্পোরারি আফগান আমেরিকান লিটারেচার' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : নুশীন আরবাবজাদাহ একজন লেখিকা, সাংবাদিক, সমালোচক এবং অনুবাদক। তাঁর শৈশবের খানিকটা সময় কেটেছে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখলের পর পরিবারের সঙ্গে তিনি জার্মানিতে গমন

www.pathagar.com

করেন। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউরোপের ভাষা এবং মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া লজ্ অ্যাঞ্জেলেসের 'সেন্টার ফর ইন্ডিয়া এন্ড সাউথ এশিয়া' বিভাগে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। ক্যালিফোর্নিয়া যাবার আগে তিনি লন্ডনের ব্রিটিশ কাউন্সিলে কাজ করেছেন। ২০০৫ সালে বিবিসি-তে যোগদান করেন। সেখানে তিনি সমকালীন আফগানিস্তানের সংবাদ মাধ্যম, রাজনীতি এবং সামাজিক ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। লন্ডন থেকে ২০০৭ সালে তাঁর প্রথম বই 'ফ্রম আউটসাইড ইনঃ রিফিউজিস্ এন্ড ব্রিটিশ সোসাইটি' প্রকাশিত হয়। ইরানের কারাভোগী প্রখ্যাত সাংবাদিক হুসাং আসাদির আত্মজীবনী অনুবাদ করে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেন। এছাড়া ইরানের স্বনামধন্য লেখক সাদেক হেদায়েতের ছোটগল্প সংকলন সম্পাদনা করেন। তিনি লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার অনলাইনে সমকালীন আফগানিস্তানের উপর নিয়মিত লেখেন।

www.pathagar.com

কাদের মোরাদি

ভস্মস্তূপ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর

যেদিকেই তাকাই না কেন, আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে লোকটির মুখ। আমার মনে হয়, রাস্তায় কিংবা বাজারে, এমনকি সব জায়গাতেই সে আমাকে অনুসরণ করছে। যখন রাস্তায় পথচলা মানুষের দিকে তাকাই, তখন আমি শুধু তাকেই খুঁজি। লোকটি কাঠের ক্রাচের উপর ভর করে হাঁটে, কেননা তার পা হাঁটুর উপর থেকে কেঁটে ফেলা হয়েছে। পড়নে ময়লা সাদা পোষাক। পোষাকের গায়ে রক্তের শুকনো কালশিটে দাগ। মাথার পাগড়িটা গলার চারপাশে গোল করে পেঁচানো।

এই অদ্ভুত এবং ভয়ার্ত লোকটি আমাকে কিছুতেই একা থাকতে দেবে না, এমনকি রাতের বেলা ঘুমের মধ্যেও নয়। সব জায়গাতেই সে আমার সঙ্গে থাকে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইনি। সে আমার সঙ্গ ছাড়ে না, বরং আমার সঙ্গে সব সময় কথা বলে। আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। সে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে একটা কিছু বলল, যা অর্থহীন এবং পুনরাবৃত্তি।

ভাবলাম লোকটিকে খুঁজে বের করব এবং কথা বলব। প্রয়োজনে তাকে অনুরোধ করব যেন সে আমাকে একা থাকতে দেয়। তাকে বলতে চাই, আমি নিষ্পাপ। আমি এমন কোনো অন্যায় কাজ করিনি, যার জন্য আমাকে অপরাধী হতে হবে। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাইনি।

বাজারের কাঠ বিক্রির দোকানে প্রথম তাকে দেখেছি এবং সে রাতেই আমি পুনরায় আমার ঘরের ভেতর দেখি। তার কাছ থেকে আমি দৌঁড়ে পালিয়ে যাই। আমাদের আর দেখা হয়নি। হয়তো পরে আমি তাকে আরেকবার দেখেছি।

সে রাতে এক মহিলার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন মধ্যরাত। অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও আমি বিছানা থেকে উঠি। ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাতির সুইচ খুঁজে পেতে আমি বেশ কসরত করি। সুইচ খুঁজে পাওয়ার আগেই রাতের

www.pathagar.com

আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে গুলির আওয়াজ এবং সঙ্গে রাতের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ে সেই মহিলার আর্ত চিৎকার।

সুইচ খুঁজে আমি বাতি জ্বালাতে চাইলাম। কেননা আমি দারুণ ভয় পেয়েছি। হয়তো রাস্তায় কেউ কাউকে গুলি করে মেরেছে। কিন্তু বাতির সুইচের কি হল? ঘরের ভেতর কাঠের হিটার জ্বালানো। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হিটারের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। কিভাবে হিটার নিজে নিজেই জ্বলেছে? অনেকদিন ধরেই আমি একা। হিটার দেখলেই আমার মেজাজ গরম হয়। যদিও আমার ঘরটা ঠাণ্ডা, তবুও আমি হিটার জ্বালাই না।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমি হিটারের জ্বলন্ত শিখার দিকে তাকাই। আসলে আমি জেগে আছি কিনা, সেটা পরখ করার জন্য কয়েকবার চোখ দু'টিকে রগড়ে নিলাম। কিন্তু সত্যি আমি জেগে আছি এবং ঘরের ভেতর হিটার জ্বলছে। হিটারের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে আগুনের শিখার প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে কার্পেটের উপর। ভেতরে জ্বলন্ত কাঠ ভাঙার মড়মড় শব্দ হচ্ছিল।

সে সময় আমার বুকের ধুকপুকানি আর শরীরের কাঁপুনি বেড়ে যায়। তবুও আমি আলোটা জ্বালাতে চাইলাম। আর তখনই লোকটির কণ্ঠস্বর আমাকে চমকে দেয়।

'ভয় পেয়ো না ... ভয় পেয়ো না।'

ভয়ে চটজলদি আমি হিটারের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকাই। নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আগন্তুক আমার ঘরের ভেতরেই এবং হিটারের পাশে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে আমি লাফিয়ে উঠি এবং প্রায় চিৎকারের মতো করে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কে?'

লোকটির গলার চারপাশে গোল করে পাগড়ি পেঁচানো। সে নরম সুরে বলল, 'ভয় পেয়ো না।'

লোকটি পঙ্গু। পা নেই। তার পা হাঁটুর উপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। কাঠের ক্রাচে ভর করে সে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভেবে পেলাম না আমার কি করা উচিত। সে হয়তো আমাকে খুন করতে চায়। আমি পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলাম। কিন্তু লোকটি আমাকে রীতিমতো হতবাক করে দেয়। সে কাঁদছে।

সুইচ খুঁজে পেয়ে আমি বাতি জ্বালাই এবং তার দিকে তাকালাম। লোকটির মুখ পরিচিত বলে মনে হল। আগে হয়তো তাকে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায় তাকে দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে আপনি?'

লোকটি হয়তো মারাত্মক ধরণের না। হয়তো সে বিপদে পড়ে আমার এখানে এসেছে।

সে কাঁদছে। তাই আমার কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়নি। তার পরনের পোশাক সাদা, কিন্তু ময়লা এবং সেখানে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ লেগে আছে। হিটারের পাশ থেকে এক টুকরো কাঠ তুলে সে ওটার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকে। তার গাল বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। তাকে কাঁদতে দেখে আমার ভয় কেটে যায়। আমি তাকে চিনতে পারি। সে সেই লোক, যাকে আমি কাঠ বিক্রির দোকানে দেখেছি। আমার মাথা ঘুরতে থাকে। পুনরায় ভয় আমাকে চতুর্দিক থেকে চেপে ধরে। যেদিন আমি দোকান থেকে কাঠ কিনেছিলাম, সেদিন লোকটি দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করেছিল। আমার মনে হয়েছিল, হয়তো অন্য কারোর সঙ্গে সে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে।

সম্ভবত সে আমাকে খুন করতে চায়। আমি তাকে বলতে চাই, আসলে সে অন্য কারোর সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু লোকটি অনবরত কাঁদছে। একসময় হাতের কাঠ দেখিয়ে বলল, 'তুমি কি জানো, এই কাঠ আমাদের বাড়ির জানালার?'

প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি আমার মনে হল, লোকটি কাঠের টুকরো দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করল। কাঠ নাকি তার বাড়ির জানালার। এখন আমি বুঝে গেছি, আসলে লোকটি কি বলতে চায়। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই সে এখানে এসেছে। কয়েকটা কাঠের টুকরো এখন আমার হিটারের ভেতর জ্বলছে। আমি এক দারুণ বিপদের মধ্যে আছি। কোনোভাবেই পালিয়ে যাবার পথ দেখতে পাচ্ছি না। তার কান্না দেখার জন্য আমার মনোনিবেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। হয়তো সে একটা পাগল। পাগলের কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে, সে ওই কাঠ দিয়েই আমার মাথায় আঘাত করে আমাকে মেরে ফেলবে। তবুও ভীতসন্ত্রস্ত গলায় বললাম, 'কিন্তু আমি তো দোকান থেকে কাঠ কিনে এনেছি।'

আমার কথা শুনে লোকটি হাসল। এমন জোরে শব্দ করে হাসল, মনে হলো সে যেন রীতিমতো একটা পাগল। তারপর সে চিৎকার করে উঠল, 'আমি জানি, কাঠ তুমি কিনে এনেছ। কিন্তু তুমি কি জানো, এই কাঠ আমার বাড়ির?'

বলেই লোকটি পুনরায় কাঁদতে শুরু করে। জামার আস্তিনে চোখের পানি মোছে। হিটারের সামনে থেকে আরেকটা কাঠ তুলে নিয়ে সে চিৎকার করে

www.pathagar.com

বলতে থাকে, 'হায় আল্লাহ্, হায় মা'বুদ, আমার বাড়ি... আমার ছেলের বইয়ের সেল্ফ ... আমার ছয় বছরের মেয়ের রক্তের দাগ শুকিয়ে গেছে এই কাঠে। হায় আল্লাহ্ ... আমাদের ঘরের কি হল। তুমি জানো না, আমরা বুলেটের এক পশলা বৃষ্টির মধ্যে ছিলাম। চোখের পলকেই আমার পরিবার হারিয়ে গেল। আমি জানি না, মাটি কি দু'ভাগ করে তাদেরকে অতলে টেনে নিয়েছে, নাকি তারা দূর আকাশে কোথাও উড়ে গেছে। তবে তারা কেউ বাড়িতে নেই। সব জায়গায় আমি খুঁজেছি... আমার স্ত্রী, ছোট্ট মেয়ে, আমার ছেলে, আমার পা দু'টি, এমনকি ঘর, সেল্ফ এবং দরজা। তুমি জানো না, ওগুলো কোথায়? হুম? না, তুমি জানো না। তুমি শুধু কাঠ জ্বালিয়ে ঘর গরম করতে জানো। আহা, ওরা কি রকম উষ্ণতা এনে দিয়েছে তোমার ঘরে।'

প্রায় হড়হড় করে কথাগুলো বলেই লোকটি হাসিতে ফেটে পড়ে। ভয়ানক অট্টহাসি। আমি জানি, লোকটি কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। তার কথাবার্তাও অসংলগ্ন নয়। তবে তার কণ্ঠস্বরে হাসি আর কান্না এবং একধরনের ক্রোধের বহির্প্রকাশ।

পুনরায় আমি বললাম, 'আমি তো এই কাঠ কিনে এনেছি।'

বলেই আমি দৌঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমার ভয় হচ্ছিল, লোকটির সঙ্গে হয়তো কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বা ছুরি থাকতে পারে। আমি তার হাসি এবং কান্নার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করিনি। এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াই। একটা পাথরের সঙ্গে আমার পায়ের ধাক্কা লাগে। আমি রাস্তায় ভস্মস্তূপের টের পেলাম।

আমার কানের ভেতর লোকটির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ভস্মস্তূপের ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। চিৎকার করে বলছে, 'পালা, পালা, জ্বালা, জ্বালা, জ্বালা।'

তাড়াতাড়ি আমি উঠে দাঁড়াই এবং দৌড়াতে শুরু করি। ক্রাচে ভর করে লোকটি আমাকে অনুসরণ করে। আমি প্রাণপণে দৌঁড়াতে থাকি, কিন্তু লোকটির কণ্ঠস্বরও আমার সঙ্গে দৌঁড়াতে থাকে এবং আমার কানের ভেতর অনুরণিত হতে থাকে। এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, মনে হয় পঙ্গু লোকটি আমার মস্তিষ্কের ভেতর এবং কানের ফুটোয় বসে থেকে আমার সঙ্গে কথা বলছে। কখনও সে কাঁদছে, আবার কখনও হাসছে। তবে সে প্রচণ্ড রাগান্বিত। বারবার সে সজোরে চিৎকার করছে।

'কি অদ্ভুত এক পৃথিবীতে আমরা বাস করছি! কাঠ কাটার জন্য বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছে কুড়াল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাড়ি-

www.pathagar.com

ঘরের দরজা-জানালার কাঠ দেদারছে বিক্রি হচ্ছে দোকানে। তুমি তা জানো না। তুমি শুধু দোকান থেকে কাঠ কিনে এনে ঘর গরম করতে জানো। দোকানে ভাঙা দরজা-জানালা পাল্লায় তুলে ওজন করে বিক্রি করা হয়। আর সবাই তা কিনে। যদিও অনেকের বাড়ি-ঘরের দরজা-জানালা, এমনকি ছবির কাঠের ফ্রেম, বোমার আঘাতে পুড়ে গেছে, কিন্তু অন্য সব মানুষের বাড়ি-ঘরের দরোজা-জানালার কাঠ পাল্লায় তুলে ওজন করে বিক্রি হচ্ছে দোকানে। এগুলো অইসব লোকদের জীবনের অংশ এবং তাদের স্মৃতির সঙ্গে মিশে আছে। কাঠগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ। ভেবো না, আমি তোমাকে ধরতে এসেছি। দেখতেই তো পাচ্ছ, আমার পা নেই। তাই দৌড়ে পালানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। ওরা আমার দু'টি পা-ই কেড়ে নিয়েছে এবং বিনিময়ে আমাকে কাঠের এই ক্রাচ দিয়েছে। হয়তো ভাবছ, আমি একটা আস্ত উন্মাদ। কি, ভাবছ না? তুমি কি জানো, বাড়িটা আমার বাবার ছিল? প্রত্যেকটা কাঠের টুকরোর গায়ে আমি আমার ফেলে আসা জীবনের স্মৃতির রঙিন ছবি দেখতে পাই। আমার মেয়ের হাসির মিষ্টি সুর শুনতে পাই। অই কাঠটা দেখো? ওটা আমাদের পুরনো বাড়ির। হ্যাঁ, পালাও! এই কাঠের কাছ থেকে পালিয়ে যাও। আমার ছেলেমেয়ের স্পর্শ থেকে দূরে চলে যাও। এই কাঠের মধ্যে আমি আমার পুরনো ঘর-বাড়ির গন্ধ খুঁজে পাই। তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি আমার বাড়ি-ঘরের ঘ্রাণ পেয়েছি। গন্ধটা এসেছে কাঠ থেকে, যা জ্বালিয়ে তুমি ঘর গরম করছিলে। আমার বাড়ি-ঘর, ছেলেমেয়ে এবং অতীত জীবনকে দেখতে এসেছি। এই কাঠের মধ্যে আমি আমার পুরনো ঘরের স্পর্শ অনুভব করে স্বস্তি পেতে চাই। কখনও কি তোমার কোনো ঘর-বাড়ি ছিল? দীর্ঘ দিনের শেষে নিজের ঘরে ফিরে এসে তুমি কি কখনও শান্তি এবং আশ্বস্ত বোধ করেছ? এই কাঠগুলো আমার প্রয়োজন। যত মূল্যই হোক না কেন, আমি কাঠগুলো কিনতে চাই। কাঠগুলো আমি সযত্নে তুলে রাখব, যাতে আমার ফেলে আসা জীবনের চিহ্ন, ছেলেমেয়েদের এবং শান্তিময় জীবনের স্মৃতি দেখতে পারি। হায় আল্লাহ্, হায় মা'বুদ।'

আমি থামি এবং পুনরায় পেছন ফিরে তাকাই। খুব বেশি অন্ধকার নয়। চাঁদের অনুজ্জ্বল ধূসর আলোয় ঢেকে গেছে বাড়ি-ঘর এবং সড়ক। রাস্তাটা বেশ শান্ত। কোথাও কোনো পথচারীর পায়ের শব্দ নেই। বোধহয় লোকটি আমার পিছু নেওয়া থেকে বিরত আছে, কিন্তু তবুও আমি পুনরায় দৌড়াতে থাকি। একসময় শুনতে পেলাম উল্টো দিক থেকে লোকজন আমার দিকে ছুটে আসছে।

www.pathagar.com

ছেলেমেয়ে এবং মহিলাদের চ্যাঁচামেচি উচ্চ থেকে আরো উচ্চতর হচ্ছে।

আমি রাস্তার একপাশে থেমে দেখি অসংখ্য মহিলা এবং ছেলেমেয়েরা আমাকে পাশ কেটে চলে গেল। সবার পরনে গরিবী হালের পোশাক এবং সবাই আহত। তাদের মাথা এবং মুখমণ্ডল ব্যান্ডেজ দিয়ে মুড়ানো। পরনের কাপড়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ লেগে আছে। ওরা কিছু একটা বলছিল, কিন্তু কান্না এবং চিৎকারের জন্য কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে, এমনকি আকাশের এক কোণে ঝুলে থাকা চাঁদের সাথে তারাগুলোও কাঁপছে। প্রত্যেক মহিলা এবং ছেলেমেয়েদের হাতে কাঠের টুকরো। পুরনো বাড়ি-ঘরের দরজা-জানালা, আলমারি ও বইয়ের শেল্ফ ভেঙে কাঠের টুকরোগুলো আনা হয়েছে।

সবাই চিৎকার করে বলছে, 'আমাদের বাড়ি, আমাদের ঘর।'

ওরা কাঠের টুকরোগুলো উপরের দিকে উঁচিয়ে ঘোরাচ্ছিল। তাতে আমার ভীষণ ভয় করছিল। আমি দৌড়ে অন্য রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই। একসময় নিজেকে আবিষ্কার করি আমি কাঠের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চাঁদের আলোয় বাজারের দোকানগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বাজারে লোকে লোকারণ্য। শত শত নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, গরুর গাড়ি, দাড়িপাল্লা, আগ্নেয়াস্ত্র, ক্রেতা এবং বিক্রেতা। সব জায়গাতেই কাঠের স্তূপ। কোনোটা অর্ধেক পোড়া, কোনোটার গায়ে রক্তের দাগ। মানুষজনের মুখ ধূলোবালিতে একাকার। দাঁড়ি-পাল্লার একদিকে কাঠ, অন্যদিকে বাটখারা। টাকা পয়সা এক হাত থেকে অন্য হাতে বদল হচ্ছে।

'দেখো, দেখো, কেমন করে ওরা আমার জীবন বিক্রি করছে, কেমন করে কাঠ কিনে নিয়ে আগুনে পোড়াচ্ছে। পালাও। অবশ্যই তুমি পালিয়ে যাও।'

আচমকা বাজারের ভীড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসে পা-বিহীন লোকটি। আমার দিকে দৌড়ে এসে সে ক্রাচ দিয়ে আমাকে আক্রমণ করে। মাথায় আঘাত করার জন্য আমি এক ধরনের সূক্ষ ব্যথা অনুভব করি এবং আর্তচিৎকার করতে থাকি। একসময় আমি উঠে দাঁড়াই। বাতি জ্বালিয়ে আমি হিটারের দিকে তাকালাম। সবকিছু ঠিকঠাক আছে। তবে ঘরের ভেতর কেমন জানি ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, এমনকি বাইরের গুলির আওয়াজ এবং বোমার শব্দ অনেকটা ম্লান। হয়তোবা সে রাতেই যুদ্ধের বিরতি হয়েছে।

পরদিন ঘরের সমস্ত কাঠ আমাদের রাস্তার দোকানদারকে দিয়ে দিই। কিন্তু দুঃস্বপ্ন আমাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যেখানে যাই না

www.pathagar.com

কেন, লোকটির কণ্ঠস্বর আমার কানের ভেতর অনুরণিত হতে থাকে। আমি আর কোনো ভস্মস্তূপ দেখতে পাইনি। একসময় ওখান থেকে অন্যত্র চলে যাই।

বসন্তকালের শুরুর দিকে কোনো এক সকালে, আগের রাতে তুষার পড়ার জন্য যখন বাইরের আবহাওয়া ছিল ঠাণ্ডা, আমি হাঁটতে বেরিয়েছি। অসময়ে তুষারপাত এবং ঝড়ের জন্য গাছের সমস্ত ফুল ঝরে গিয়েছে, যার জন্য সবারই মন খারাপ লাগছিল।

আমাদের রাস্তার শেষপ্রান্তে অবস্থিত গোরস্থানের পাশ কেটে আমি যেতে থাকি। তাকিয়ে দেখি কয়েকজন পথচারী একটা শবের উপর বাঁকা হয়ে আছে। লাশটা পঙ্গু লোকটির, যার পা ছিল না। লাশের পাশেই ক্রাচ পড়ে আছে। পাগড়িটা তখনও তার গলায় জড়ানো। পরনের কাপড় ময়লা এবং তাতে কালশিটে রক্তের দাগ লেগে আছে। রাতের বেলা কুকুর তার মুখের খানিকটা খেয়ে ফেলেছে। গুলিতে সে মারা গেছে। হাতের মুঠোয় সে কয়েক টুকরো কাঠ ধরে রেখেছে। কাঠগুলো নীল রঙের। মনে হয় কারোর জানালা কিংবা শেল্ফের। কেউ তাকে চেনে না, এমনকি কেউ জানে না, কেন তার কাছে কাঠের টুকরো।

আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। গোরস্থানের দিকে তাকাই। দেখি, একটা নিঃসঙ্গ বৃক্ষের সমস্ত পুষ্পরাজি বিবর্ণ হয়ে গেছে।

[**গল্পসূত্র :** 'ভস্মস্তূপ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর' গল্পটি কাদের মোরাদির 'এ ভয়েস ফ্রম দ্য এসেজ্' গল্পের অনুবাদ। 'দারি' ভাষা থেকে ইংরেজিতে গল্পটি অনুবাদ করেন দাউদ রাজাউই। ইংরেজিতে গল্পটি ২০০৪ সালের অক্টোবর সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : কাদের মোরাদির জন্ম দক্ষিণ আফগানিস্তানে। তিনি কাবুলে পড়াশুনা করেন। গত শতাব্দীর আশির দশকে আফগানিস্তানের বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তার ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই তিনি নিজেকে একজন সফল গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার বাস্তববাদী বিভিন্ন গল্পে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন, পরবর্তী সময়ের যুদ্ধের ঘটনাবলি এবং তালিবানদের শাসনের বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানে কয়েক বছর নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশে তিনি ১৯৯৯ সালে নেদারল্যান্ডে গমন করেন। 'দারি' ভাষায় দু'টি ছোটগল্পের সংকলন ছাড়াও তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

নাহীদ ইলিয়াসি

প্রতিশোধ অথবা আশা-নিরাশার দোলাচল

'সালাম, আমার মেয়ে,' বলেই আম্মাজান আমার রুমে প্রবেশ করেন।

আম্মাজানকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি দম বন্ধ করি। আমি যদি কোনো নড়াচড়া না করি, তাহলে তিনি হয়তো চলে যাবেন।

'সালাম,' জবাবে বললাম।

তিনি কি চান? আমাকে কোনো কাজের কথা বলবেন? নাকি পুনরায় তিনি আমার জিনিসপত্র উল্টে-পাল্টে দেখবেন আমার কোনো বন্ধু চিরকুট দিয়েছে কিনা? আজ কি তার খারাপ দিন? পরীক্ষায় ভালো করেছি বলে তিনি কি আমার ওপর খুশি? হে আল্লাহ্, তুমি আম্মাজানকে আমার ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাও।

আম্মাজান সরাসরি বিছানার কাছে এলেন। আমার দিকে তার জ্বলজ্বলে চোখের তির্যক চাহনি। মুহূর্তের জন্য আমি চিন্তার গভীর অরণ্যে হারিয়ে যাই। কিন্তু আমি তার পায়ের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকি। ধীর পায়ে আমার কাছে আসার সময় তার পা দু'টি নরম কার্পেটে ডেবে যাচ্ছিল।

বিছানার একপাশে আমি বসে আছি। রেডিওতে তখন বন জোভির 'লিভিং অন এ প্রেয়ার' গানটি হচ্ছিল। আমার বুকের ভেতর ধুকপুকানির শব্দে আমি গানের কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। এই ছোট শোবার ঘরে তখন আমার মাথায় শুধু একটাই ভাবনা লাটিমের মতো বনবন করে ঘুরছিল এবং তাহলো আমার আম্মাজান, যার জন্য আমি ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ থাকি। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসেন। বিছানার কাছে এসে আমার মুখোমুখি বসেন এবং আমার হাঁটুর সঙ্গে তার হাঁটু লেগে যায়। মুখ ফুটে তিনি কিছু বললেন না। বরং চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে চারপাশের দেয়ালে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন। দেয়ালের গায়ে ঝুলানো 'গানস্ এন্ড রোজেস্' ব্যানারটা তিনি মোটেও পছন্দ করেন না। ব্যানারটা আমি স্কুল থেকে প্রিন্ট করে এনে আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়েছি। আম্মাজান মনে করেন এটা পুরোপুরি আমেরিকান সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ।

www.pathagar.com

আমার গোলাপি এবং ম্যাজেন্টা রঙের ফুল আঁকা কমফোর্টারের দিকে সোজাসুজি আম্মাজান তাকিয়ে আছেন। অতি যত্ন করে তিনি এটা আমার জন্য বানিয়েছিলেন। আচমকা তিনি ওটা তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকলেন।

'তোর বিছানায় ভীষণ দুর্গন্ধ,' নাক সিঁটকে আম্মাজান বললেন। 'প্রতিরাতে তোর পেশাব করে বিছানা ভিজানোর জন্য আমি রীতিমতো ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছি। লায়লা, তোর মতো তেরো বছর বয়সের মেয়ের প্রতিরাতে বিছানায় পেশাব করার জন্য আমি লজ্জা বোধ করি। প্রত্যেকদিন সকালে নোংরা বিছানার চাদর ধুতে ধুতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। এ ঘরে সব সময় দুর্গন্ধ। তোকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।'

লজ্জায় আমি কুঁকড়ে যাই। তবুও আম্মাজানের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকি। জানি না, এ মুহূর্তে আমার কি বলা উচিত।

হে আল্লাহ্, তুমি দয়া করে আম্মাজানকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও। তিনি কি মনে করেন আমি ইচ্ছে করে প্রতিরাতে বিছানা ভিজাই? তিনি কি সত্যি মনে করেন আমি পেশাবের দুর্গন্ধ নিয়ে স্কুলে যেতে পছন্দ করি? আমার কাছে তিনি কি চান?

'স্কুলে কেমন কাটল?' একসময় আম্মাজান অত্যন্ত শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন। তারপর এমন ভঙ্গিতে শব্দহীন হাসলেন যেন তিনি আমার পরম বন্ধু। তবে আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা মিল আছে, আমরা দু'জনই মেয়েমানুষ।

'ভালো,' আমি বললাম। বলার পরপরই আমার বুকের ভেতর ধুকপুকানির শব্দ শুনতে পেলাম।

'শুধু কি এটুকুই বলবি? ভালো?' আম্মাজানের খসখসে কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা এবং চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

আমি জানি না, কি বলব। তবে এ মুহূর্তে কিছু করা বা কোনো কথা বলা ঠিক হবে না। কেননা আমি যা-ই বলি না কেন, তিনি কিছুতেই খুশি হবেন না।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি ক্রমশ আম্মাজানের রাগের পারদ ওপরের দিকে উঠছে। চোখেমুখে ক্রোধের চিহ্ন। আমি জানি, তিনি মনে করেন আমি তাকে উপযুক্ত সম্মান করি না। কিন্তু আমি সে ধরনের মেয়ে নই। সবসময় তিনি আমাকে ভয় প্রদর্শন করেন। আমি জানি না, তিনি আমার কাছে কি আশা করেন।

'অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? কথা বলতে পারিস না?' তিনি কর্কশ এবং প্রায় চিৎকারের মতো করে বললেন।

'কোন কথা বলব?' নরম সুরে আমি জানতে চাইলাম।

www.pathagar.com

'সত্য কথা।' আম্মাজান গলার স্বর কয়েক ধাপ উপরে তুলে বললেন।

'কোন বিষয়ে সত্য কথা বলব? আমি জানি না, আপনি কি জানতে চান।' এবারো আমি বেশ ঠাণ্ডা গলায় বললাম। বলেই আমি গোলাপি ফুলের দিকে তাকাই।

'স্কুলে কেমন কাটল? বন্ধুদের কি নোট দিয়েছিস? ছেলেরা কি তোর দিকে তাকিয়েছিল? তুই কি চুপিচুপি সাজগোজ করিস?' এবার তিনি রীতিমতো চিৎকার করে উঠলেন।

আল্লাহ্ মাফ করুন, আমি এমন কোনো সাজগোজ করি না যাতে বুঝা যায় আমি একজন সোমত্ত মেয়ে।

আমি চুপ করে থাকি। আমার নিরবতায় আম্মাজানের সারা মুখে রাগের এবং ক্ষোভের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ে।

'তুই খুব খারাপ। ভদ্র ব্যবহার শিখিসনি। বাজে মুসলমান মেয়ে। আগে জানলে তোকে শিশু বয়সেই মেরে ফেলতাম।' প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে তিনি বললেন।

আম্মাজান আমার দিকে আরো একটু এগিয়ে এলেন এবং শক্ত হাতে আমার ঘাড় চেপে ধরে প্রচণ্ড ঝাকুনি দিতে থাকেন। 'স্কুলে কেমন কাটল?' গলার স্বর সপ্তমে তুলে তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন।

হে আল্লাহ্, দয়া করে আম্মাজানের মুখটা বন্ধ করুন।

আমি আমার কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আম্মাজানের মাথাটা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার মুখ হা করে খোলা। তিনি দু'হাতে আমার বাম হাত শক্ত করে চেপে ধরেন। তারপর আমার হাতের কাছে তিনি মুখ আনলেন। ভয়ে আমি হাত সরিয়ে নিই। তিনিও মাথা সরিয়ে আমার হাতের উপর মুখ রাখলেন। হাতে আমি তীব্র ব্যথা অনুভব করি। মনে হচ্ছিল কোনো সরু কিছু আমার হাতের চামড়া ফুঁড়ে ঢুকে যাচ্ছে। তিনি আমার হাত কামড়ে দিয়েছেন। সবকিছুই যেন ধীর লয়ে ঘটছে।

ক্রমশ ব্যথাটা আমার হাতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি টের পাই আম্মাজানের দাঁত আমার হাতের উপরের নরম মাংসে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড ব্যথায় আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে কাঁপতে থাকে। আম্মাজানের মুখটা আমার হাত এমনভাবে শক্ত করে চেপে ধরেছে যেন কোনো বন্য জন্তু শিকারী প্রাণীর টুটি চেপে ধরেছে।

আমার নিজের আম্মাজান ... কেমন করে তিনি আমাকে এমনভাবে ব্যথা দিতে পারেন?

www.pathagar.com

জানি না, কোথা থেকে আমি আমার কণ্ঠস্বর ফিরে পেলাম। আমি চিৎকার করে বললাম, 'থামুন।' বলেই তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে আমার হাত সরিয়ে নিই। ভীষণ রাগে তিনি জোর করে আমার হাত টেনে নিয়ে আরো বেশি জোরে কামড় দেন। আমি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি।

'থামুন।' আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে থাকে এবং আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি।

বেশ খানিকক্ষণ আমি প্রচণ্ড ব্যথায় কাঁতরাতে থাকি। একসময় আম্মাজান আমার হাত ছেড়ে দিয়ে এমন কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যেন তিনি তার ক্ষমতার কথা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'এখন তুই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিস আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে কি হয়, অবাধ্য মেয়ে।' আম্মাজান বেশ ঠাণ্ডা গলায় বললেন।

আমি কোনো প্রতিবাদ করতে চাই না। আমি চাই আপনি এখন এখান থেকে চলে যান।

অনেকক্ষণ বাঁকা দৃষ্টিতে আম্মাজান আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। একসময় তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং দরজার দিকে পা বাড়লেন। ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে একপলক তাকিয়ে তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। অবশেষে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

অশ্রুভেজা চোখে আমি হাতের সাদা মাংসের দিকে তাকাই। আম্মাজানের প্রত্যেকটা দাঁতের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে আছে।

কেমন করে একজন মানুষের মুখ এত বড় হতে পারে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কামড়ের লাল দাগগুলো নীল এবং বেগুনী রং ধারণ করে।

পরবর্তী সময়ে আম্মাজানের এ ধরনের শারীরিক অত্যাচার আমার জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষতগুলো কয়েক সপ্তাহ থাকে। আগেও অনেক সময় বন্য পোকার কামড় খেয়েছি এবং এখনও সেই সব দাগ শরীরের বিভিন্ন কোমল জায়গায় রয়ে গেছে। অই সব জায়গায় ব্যথা সহজে সহ্য করা যায় না। আম্মাজান দারুণ চালাক এবং তিনি ভালো করেই জানেন শরীরের কোথায় কামড় দিলে বেশি ব্যথা পাওয়া যায়।

মনে মনে আমি অনেকবার চেয়েছি আমার একটা কিছু খারাপ ঘটনা ঘটুক, যাতে আম্মাজান বুঝতে পারেন যে তিনি আমার ওপর কেমন অত্যাচার ও অবিচার করেছেন। আমি চেয়েছি তার এই অমানবিক ব্যবহারের জন্য তিনি যেন সারা জীবন অনুশোচনার জ্বলন্ত কুণ্ডলিতে জ্বলেপুড়ে দগ্ধ হতে পারেন।

www.pathagar.com

আমার কাছে এটাই হলো তার জন্য উত্তম শাস্তি, যা তাকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করবে এবং আমার জন্য সবচেয়ে ভালো প্রতিশোধ।

একসময় আমার মাথা গুলিয়ে যায়। আমি তাকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দিতে চাইলাম। ব্যথায় আমি কাঁদতে কাঁদতে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত পায়ে বারান্দা পেরিয়ে আম্মাজানের শোবার ঘরে ঢুকি। তখন তিনি রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করছিলেন। এ ঘরে এমন একটা কিছু আমাকে খুঁজে পেতে হবে, যা তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনি যারপরনাই ভালোবাসেন। আমি ওটা নষ্ট করে ফেলব। তার এই প্রিয় পোষাক হারানোর শোক যেন তিনি কখনই ভুলতে না পারেন। আম্মাজানের প্রতি প্রতিশোধ নেবার এটাই আমার কাছে একমাত্র উপায়।

আমার অন্তরমহলে একটা কিছু ঘটে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি আলমারির বাম দিকের হাতল ধরে এক টানে পাল্লা খুলে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে এক কদম পিছিয়ে আসি। আলমারির ভেতর আমার পলকহীন দৃষ্টি আটকে যায়।

অই তো ওখানে। আলমারির পেছনের দিকে সবুজ প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গারে আম্মাজানের কালো স্কার্ট ঝুলে আছে। এই স্কার্ট তার সবচেয়ে প্রিয় পোষাক। আমরা যখন দু'সপ্তাহের জন্য আফগানিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি এটা কিনেছিলেন। তারপর পাকিস্তানে এক বছর দুঃসহ জীবন কাটানোর সময় ওটা আম্মাজানের আলমারিতে ছিল এবং এখন এই নর্থ ক্যারোলিনায় আলমারির অন্ধকারে বহাল তবিয়তে ঝুলছে। স্কার্টটার বাম দিকে ছয়টা সুন্দর ভাঁজ রয়েছে।

আমার হাত দু'টি আমার নিজের বলে মনে হলো না। মুহূর্তেই আলমারির ভেতর থেকে স্কার্টটা হেঁচকা টানে বের করে আনি। পলকহীন দৃষ্টিতে আমি হাতের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে সময় আমার আঙুল স্কার্টের কালো কাপড় খামচে ধরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে থাকে।

[**গল্পসূত্র :** 'প্রতিশোধ অথবা আশা-নিরাশার দোলাচল' গল্পটি নাহীদ ইলিয়াসির ইংরেজিতে 'লিভিং অন এ প্রেয়ার' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি জোহরা সায়িদ এবং সাহার মুরাদির সম্পাদনায় 'ওয়ান স্টোরি, থার্টি স্টোরিজ : অ্যান এনথ্রোলজি অব কন্টেম্পোরারি আফগান আমেরিকান লিটারেচার' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : নাহীদ ইলিয়াসি একজন আফগান ছোটগল্প লেখিকা এবং কবি। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখলের তিন বছর পর পরিবারের সঙ্গে তিনি দুর্গম পাহাড় হেঁটে পাকিস্তানে গমন করেন। তার এক বছর পর শরণার্থী

www.pathagar.com

হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনায় বসবাস করেন। ইস্ট ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি থেকে যোগাযোগ এবং গণসংযোগ বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি আটলান্টায় ফ্যাশন ডিজাইনের উপর পড়াশুনা করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি নিউ ইয়র্কের মার্ক জ্যাকবস্ কোম্পানিতে সহকারী ডিজাইনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু পরে সেই চাকরি ছেড়ে তিনি 'স্কুল অফ হোপ' নামক এক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। সংগঠনটির মূল কাজ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্কুলের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। বর্তমানে তিনি কাউন্সিল ফর ইকোনমিক এডুকেশনের যোগাযোগ বিভাগের ডিরেক্টর।

www.pathagar.com

আকরাম ওসমান

ব্যবধান

বাবা আলেম একজন পাচক। তার কুড়ি বছর বয়সী ছেলের নাম শের আলেম। সে অবিবাহিত এবং একাকীত্বের জীবন-যাপন করে। বাবা আলেম ছেলেকে বিয়ে করাতে চায়, কিন্তু তার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে সে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারে। যে বাড়িতে সে পাচকের কাজ করে, সে বাড়ির গৃহকর্তা শওকত খান একজন প্রতারক এবং ধুরন্ধর লোক। শওকত খান স্ত্রীর কাছে বাবা আলেমের সমস্যার কথা শুনেছে। স্ত্রীকে সে বলল, 'বাবা আলেম আমাদের অনেক দিনের পুরনো চাকর। সে আমাদের এখানেই তার ছেলের বিয়ের আয়োজন করতে পারে, তবে ...।'

শওকত খানের স্ত্রী শাহ্ কোকো একজন ঝগড়াটে, জটিল-কুটিল, এক রোখা, নিচু মনের, সমস্যা সৃষ্টিকারিণী এবং প্রতিশোধপরায়ণ মহিলা। সারাক্ষণই সে তার স্বামীর কানে ফিসফাস করে। স্বামীর প্রস্তাব শুনে সে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি কি মোল্লা নাসিরুদ্দিন? পকেটের টাকা খরচ করে তুমি কি চল্লিশ জন গ্রাম্য বাজে মানুষকে আমার বাড়িতে আনতে চাও?'

স্ত্রীর কথা শুনে শওকত খান হেসে বলল, 'বাবা আলেমই সমস্ত খরচ বহন করবে, কিন্তু পার্টি হবে আমাদের জন্যই।'

বিস্মিত শাহ কোকো জিজ্ঞেস করে, 'কেমন করে?'

জবাবে শওকত খান বলল, 'এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। প্রথমত আমরা বাবা আলেমের দোয়া পাবো এবং দ্বিতীয়ত আমাদের বাড়িতে পার্টি হবে। তাতে সে রাতের জন্য আমাদের কোনো খরচ হবে না।'

স্বামীর কথায় শাহ কোকোর চোখ দু'টো চিকচক করে উঠল। একটু সময়ের জন্য ভেবে সে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ। বিনা খরচায় আমরা পার্টি করব এবং দোয়াও পাব।'

বৃহস্পতিবার রাতে শওকত খানের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন

www.pathagar.com

করা হয়। বাবা আলেমের অতিথিরা অর্ধেক শহরের বাসিন্দা এবং বাকিরা গ্রামের। গ্রাম্য অতিথিদের পরনে বিভিন্ন ধরনের পোষাক। তারা সরাসরি মেঝেতে বসেছে এবং বিশাল কক্ষের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে আছে। অন্যদিকে শওকত খানের অতিথিরা কক্ষের উঁচু জায়গায় সোফা এবং চেয়ারে বসেছে।

রান্না ঘরে বাবা আলেম খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত। তার স্ত্রী ময়লা চাদর গায়ে রুটি পরিবেশন কাজে ছোটাছুটি করছে।

মুখরিত কক্ষে গায়িকা, যার ঠোঁটে পুরু লাল লিপস্টিক, বেসুরে গান গাইছে। গানের তালে বাবা আলেমের অতিথিরা কক্ষের মাঝখানে মনের খুশিতে নৃত্য পরিবেশন করছে। মনের ভেতর দুষ্ট চিন্তা নিয়ে শওকত খান তারস্বরে ডাকতে থাকে, 'বাবা আলেম কোথায়? জলদি ডাকো। তাকে তো কনের হাত ধরতে হবে।'

অতিথিরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাবা আলেমকে খুঁজতে থাকে, কিন্তু সে সেখানে নেই। শাহ কোকো বলল, 'বাবা আলেম রান্না ঘরে। তাড়াতাড়ি ওকে ডেকে আনো।'

বাবা আলেমকে ডেকে আনার জন্য তিন-চারজন লোক ছুটে গেল রান্নাঘরে। বাবা আলেমের পরনে হাঁটু পর্যন্ত ভাজ করা ময়লা এবং তেল চিটচিটে প্যান্ট। কক্ষের ভেতরে ঢুকে হাসি মুখে সে জিজ্ঞেস করে, 'চুলায় খাবার পুড়ে যাবে। কে আমাকে ডেকেছে?'

এক গাল হেসে শাহ কোকো বলল, 'রাখো তোমার রান্না। এখানে থেকে কনের হাত ধরো।'

যেই মাত্র অতিথিদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বাবা আলেমের দিকে, তখন এক সাথে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। অতিথিদের মাঝে সজ্জন একজন সহানুভূতির সাথে বলল, 'তাকে পোশাক বদলাতে দিন।' তারপর বাবা আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'যাও, তুমি কাপড় বদলিয়ে আসো।'

অতিথির কথা শুনে বাবা আলেম হাসতে থাকে যেন সে কথাটা আদৌ শুনতে পায়নি।

অতিথি বলল, 'তুমি হাসছ কেন? তাড়াতাড়ি না গেলে আমাদের দেরি হয়ে যাবে।'

বাবা আলেম এক চুলও নড়ল না। বরং যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল যাতে বুঝা যায় তার আর কোনো পোশাক নেই। সে সময় আয়েস্তা বেরুর গান শোনার জন্য পরিবারের সবার সাথে বর এবং

www.pathagar.com

কনে ধীর পায়ে কক্ষে প্রবেশ করে। শওকত খান তির্যক দৃষ্টিতে তাদের পরখ করল। ময়লা কাপড়েই বাবা আলেম বোবা কান্নায় বর এবং কনের কাছে গিয়ে কনের হাত ধরে। পুরনো চাকরের প্রতি মমতা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধ দেখানোর জন্য উপস্থিত লোকের সামনে শওকত খান বরের হাত ধরে। মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে অতিথিরা বর এবং কনেকে অভিনন্দন জানাল। যেই মাত্র বাবা আলেম রান্নাঘরে ফিরে যেতে উদ্ধত হল, তখনই আনন্দে উদ্বেলিত শওকত খান বাবা আলেমকে ঘরের মাঝখানে ঠেলে দিয়ে ঘোষণা করে, 'সবাই হাততালি দিন। আপনাদের সামনে বাবা আলেম নাচবে।'

অতিথিরা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে হাসে এবং হাততালি দিয়ে চিৎকার করে 'হাওয়া' এবং 'ওয়া ওয়া' বলতে থাকে। বাবা আলেম জীবনে কোনোদিন নাচেনি, এমনকি কিভাবে নাচতে হয়, তাও সে জানে না। অথচ অতিথিদের উৎসাহদানে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মনে একধরনের অনুপ্রেরণার সঞ্চার হয়। চারপাশ থেকে ভেসে আসা জোরালো কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল, 'নাচো, নাচো।'

কোনো কিছুতে নিষ্কৃতি না পেয়ে এবং জোরপূর্বক নাচার জন্য বাবা আলেম মনে মনে অপমানিত বোধ করে। সারা চোখেমুখে ঘামের ফোঁটা। সঙ্গীতের তালে তালে সে মজা করার জন্য নাচের সঙ্গে ঘুরতে শুরু করে। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটানো এবং পায়ে ছেঁড়া মোজা।

শওকত খান সোৎসাহে চিৎকার করে বলে, 'চমৎকার।'

শওকত খানের ছেলেরা ও তার বন্ধু-বান্ধবেরা ঘরের উপরতলা থেকে প্রচণ্ড জোরে ক্রমাগত হাততালি দেয়। তাদের হাততালি এবং অট্টহাসির শব্দে বাবা আলেমের মাথা ঘুরতে থাকে। তবুও সে আরেক পাক ঘোরে এবং সাথে সাথে তার ভয় চলে যায়। ঢাক-ঢোল এবং বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আরো বাড়তে থাকে। বাবা আলেম তার ছেলে শের আলেম এবং অন্যান্য অতিথিদের দেখে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরতে ঘুরতে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। শওকত খানের অতিথিরা মোটেও তা আশা করেনি। বাবা আলেমের নাচ কয়েক মিনিটের মধ্যেই থেমে যায়। কেননা ঘরের ভেতর সিগারেটের ধোঁয়ায় তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে ক্লান্তির রেখা। যতই সে নাচতে চাইছিল, ততই যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। সে জানে না, আসলে সে কি করছে। মাতালের মতো টলতে টলতে ঘরের মাঝখানে যায়। অতিথিদের ভীড়, চেয়ার, সোফা, গান-বাজনা— সবকিছু তার মাথার ভেতর

www.pathagar.com

চরকির মতো ঘুরতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে সে ধপাস করে পড়ে যায় এবং সে সময় তার মুখ বিবর্ণ দেখায়।

শাহ কোকো ফিসফিসিয়ে শওকত খানকে বলল, 'ওর মাথা ঘুরছে। আর না। হয়তো পুনরায় ওর অ্যাজমা অ্যাটাক হতে পারে।'

শওকত খান, এ পরিস্থিতির উদ্ভাবক এবং একজন ব্যস্ত দর্শক ও সমঝদার, বলল, 'তোমাকে বলিনি যে আমাদের সময় ভালো কাটবে? চিন্তা করো না। সে ঠিক আছে।'

বাবা আলেম বমি করে তার কাপড় ভিজিয়ে ফেলে। টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ সে কাচের টেবিল আর দামী ফুলদানির উপরে পড়ে যায়। শওকত খান সাড়ে চার হাজার আফগানি দিয়ে ফুলদানিটা কিনেছিল। যেই মাত্র শাহ কোকো কাচ ভাঙার শব্দ শুনতে পেল, তখনই সে চিৎকার করে ওঠে এবং মাথা চাপড়াতে থাকে।

শওকত খান স্তম্ভিত। গায়িকা উঠে গিয়ে ভাঙা ফুলদানির কাচ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শাহ কোকো কান্না ভেজা চোখে বাঘিনীর মতো গর্জে উঠে বলল, 'শওকত খান, আল্লাহ্ তোমাকে নিয়ে যাক। এখান থেকে চলে যাও। তোমার মুখ আমি আর দেখতে চাই না। তাকিয়ে দেখো, আমার কি সর্বনাশ হয়েছে।'

চারদিকের বমির গন্ধে শওকত খানের অতিথিদের নাক বন্ধ হয়ে আসে। শওকত খানের শাশুড়ি একজন জঘন্য প্রকৃতির মহিলা। বেশ কঠিন স্বরে সে তার মেয়েকে বলল, 'অই বুড়াটা নিজেকে লজ্জিত করেছে, এমনকি আমাদেরও অপমানিত করেছে।'

শাহ কোকো রাগে এবং ক্ষোভে দাঁত কিটমিট করতে থাকে। ভীষণ রাগী সুরে স্বামীর উদ্দেশে বলল, 'আমি বলিনি, ও মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আমি এখন কি করব? আমার সুন্দর টেবিল এবং দামি ফুলদানি ভেঙে গেছে। কে এখন কার্পেট পরিষ্কার করবে? কে এই জঞ্জাল সাফ করে দেবে?'

অপমানিত শওকত খান জবাবে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে। গোল্লায় যাক ওরা। সব দোষ আমারই। আমি এই কুকুরগুলোকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দিয়েছিলাম।'

শাহ কোকো চোখেমুখে একরাশ ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে বলল, 'তাহলে ওদেরকে এখনই চলে যেতে বলো।'

স্ত্রীকে ভীষণ ভয় পায় শওকত খান। তাই সে লুকোনোর জন্য আশেপাশে কোনো গর্ত খোঁজে। হঠাৎ সে রাগান্বিত বাঘের মতো সব শক্তি

www.pathagar.com

নিয়ে বাবা আলেমের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং এলোপাতাড়ি তার পেটে লাথি মারে। শওকত খানের ছেলেরা বাবা আলেমের হাত-পা ধরে টেনেহিঁচড়ে দরোজার বাইরে নিয়ে ফেলে দেয়। তারপর শের আলেমের সামনে গিয়ে শওকত খান বলল, 'এখন ওঠ্। অপয়া বউ নিয়ে এখনই এখান থেকে চলে যা। এটা তোদের বাড়ি না। যা, জলদি চলে যা।'

আস্তে আস্তে বাবা আলেমের অতিথিরা চলে যায়। শের আলেমের মুখটা মলিন দেখাচ্ছিল। সে তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে ফিসফিস করে বলল, 'এটা সম্পূর্ণ আব্বাজানের দোষ। সে তার সীমানার বাইরে চলে গিয়েছিল। আমাদের দিকে তাকাও, আর ওদের দিকে তাকাও। আমরা কোথায়, ওরা কোথায়? ওরা সোফায় বসার যোগ্য, আর আমরা নিচে বসার যোগ্য। চলো, এখান থেকে চলে যাই।'

যখন অতিথিরা অন্য ঘরে, তখন শওকত খান এবং শাহ কোকো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাবা আলেমকে অভিসম্পাত দিচ্ছিল। বাবা আলেম অসহায় চোখ তুলে তাকায়। সে দরোজার কাছে মেঝেতে পড়ে আছে। হঠাৎ সে শওকত খানের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'জনাব, আমি জঘন্য কাজ করেছি। আমাকে মাফ করে দিন। আমি দাম দিয়ে দেব। আমার বেতন থেকে কেটে আরেকটা সুন্দর টেবিল এবং কাচের ফুলদানি কিনে নিবেন। আমি ঘর পরিষ্কার করব, এমনকি কার্পেটও ধুয়ে দেব।'

ঠোঁটের ফাঁকে কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে রেখে শওকত খান বলল, 'হাঁদারাম, তুই কি জানিস টেবিল আর ফুলদানির দাম দশ হাজার আফগানি!'

বাবা আলেমের মুখে কোনো রা নেই।

বাবা আলেমকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে শওকত খান তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে চিৎকার করে বলল, 'বল, এখন তাহলে কি করবি?'

অনুনয়-বিনয় করে বাবা আলেম বলল, 'হুজুর, কসম খেয়ে বলছি, আমি কাজ করব। বিনা বেতনে কাজ করব।'

তারপর দীর্ঘ কুড়ি মাস বিনা বেতনে কাজ করে বাবা আলেম সেই ঋণ পরিশোধ করেছে।

[গল্পসূত্র : 'ব্যবধান' গল্পটি আকরাম ওসমানের 'দারি' ভাষায় রচিত এবং ফারহাদ আজমের ইংরেজিতে অনূদিত 'দ্যাট অন টপ এন্ড দিস অন বটম' গল্পের অনুবাদ। গল্পটি ১৯৯৮ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়।]

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি : আফগানিস্তানের যে ক'জন লেখক তাদের প্রতিভা, মননশীলতা এবং শৈল্পিক লেখনীর মাধ্যমে সমকালীন আফগান কথা সাহিত্যে, বিশেষ করে গল্প সাহিত্যের, উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তাদের মধ্যে আকরাম ওসমান অন্যতম। তিনি ১৯৩৭ সালে আফগানিস্তানের হেরাত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে পড়াশুনা সমাপ্ত করে তিনি ১৯৭১ সালে ইরানের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। সনাতন আফগান সাহিত্যের কলাকৌশলের সঙ্গে পশ্চিমা সাহিত্যের মিশ্রণে আকরাম ওসমান এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। তার বিভিন্ন গল্পে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আফগানিস্তানের শহরকেন্দ্রিক, বিশেষ করে কাবুলের, জনপ্রিয় লোক সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এসব গল্পে নস্টালজিয়ার পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়। তার গল্প আফগানিস্তানের রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারণাসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে 'রহমান-বাবা' পুরস্কারে ভূষিত হন। ইংরেজিতে ছোটগল্প সংকলন 'রিয়েল মেন কিপ দেয়ার ওয়ার্ড' ২০০৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরপরই বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কর্মজীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি আফগান সরকারের রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া একসময় তিনি আফগান রাইটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ১৯৯২ সালে সুইডেনে গমন করেন। বর্তমানে তিনি স্টকহোমের আফগান পেন ক্লাবের সভাপতি। সেখান থেকে তার তত্ত্বাবধানে 'ফারদা' ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

ফরহাদ আজাদ

ভাঙা জানালা

বাইরে থেকে জানালার কাচে প্রচুর ধূলোবালি জমেছে। অনেক মাস ধরে কোনো বৃষ্টি নেই। তাই বৃষ্টিতে কাঁচ ধোওয়া হয়নি। ফলে ভাঙা জানালার কাচের ফাঁকে জমে আছে ধূলোবালির আস্তরণ। ভাঙা জানালার কাচের ফাঁক গলিয়ে ভৌতিক শব্দের মতো প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছে। বাতাসের আওয়াজে ছেলেটির ঘুম ভেঙে যায়। সে ঘুম-জড়ানো চোখের পাতা খোলে। একসময় ঠাণ্ডা বিছানা ছেড়ে খালি পায়ে শক্ত মেঝেতে দাঁড়ায়। তারপর শব্দহীন পায়ে জানালার কাছে গিয়ে কাচ স্পর্শ করে।

ছেলেটি বাইরের আপেল গাছের দিকে তাকিয়ে দেখে নিঃশব্দে পাতাগুলো দুলছে। বাতাসে ডালপালা এমনভাবে এদিক-ওদিক নড়ছে যেন একটা পাতা থেকে আরেকটা পাতা দূরে সরে যাচ্ছে। ধূসর রঙের ধূলোবালি মাটি থেকে উড়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে উপরে উঠে যাচ্ছে। বাইরের বিশাল খোলা আকাশ ঢেকে গেছে ঝড়ো মেঘে।

বৃষ্টি আসন্ন। কিন্তু কোথাও কোনো বজ্রপাত কিংবা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে না। ছেলেটি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের পাহাড়ের দিকে। সে জানে, শুষ্ক পাহাড়ে বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন। বৃষ্টি হলে পাহাড়ের মরা ঘাসগুলো বসন্ত কালের ঘাসের মতো সজীব হবে। আপেল গাছটারও বৃষ্টি দরকার। পানি পেলে আগামি বছর ভালো ফলন হতে পারে। পুরো গ্রীষ্মে কোনো বৃষ্টি হয়নি। এখন শরৎকালের শুরু। অথচ সে মনে মনে বসন্তকাল চায়। সে মনে করতে পারে না, কখন বসন্ত এসেছিল।

ভাঙা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটি সারাদিন কাটিয়েছে। যখন সে উদ্দেশ্যহীনভাবে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, তখন তার মনে হয়েছিল ভগ্ন এবং বসতিহীন গ্রামের পাশের বিরান পাহাড়ে সে অনায়াসে হেঁটে যেতে পারবে। গ্রামে শুধু মাটির দেয়াল ঘেরা তাদের পরিত্যাক্ত বাড়িটি একাকী দাঁড়িয়ে আছে। আপেল গাছের ডালে হলুদ পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ শোনা

www.pathagar.com

যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে কবিতার বই নিয়ে কবিতা পড়ে। কদাচিৎ বাইরে যায়। আসলে সে ঘরের ভেতরেই থাকতে পছন্দ করে। তখন ভাঙা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাহাড় এবং আপেল গাছের দিকে তাকিয়ে সময় কাটায়।

ভাঙা জানালার ফাঁক গলিয়ে আপেল গাছটার দিকে তাকালে তার মনে হয় গাছটা পানির মধ্যে ডুবে আছে। আবার পাহাড়ের দিকে তাকালে মনে হয় পাহাড়গুলো যেন বিভিন্ন নক্সার এবং আকৃতির। তবে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে তার ভীষণ ভালো লাগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। তাতে তার কোনো বিরক্তি বা একঘেয়েমি লাগে না। অন্য সময় নিঃসঙ্গতা তাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে রাখে। ভাঙা জানালা, শুষ্ক পাহাড় এবং একমাত্র আপেল গাছটাই তাকে সঙ্গ দান করে।

এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি এসে জানালার কাচে পড়ে। ফোঁটাটা নিচে গড়িয়ে পড়ার সময় ময়লা কাঁচের উপর দাগ রেখে যায়। গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার দিকে সে অপলক তাকিয়ে থাকে। জানালার নিচে পৌঁছানোর পরপরই ফোঁটাটা মিলিয়ে যায়। পুনরায় আরেক ফোঁটা পড়ে। তারপর আরেকটা। তারপর আরো একটা। একসময় অনবরত বৃষ্টির ফোঁটায় কাঁচের জানালা সম্পূর্ণ ভিজে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই কাচের উপর জমে থাকা ধূলোবালি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। স্বচ্ছ কাচ দেখতে তার ভালো লাগে। সে হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ার সময় ছেলেটি কাঠের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। তড়িৎ বেগে তার বাবা ঘরে ঢোকে। লোকটির দেহের গড়ন দীর্ঘ, মুখে ধূসর দাড়ি এবং পরনে চাপান। তার শরীর থেকে টুপটাপ করে বৃষ্টির পানি ঝরছে। লোকটির গায়ে বৃষ্টির স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ। কাঠের বেঞ্চিতে বসে সে কাঁধ থেকে শাল নামিয়ে মেঝেতে রাখে। তারপর কর্দমাক্ত বুট খুলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের গরম বাতাস ছড়িয়ে দেয় ঘরের ভেতর।

লোকটি খেয়াল করেনি যে ছেলেটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি জানে, তার বাবা আজ বাজারে কোনো কার্পেট বিক্রি করতে পারেনি। খাদ্য-খাবার কেনার জন্য গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করছে। লোকটির মলিন চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে। ভেজা চুল থেকে পানি চুঁইয়ে পড়ছে তার মুখের উপর।

সেই সময় লোকটি উষ্ণ কোনো কিছুর আশা করছিল। যন্ত্রণার চাপা গোঙানি সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়ায় এবং আগুন জ্বালানোর জন্য কয়েক ফালি

www.pathagar.com

চেলা কাঠ নিয়ে চুলার কাছে যায়। আগুন জ্বলে ওঠার পর সে হাত সেঁকে নিয়ে মরচে ধরা চুলার উপর লোহার চায়ের পাত্রে পানি বসায়। তারপর আগুনের পাশে কাঠের বেঞ্চিতে বসে এবং ক্লান্ত চোখের পাতা বন্ধ করে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটি তার বাবাকে লক্ষ্য করে। একসময় ঘুরে সে বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকায়। তখন জানালার ভাঙা কাচের উপর সে তার বাবার প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। আগুনের তাপে ঘরটি ক্রমশ গরম হতে থাকে। চায়ের পাত্রে পানি ফোটার সময় চুলার ভেতর কাঠ ভাঙার মড়মড় শব্দ হচ্ছিল।

লোকটি উঠে দাঁড়ায়। চায়ের পাত্রে ফুটন্ত পানিতে সামান্য চায়ের পাতা ঢেলে অপেক্ষা করে কখন পাতাগুলো পাত্রের তলানিতে জমা হবে। সে পকেট থেকে একটা কালশিটে আপেল বের করে চুলার পাশে রাখে। তারপর দেয়ালের পাশে বসে আয়েসী ঢংয়ে কাপে চা ঢালে। চায়ের কাপে এক চুমুক দেওয়ার পর সে চোখের পাতা বন্ধ করে। একসময় শক্ত মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়।

ছেলেটি ক্ষুধার্ত। সে চুলার পাশে আপেলটা দেখতে পেয়ে তুলে নেয়। জানালার কাছে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে আপেলটা খায়। এটাই তার একমাত্র খাবার, যা সে গত কয়েকদিনের মধ্যে খেতে পেরেছে। খাওয়ার সময় সে তার শীর্ণ হাতে আপেলটা ধরেছিল।

আপেল খাওয়া শেষ করে ছেলেটি কবিতার বই নিয়ে বসে এবং খানিকক্ষণ কবিতা আবৃত্তি করে। বজ্রপাত এবং বৃষ্টির তোড়ে ঘর কেঁপে ওঠে। প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এটা তার জন্য কোনো বিষয়ই না। কেননা ইতোমধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভাঙা জানালার ফাঁক গলিয়ে বাতাস এসে ছেলেটিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। তখনও তার বাবা গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। চুলার আগুন নিভে গেছে। ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়। একসময় ভাঙা জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখতে থাকে। এখন রাত। ঝড় থেমে গেছে। তারাবিহীন দূরের বিশাল আকাশ ঢেকে আছে অন্ধকারে।

[গল্পসূত্র : 'ভাঙা জানালা' গল্পটি ফরহাদ আজাদের 'দ্য ব্রোকেন উইন্ডো' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি ১৯৯৯ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গল্পটি জোহরা সায়িদ এবং সাহার মুরাদির সম্পাদনায় 'ওয়ান স্টোরি, থার্টি স্টোরিজ : অ্যান এনথ্রোলজি অব কন্টেম্পোরারি আফগান আমেরিকান লিটারেচার' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।]

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি : ফরহাদ আজাদের জন্ম আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। অল্প বয়সে তিনি আমেরিকায় গমন করেন। আফগান মানুষদের মধ্যে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৭ সালে চালু করেন প্রগতিশীল অনলাইন ম্যাগাজিন 'আফগানম্যাগাজিন.কম'। পাশাপাশি তিনি আফগান চিত্রশিল্পী, কবি-সাহিত্যিক এবং সঙ্গীতশিল্পীদের বহিরাঙ্গনে পরিচিতি লাভের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

আজম রাহনাওয়ার জারিয়াব

কম্পোজিশন

আমি তখন এলিমেন্টারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ক্লাস শুরু হওয়ার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই শিক্ষক এসে বললেন, 'বয়েজ ...।'

বলেই তিনি মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে শ্রেণীকক্ষের উল্টোদিকে হেঁটে গেলেন। দেখে মনে হল, তিনি মেঝের উপর বিছানো স্লেইট পাথর গুণছিলেন। তখন তাকে বামুনের মতো বেঁটে দেখাচ্ছিল। সত্যি বলতে কি, আমাদের শিক্ষক আসলেই একজন অতি ক্ষুদ্র আকৃতির মানুষ।

হঠাৎ দেয়ালের কাছে গিয়ে তিনি থামলেন। তারপর এমন ভঙ্গিতে উপরের দিকে তাকালেন যেন তিনি এইমাত্র স্লেইট পাথর গোণা শেষ করলেন। তার ঠোঁট দু'টো কয়েকবার কেঁপে উঠল। অবশেষে তিনি মুখ খুললেন।

'আগামীকাল তোমরা প্রত্যেকে বসন্তকালের উপর রচনা লিখে আনবে,' তিনি বললেন।

এটা আমাদের জন্য একটা বিস্ময়। শিক্ষকের মুখের দিকে আমরা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। তখন 'বসন্তকালের উপর রচনা' শব্দগুলো আমাদের কানের ভেতর রিনরিন করে বাজছিল। আমরা সবাই হতবাক, রীতিমতো স্তম্ভিত।

আমাদের মনের অবস্থা শিক্ষক হয়তো বুঝতে পেরেছেন। আমাদের কি করা উচিত, তাই তিনি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। 'নিশ্চয়, তোমরা বুঝতে পারছ, আমি কি বলতে চেয়েছি। তোমরা বসন্তকালের উপর রচনা লিখবে। বলবে, বসন্তকালে লোকজন কি করে কিংবা জন্তু-জানোয়ারেরা কি করে— এ সব বিষয়।'

শিক্ষক মনে করেছেন আমরা তার মতোই বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। তাই তিনি ভেবেছেন, এটুকু বিবরণই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তখনো আমরা 'বসন্তকালের উপর রচনা' লেখার বিষয় নিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছিলাম।

www.pathagar.com

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় আর কিছুই ভাবতে পারিনি। শুধু ভাবছিলাম 'বসন্তকালের উপর রচনা', যা আমাকে আগামীকালের মধ্যেই লিখতে হবে।

বাড়ি ফিরে এসে আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করি, 'আম্মাজান, আপনি কি জানেন, রচনা কি জিনিস?'

আম্মাজান বড় বড় চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না বাবা, আমি জানি না। তুমি কি আজই এটা শিখেছ?'

'আমি শিখিনি,' আমি বললাম। 'কিন্তু আমাকে একটা রচনা লিখতে হবে। বসন্তকালের উপর রচনা লিখে আগামীকাল স্কুলে যেতে হবে।'

দুপুরের খাবার খেয়ে আমি লিখতে বসি। অর্থাৎ আমি কাগজের উপর দিক থেকে লেখা শুরু করি, কিন্তু লেখা শেষ করতে পারিনি। আমি জানি না, কি লিখতে হবে। তাই শুধু ভাবতে থাকি। আমার মাথায় কিছুই আসে না। অবশেষে চেয়ার থেকে উঠে আমি জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াই এবং বাইরের উঠানের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকি।

আমাদের উঠানের গাছের ডালে অসংখ্য চড়ুই পাখি। সবুজ পাতার ফাঁকে চড়ুই পাখিগুলোকে হলুদ দেখাচ্ছে। উঠানের এক কোণে ধূলোবালির মধ্যে আমাদের মুরগিটা খেলা করছে। আমার কাছে মুরগিটার রঙ নীল বলে মনে হল। অন্য ছোট পাখিগুলো ছাদের ফাঁকে বাসা তৈরি করছে। ওগুলোকে মাছের আকৃতির ঘুড়ির মতো দেখাচ্ছে। একসময় নজরে এলো আমাদের বিড়ালটা। ও সূর্যের তাপ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই বিড়ালটা দেয়ালের আড়ালে ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। আমার কাছে বিড়ালটা সবুজ রঙের মনে হল।

পুনরায় আমি লেখার প্যাড খুলে বসি। এবারও কিছুই লিখতে পারলাম না। মন ভীষণ খারাপ এবং সত্যি আমার দারুণ কষ্ট হল। ঘর থেকে বেরিয়ে আমি সরু গলির দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে একাগ্র মনে ভাবতে থাকি।

সে সময় নানা কিসিমের ভাবনা এসে আমার মস্তিষ্কে জমা হতে থাকে। কিন্তু তখনও শিক্ষকের কথাগুলো আমার মগজের দেওয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে—'বসন্তকালের উপর রচনা'—'এ কম্পোজিশন অ্যাবাউট স্প্রিং'।

আমি যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তখন তাকিয়ে দেখি আমাদের প্রতিবেশী ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। তার দেহের গড়ন ঋজু এবং দীর্ঘ। আব্বাজান আমাদের প্রায়ই বলতেন, ভদ্রলোক নাকি একসময় কবি ছিলেন। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসা আমাকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন।

www.pathagar.com

'মন খারাপ কেন?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের শিক্ষক একটা রচনা লিখতে বলেছেন।' ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, 'বসন্তকাল সম্পর্কে।'

'এবং তুমি তা লিখতে পারছ না, তাই না?' তিনি বললেন।

'তাই।' মাথা নিচু করে আমি অস্ফুট স্বরে বললাম।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক হাসতে শুরু করেন। তিনি কাছে এসে আমার একটা হাত তার হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্য হাতের আঙুল ঘুরিয়ে বাতাসের মধ্যে বিশাল একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করলেন।

'তোমার চারপাশে তাকিয়ে দেখো,' তিনি বললেন। 'যা কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হবে, তাই লিখবে। তাহলেই বসন্তকাল নিয়ে রচনা লেখা হয়ে যাবে।'

হঠাৎ আমার মনের ভেতর সবকিছু স্বচ্ছ হতে থাকে। 'তাই তো!' একসময় আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠি। তারপর তড়িৎ বেগে ঘরে ফিরে এসে পুনরায় জানালার পাশে দাঁড়াই। ঘর থেকে বেরোনোর সময় সবকিছু দেখতে যেমন ছিল, এখনও ঠিক সে রকমই আছে। গাছের ছায়ায় বসে ভাত রান্না করার জন্য আম্মাজান চাল পরিষ্কার করছেন।

কলম নিয়ে আমি খাতার উপর শিরোনাম লিখি, 'এ কম্পোজিশন অ্যাবাউট স্প্রিং'।

তারপর আমি লিখলাম, 'বসন্তকালে হলুদ রঙের চড়ুই পাখিরা গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে ওড়াওড়ি করে। ধূলোবালির মধ্যে নীল রঙের মুরগি খেলা করে। দেখতে ঘুড়ির মতো, অথচ মাছের আকৃতির, ছোট্ট পাখি বাসা বানায়। সবুজ রঙের বিড়াল রোদ পছন্দ করে না। তাই সে দেয়ালের আড়ালে ছায়ায় ঘুমায়। আম্মাজান গাছের ছায়ায় বসে চাল পরিষ্কার করছেন, যা তিনি পরে রান্না করবেন। বসন্তকালের আকাশ মেঘহীন, স্বচ্ছ। চতুর্দিকে মৌমাছিরা ওড়াওড়ি করে। স্কুলের ছেলেরা বসন্তকালের উপর রচনা লেখায় ব্যস্ত।' এর বেশি কিছু লিখতে পারিনি। কিন্তু যেটুকু লিখেছি, তাতেই আমি দারুণ খুশি।

পরদিন ক্লাসে শিক্ষক আমাদের রচনা নিয়ে আলোচনা করেন। একসময় আমার পালা এলো। আমি কি লিখেছি, শিক্ষক তা পড়ে শোনালেন। তারপর তিনি এক মুহূর্তের জন্য কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। সে সময় আমার বুকের ভেতর দ্রুত গতিতে শব্দ হচ্ছিল। শিক্ষক ইশারায় আমাকে তার

www.pathagar.com

ডেস্কের দিকে যেতে বললেন। আমি ভীরু পায়ে এগিয়ে গেলাম।

চোখেমুখে একরাশ বিস্ময় ফুটিয়ে শিক্ষক বললেন, 'তোমার আব্বাজানকে বলো তিনি যেন তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।'

'কেন, স্যার?' ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞেস করি।

'মনে হয় তোমার চোখে সমস্যা আছে। তুমি ঠিক মতো দেখতে পাও না।' জবাবে তিনি বললেন।

'চোখ তো আমার ভালোই আছে, স্যার।' আমতা আমতা করে বললাম।

সরাসরি আমার মুখের উপর তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি নিশ্চয় জানো, চড়ুই পাখি দেখতে হলুদ রঙের হয় না, মুরগিও নীল রঙের হয় না এবং কোনো বিড়ালই সবুজ রঙের হয় না। এগুলোর কোনোটাই ঠিক না। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বললাম।

রচনাটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে শিক্ষক বললেন, 'এখন যাও।'

রচনাটির দিকে তাকিয়ে দেখি, লাল কালিতে বিরাট বড় করে 'ক্রস' চিহ্ন। অশ্রুতে আমার দু'চোখ ভরে গেল। 'ক্রস' চিহ্নটা আমার কাছে মনে হলো আড়াআড়ি ভাবে দু'টি রক্তাক্ত তলোয়ার।

[**গল্পসূত্র :** 'কম্পোজিশন' গল্পটি আজম রাহনাওয়ার জারিয়াবের 'দারি' ভাষায় রচিত এবং ড. এস. ওয়ালী আহমাদীর ইংরেজিতে অনূদিত 'দ্য কম্পোজিশন' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি ২০০০ সালের এপ্রিল-জুন সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : আজম রাহনাওয়ার জারিয়াবের জন্ম ১৯৪৫ সালে, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রি অর্জন করেন। স্কুল জীবন থেকেই কাবুলের বিভিন্ন ম্যাগাজিন এবং জার্নালে তার ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। তিনি বিভিন্ন লেখকের অসংখ্য লেখা ইংরেজি থেকে 'দারি' ভাষায় অনুবাদ করেন। একসময় তিনি আফগান রাইটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্থায়ীভাবে ফ্রান্সে বসবাস করছেন।

www.pathagar.com

আজম রাহনাওয়ার জারিয়াব

ফটো

তখন আমার বয়স সাত বছর। প্রতিদিন আমি রাস্তা পারাপারের সময় দেখি দেয়ালের সামনে স্ট্যান্ডের উপর বসানো বুড়ো ফটোগ্রাফারের রঙচটা ক্যামেরা। বিষণ্ন মুখে বুড়ো লোকটি মাটির ওপর বসে থাকে। তিন-পায়া স্ট্যান্ডের উপর অদ্ভুত বাক্সের মতো তার ক্যামেরা।

বাক্সের একদিকে ফুটোর সামনে কাচের লেন্স। লেন্সটি কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। লেন্সের ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে একটা ছোট্ট গর্ত। ডান দিকে এক টুকরো কালো কাপড় ঝুলে আছে।

কখনও কখনও আমি বুড়ো ফটোগ্রাফারকে অন্যদের ফটো তুলতে দেখেছি। তখন লোকেরা দেয়ালের সামনের বেঞ্চিতে বসে। পেছনে কালো কাপড়ের পর্দা ঝুলানো থাকে।

ফটো তোলার জন্য ক্যামেরা রেডি করে বুড়ো ফটোগ্রাফার বলে, 'থুতুনিটা উপরের দিকে তুলুন ... সামান্য নিচে ... না, না, একটু ওপরে ... আমার হাতের দিকে তাকান ... ঠিক আছে। যেভাবে আছেন, ঠিক সেভাবেই থাকেন।'

বিস্মিত হয়ে আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে বুড়ো ফটোগ্রাফারের এসব কর্মকাণ্ড দেখি এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করি, 'অই বাক্সের ভেতর কি আছে?'

যাহোক, আমি যতই ভাবি না কেন, কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। কয়েক মুহূর্ত পরে যখন দেখলাম বুড়ো ফটোগ্রাফার ক্যামেরার ভেতর থেকে লোকটির একটা স্যাঁতস্যাঁতে কাগজের ফটো বের করল, তখন আমার কৌতূহল এবং বিস্ময় সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

একদিন আমি ফটোগ্রাফারের কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনি কি আমার ফটো তুলে দেবেন?'

বুড়ো ফটোগ্রাফার দাঁত বের করে হেসে বলল, 'কেন নয়?'

আমি জানতে চাইলাম, 'কত দিতে হবে?'

www.pathagar.com

'তুমি কি পোট্রেট চাও, নাকি পুরো ফটো চাও?' সে জিজ্ঞেস করে।

উত্তরে আমি বললাম, 'পুরো ফটো চাই।'

পুনরায় ফটোগ্রাফার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি এক কপি ফটো চাও?'

আমি বললাম, 'এক কপি চাই।'

সে বলল, 'দশ আফগানি লাগবে।'

সেদিন থেকে আমি আফগানি জমাতে শুরু করি। আমার ইচ্ছে দশ আফগানি জমিয়ে আমার একটা ফটো তুলব। দশ আফগানি জমাতে আমার অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে একদিন গুনে দেখি দশ আফগানি জমিয়েছি।

পকেটে আফগানিগুলো নিয়ে আমি বুড়ো ফটোগ্রাফারের কাছে যাই। যখন সে আমাকে দেখল, তখন মনে হলো সে আমার আগমনের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিল। বলল, 'তুমি এসেছ?'

তার হাতে আমি আফগানিগুলো তুলে দিয়ে বললাম, 'এখানে দশ আফগানি আছে।'

আফগানিগুলো না গুনেই সে তার পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'তাহলে এখানে এসে দাঁড়াও।'

আমি একটা কালো পর্দার সামনে দাঁড়াই। সে ক্যামেরার কালো ঢাকনা সরিয়ে নিয়ে আমার ফটো তোলার জন্য তৈরি হয়। আমি ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকি। আমার ভেতরে চরম উত্তেজনা। কিছুতেই আমি হাসি চেপে রাখতে পারছি না।

নিজেকেই নিজে বললাম, 'আমার ফটো তোলা হচ্ছে। আমার ফটো ...।'

শুনতে পেলাম বুড়ো ফটোগ্রাফার বলছে, 'বামে তাকাও ... না, একটু ডানে ... আরো একটু ... ঠিক আছে, চলবে।'

'ফটোটা দেখতে কেমন লাগবে?' মনে মনে ভাবলাম।

বুড়ো ফটোগ্রাফার বলল, 'পা দু'টি চেপে বসো।'

আমি আর কিছুতেই হাসি দমন করতে পারছি না।

রীতিমতো ধমকের সুরে বুড়ো ফটোগ্রাফার বলল, 'হেসো না।'

শক্ত করে আমি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরি এবং সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমি হাসি থামাতে পারছি না।

আদেশের ভঙ্গিতে সে বলল, 'একটুও নড়বে না।'

হাসি থামানোর জন্য আমি ঠোঁট দু'টি আরো জোরে চেপে ধরি।

www.pathagar.com

ফটোগ্রাফার ক্যামেরা থেকে কালো কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে নেয়। ক্যামেরার স্বচ্ছ কাচের লেন্সটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুনরায় সে কালো কাপড় দিয়ে ক্যামেরাটা ঢেকে দিয়ে বলল, 'ফটো তোলা শেষ।'

আমার মাথা থেকে একটা ভার নেমে গেল। আমি এখন আমার ফটো দেখার জন্য ভীষণ উদগ্রীব। বুড়ো ফটোগ্রাফার ফটোটা একটা কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিল। কয়েক কদম যাওয়ার পর আমি কাগজে মোড়ানো ছবিটা বের করি এবং হাসতে থাকি। ফটোটা আমার। পুরোটাই আমার ফটো।

পরনে আলখেল্লা, মাথায় ছোট্ট পাগড়ি এবং পায়ে জুতা— দাঁড়ানো আমাকেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মাথায় পাগড়িটা একটু কাত হয়ে আছে। তাই চুলের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। আমি মূর্তির মতো সটান দাঁড়িয়ে আছি। এমনভাবে ঠোঁট চেপে আছি যে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আমি কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারিনি।

এই সংকট মুহূর্তে আমার চোখেমুখে বিস্ময় এবং একধরনের আনন্দের অনুভূতি খেলা করে। দেহের তুলনায় আলখেল্লাটা বেশ বড় এবং জুতার সামনেটা বড্ড বাজে দেখাচ্ছে। যাহোক, আমি আমাকে ভীষণ পছন্দ করি। আম্মাজানকে দেখানোর জন্য ফটোটা পকেটে ঢুকিয়ে আমি বাড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করি।

বাড়িতে পৌঁছেই উত্তেজিত স্বরে আম্মাজানকে বললাম, 'আমার ফটো তোলা হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আম্মাজান বললেন, 'দেখি, দেখি। আমাকে দে।'

হাত ঢুকিয়ে দেখি পকেটে ফটো নেই। দারুণ উত্তেজনায় দৌড়ে বাড়ি ফেরার সময় হয়তো পথে কোথাও ফটোটা হারিয়ে ফেলেছি। পলকেই আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মা জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার?'

কোনো কিছু না বলেই আমি রাস্তা ধরে দৌড়াতে থাকি। যে রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরেছি, সে রাস্তায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ফটোটা কোথাও পেলাম না। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এসে আমি কাঁদতে শুরু করি।

মামা এসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'চিন্তা করিস না। আমি তোর একটা ভালো ফটো তোলার ব্যবস্থা করব।'

আম্মাজান আমার মাথার চুল পরিপাটি করে ভালো কাপড় পরিয়ে দিলেন। ফটো তোলার জন্য মামা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। তিনি

www.pathagar.com

বুড়ো ফটোগ্রাফারের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন না। এবং বললেন, 'তোকে ফটো স্টুডিওতে নিয়ে যাচ্ছি।'

মামা আমাকে সুন্দর একটা স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। ওখানে আমার ফটো তোলা হয়েছে। আমি নিজের ফটোটা ভালো করে দেখলাম। যদিও ফটোটা আমারই, কিন্তু আমাকে তেমন পরিতৃপ্ত করতে পারল না। ফটোতে কোনো বিশেষ কিছু নেই। যে ফটোটা আমি হারিয়ে ফেলেছি, বারবার ওটার কথাই মনে পড়ছিল।

একটা ছেলে সৈনিকের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে দেহের তুলনায় বড় আলখেল্লা। মাথার পাগড়ি পেছনের দিকে বাঁকা হয়ে থাকার জন্য সামনের কালো চুল দেখা যাচ্ছে। তার পায়ের জুতার সামনেটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। হাসি থামানোর জন্য ছেলেটি শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছে। কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখের তারায় আমি প্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছি। আমি অজান্তেই অতীতে ফিরে যাই, যা আমাকে হাসির খোরাক যুগিয়েছে।

ফটোর উপরের দিকে ক্যাপশান 'সপ্তাহের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছবি' এবং নিচে খোদাই করে লেখা, 'সুখী গ্রাম্য বালক।'

স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, 'বুড়ো ফটোগ্রাফার কি বেঁচে আছে, নাকি মারা গেছে?'

[**গল্পসূত্র :** 'ফটো' গল্পটি আজম রাহনাওয়ার জারিয়াবের 'দারি' ভাষায় রচিত এবং ফারহাদ আজাদের ইংরেজিতে অনূদিত 'দ্য ফটো' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি আশির দশকের শেষ দিকে কাবুলের 'আফগানিস্তান টুডে' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। পরে ২০০৪ সালের 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : আজম রাহনাওয়ার জারিয়াবের জন্ম ১৯৪৫ সালে, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রি অর্জন করেন। স্কুল জীবন থেকেই কাবুলের বিভিন্ন ম্যাগাজিন এবং জার্নালে তার ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। তিনি বিভিন্ন লেখকের অসংখ্য লেখা ইংরেজি থেকে 'দারি' ভাষায় অনুবাদ করেন। একসময় তিনি আফগান রাইটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্থায়ীভাবে ফ্রান্সে বসবাস করছেন।

www.pathagar.com

রয়া খোরশীদ

তার বিশ্বস্ত চোখ

সন্ধ্যের আবছা অন্ধকার ঘিরে আছে আনার গুলের কুঁড়েঘর। ঘরের ভেতরে সে তখন পুরনো তেলের বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করছিল। বাতি জ্বালানোর পর সে নিজের জন্য ছোট্ট ইস্পাতের কেটলিতে চা তৈরি করে। চায়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য চিনি ও এক টুকরো রুটি নিয়ে বসে। এটাই তার রাতের খাবার। রুটির টুকরোয় কয়েক কামড় দেওয়ার পর তাড়াতাড়ি সে কয়েকবার চায়ের কাপে চুমুক দেয়। শারীরিক এবং মানসিকভাবে সে আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, কেননা মির্জা হাবীবের পরিবারের জন্য পুরো সপ্তাহ কাপড় সেলাই করেছে।

অনেকদিন ধরে আনার গুল মহিলাদের পোশাক তৈরি করে। আসলে কাপড় সেলাই করা তার পেশা। সারাটা জীবন সে কুঁড়েঘরের এক কোণে বসে হাতে কাপড় সেলাই করে আসছে। বয়সের ভারে এখন সে কুঁজো হয়ে গেছে। একটা সেলাই মেশিন কেনার স্বপ্ন ছিল তার। কিন্তু দারিদ্রতা সেই লালিত স্বপ্নকে কোনোদিনই সত্যি হতে দেয়নি। যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন সে শক্তিহীন হচ্ছে এবং ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছে। এখন তার হাতে এবং আঙুলে আগের মতো শক্তি কিংবা সামর্থ্য নেই। সব সময় পিঠে ব্যথা এবং ক্লান্তির গাঢ় সর লেগে আছে চোখের পাতায়। তার কাছে অন্য কোনো বিকল্প উপায় নেই। তাই জীবনের তাগিদে এই বয়সেও বসে বসে তাকে প্রতিদিন কাপড় সেলাই করতে হয়।

আজ আনার গুল সত্যি ভীষণ ক্লান্ত। সে মনে মনে ভাবল, আজ বেশ ধীরেসুস্থে আয়েস করে রাতের খাবার খাবে। কিন্তু অকস্মাৎ তার মনে পড়ল, তিন দিন বাদে মির্জা পরিবারের কাপড় নিতে নওরোজ আসবে। নতুন কাপড়গুলো মির্জা পরিবারের ভীষণ দরকার। এছাড়া খাবার-দাবার কেনার জন্য তারও টাকার প্রয়োজন। সে অসমাপ্ত খাবার পাশে সরিয়ে রেখে মির্জা হাবীবের স্ত্রী খানম গুলের সবুজ পোষাক সেলাই করতে শুরু করে। কাজের

www.pathagar.com

জন্য আলো পর্যাপ্ত না হওয়ায় সে আলোটা আরো বাড়িয়ে দেয়। যখন সে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ দেওয়ালের গায়ে তার নিজের ছায়ার ওপর দৃষ্টি পড়ে। দেওয়ালের দিকে অপলক তাকিয়ে সে ছায়াটাকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং আপন মনে ভাবে, কেমন করে ছায়াটা সারা জীবন তার একমাত্র সঙ্গিনী হয়ে আছে। আশেপাশের লোকজন তার সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। সে আজ অচেনা ভুবনের মাঝখানে একাকী, অসহায়। অথচ তার এই ছায়া সব সময় তার সঙ্গে আছে এবং জীবনের প্রতিটি সময় তাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছে। শুধু এটুকুই পরিবর্তন হয়েছে যে ছায়াটা এখন দুর্বল, ক্ষয়িষ্ণু এবং কুঁজো। একদিন ছায়াটা ছিল আনার গুলের মতোই ঋজু এবং শক্ত। কিন্তু এই দীর্ঘ জীবনে নানান ঝড়-ঝাপটা এসে তার ছায়া এবং তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

আনার গুলের জন্মের আগেই তার আব্বাজান ইন্তেকাল করেছেন। আব্বাজানের মৃত্যুর পর তার আম্মাজানকে জোর করে দুলাভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি গ্রাম থেকে পালিয়ে যান। আনার গুলের আম্মাজান দূরের এক গ্রামে মির্জা হাবীবের ছেলে মির্জা কাইয়ুমের বাসায় ঝিয়ের কাজ পান। প্রথমে লোকজন তাকে বেশ ভালো ভাবেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যখন সবাই বুঝতে পারল সে অন্তঃসত্ত্বা, তখন থেকেই বিপত্তির অশুভ মেঘ এসে জমা হতে থাকে তার জীবনে। কয়েক দিনের মধ্যে গ্রামের মুরুব্বীরা রটিয়ে দিল যে আনার গুল পেটে একটা জারজ সন্তান নিয়ে পালিয়ে এসেছে। গ্রামের দুর্নামের ভয়ে লোকজন তাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু গ্রামের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার শর্তে দয়ালু মির্জা কাইয়ুম তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

আনার গুলের জন্ম হয়েছে তার আম্মাজানের নিঃসঙ্গ জীবনে, যে জীবন উত্তরাধিকার সূত্রে সে নিজেও বহন করে চলেছে। অন্য সব শিশুদের মত স্বাভাবিকভাবেই তার জন্ম হয়েছিল। জন্মের সময় তার স্বাস্থ্য ছিল নাদুস-নুদুস, ঘনকালো চুল, উন্নত নাক, সুন্দর মুখ এবং এক জোড়া অদ্বিতীয় চোখ। সেই চোখের আকৃতি নয়, বরং চোখের মনির রঙ অন্যদের বিমোহিত করে। আনার গুলের একটা চোখের মনি অমাবশ্যা রাতের মতো ঘুটঘুটে কালো এবং অন্যটার রঙ গভীর মহাসমুদ্রের অথই পানির মতো গাঢ় নীল। তবে আনার গুলের আম্মাজানের কাছে মেয়ের চোখ দু'টি হলো আল্লাহপাকের দেওয়া একধরনের বিশেষ নেয়ামত। কিন্তু গ্রামবাসীর কাছে আনার গুলের চোখ হলো জারজ সন্তান হিসেবে জন্ম নেওয়ার অভিশাপ। আনার গুলের মনে হয়, এই

www.pathagar.com

অভিশাপ ছায়ার মতো তাকে সারা জীবন অনুসরণ করেছে।

একজন সমাজচ্যুত হিসেবে আনার গুল বড় হয়েছে, কেননা সমাজ তার সঙ্গে বৈরী ব্যবহার করেছে। যদিও তার আসল নাম আনার গুল এবং আম্মাজান তাকে আদর করে 'আনারী' বলে ডাকে, অথচ অন্যান্য ছেলেমেয়েরা তাকে 'শয়তানের বাচ্চা', 'অপয়া', 'জারজ' এবং সবচেয়ে খারাপ বিশেষণ 'ডাইনি চোখ' বলে সম্বোধন করত। তার সরলতার জন্য যুবতী হওয়া পর্যন্ত এ সব আজেবাজে সম্বোধন আনার গুলকে তেমন বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু যুবতী হওয়ার পর অন্যদের এ ধরনের আজেবাজে এবং অরুচিকর মন্তব্য তার মোটেও ভালো লাগত না। মাঝে মাঝে তার কচি মনে প্রশ্ন জেগেছে, শুধু চোখের জন্য কেন সে ষড়যন্ত্রের শিকার এবং সমাজে অপাঙক্তেয়। এ বিষয়ে সে অনেকবার আম্মাজানকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছে। তার চোখে কি সমস্যা হয়েছিল? চোখের জন্য কি সবাই তাকে অপছন্দ করে? কেন তার চোখের মনির রং অন্যদের চেয়ে ভিন্ন? কেন সবার মতো তার চোখ হয়নি? জারজ হয়ে জন্মানোর জন্যই কি এ রকম চোখ তার?

মেয়ের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে প্রতিবার আনার গুলের আম্মাজান একই কথা বলেছেন, 'তোর সুন্দর চোখ দু'টি আমাদের জন্য আশীর্বাদ, কখনই অভিশাপ নয়। লোকেরা যে যা বলে বলুক, আমার কাছে সেসব কথার কোনো দাম নেই। আমি জানি, আমরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। পরম করুণাময় আল্লাহপাক সাক্ষী।'

শুরুর দিকে আম্মাজানের কথাগুলো আনার গুলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু এখন আল্লাহপাকের অজুহাতও কেন জানি তার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কুঁড়েঘরের এক কোণে জানালার পাশে রোদে বসে যখন কাপড় সেলাই করে, তখন সে তার চোখের সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। সে জানে, বছরের পর বছর ঘরের এক কোণে বসে বসে ভাবলেও সে কোনোদিন তার প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাবে না, বরং একমাত্র কাপড় সেলাই করার চিন্তাটা তার মনের বিশাল আকাশে মেঘ হয়ে ভাসতে থাকবে।

আনার গুলের অভিশপ্ত জীবনের মাঝেই একদিন হঠাৎ করে তার হতভাগিনী এবং বন্ধুতূল্য মায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর মায়ের জানাজা ও গোর দেওয়ার জন্য গ্রামের কেউ এগিয়ে আসেনি। একমাত্র মির্জা কাইয়ুম মহানুভবতার হাত বাড়িয়ে নিশ্চিত করেছে যে তার মা কবরের জন্য একটা ভালো জায়গা পায়। মায়ের মৃত্যুর পর আনার গুল নির্বান্ধব হয়ে পড়ে এবং একাকীত্ব তাকে চারপাশ থেকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরে। তার সমস্ত দুঃখকষ্ট

www.pathagar.com

মনের ভেতর ক্রমশ ঘনিভূত হতে থাকে। মায়ের পুরনো আয়নায় সে নিজের চেহারার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে এবং সবকিছুর জন্য চোখ দু'টিকে দোষারোপ করে। দিন যতই যায়, তার মনের ভেতর একধরনের বিশ্বাস জন্মাতে থাকে যে আসলেই সে অভিশপ্ত, অপয়া। তাই সে জীবনের সবকিছু, এমনকি পরিবার থেকে বঞ্চিত। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে লোকজনের কাছ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে একাকীত্বের জীবনযাপন করবে।

আনার গুলের চোখ দেখে লোকজন ভয় পেলে তাদের কোনোমতেই দোষ দেয়া যায় না, কেননা তার চোখই ডাইনির মতো। তাই সে একাকী কুঁড়েঘরের এক কোণে বসে আপন মনে কাপড় সেলাই করে এবং মাঝে মাঝে ভাবনার অথই পানিতে হাবুডুবু খায়।

কয়েক বছর বাদে মির্জা কাইয়ুম তার একজন কর্মচারীর সঙ্গে আনার গুলের বিয়ে ঠিক করে। লোকটির নাম শাহ আগা। কুড়ি মিনিটের কম সময়ের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাদামাটা ভাবে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। আনার গুল বিয়ের আগে শাহ আগাকে কখনই দেখেনি, এমনকি নামও শোনেনি। বিয়ের পর শাহ আগা স্ত্রীকে তার কুঁড়েঘরে তোলে এবং সেখানে আনার গুল নতুন জীবন শুরু করে। যদিও নববিবাহিতা স্ত্রীর মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে শাহ আগার কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, তবে স্ত্রীর চলাফেরার প্রতিটি মুহূর্তকে সে দারুণ প্রশংসা করেছে। স্ত্রীর নীল এবং কালো চোখ প্রতিদিনই তার কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই দেখে সে রীতিমতো মুগ্ধ। বিয়ের পর আনার গুলের অতীতের টানাপোড়েন জীবন কেটে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন শুরু হয়। তখন তার কাছে নিজেকে তামাম দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী নারী বলে মনে হয়। কিন্তু সেই সুখ তার কপালে বেশি দিন টেকেনি। মাত্র দু'মাসের মাথায় তার মায়ের মতো শাহ আগাও তাকে এই বিশ্ব সংসারে একা রেখে চলে যায় পরপারের অচিন দেশে। স্বামীর মৃত্যু তাকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করে, যা অন্য কারোর পক্ষে অনুধাবন করা মোটেও সম্ভব নয়। কুঁড়েঘরের অন্ধকারে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদত। কখনওবা উন্মাদের মতো হাসত। অনেক সময় মৃত স্বামীর কাপড়চোপড় বুকে জড়িয়ে ধরে প্রলাপ বকত। কেউ একজন মির্জা কাইয়ুমকে এ-ও বলেছে যে, আনার গুল স্বামীর কবর খুঁড়ে লাশ তুলে নিয়ে আসবে। এ কথা শোনার পর আনার গুলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য মির্জা কাইয়ুম তার স্ত্রীকে পাঠায়। আনার গুলের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথাটা ফিরে এসে মির্জা কাইয়ুমের স্ত্রী স্বামীকে বলল।

www.pathagar.com

মধ্যরাতে আনার গুলের কান্নার শব্দে গ্রামবাসীরা রীতিমতো ভয় পেয়ে অনুযোগ করেছে। কিন্তু আনার গুলের কাছে গিয়ে কান্না থামানোর কথা বলতে পারার মতো তাদের মধ্যে সাহসী কেউ ছিল না, এমনকি কোনোরকম উৎসাহও দেখায়নি।

'উফ!' সুঁই দিয়ে নিজের চোখে খোঁচা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনার গুল চিৎকার করে ওঠে এবং ব্যথাটা তার অতীতের ফেলে আসা জীবনটাকে টেনে বর্তমানে নিয়ে আসে। তার মনে হয় সে যেন সেই আগের অন্ধকার কুঁড়েঘরে বসে খানম গুলের সবুজ পোষাক তৈরি করছে এবং এখন সেই পোষাকের গায়ে কয়েক ফোটা রক্ত লেগে আছে। তার মুখ ভিজে গেছে অশ্রুবিন্দু আর ঘামে। সে চোখে ভীষণ ব্যথা অনুভব করে। তবে সে বেশিক্ষণ কাঁদেনি। বালিশের নিচ থেকে মায়ের পুরনো আয়নাটা বের করে অনেক বছর বাদে আবার সে নিজের মুখ দেখে। তার চোখেমুখে ক্লান্তির বিষণ্ন ছায়া। অনেকদিনের সংগ্রামী কঠিন মুখটা দেখতে কেমন যেন ভাবলেশহীন। আসলে সমস্ত ব্যথার মূল উৎস হচ্ছে তার চোখ এবং সেই চোখ তার জীবনের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে বুঝতে পারে তার বিশ্বস্ত কালো চোখ, যেটা ছিল অমাবশ্যা রাতের মত কালো, বদলে গিয়ে ছাই রং হয়েছে এবং যে চোখটা ছিল গভীর সমুদ্রের মত ঘন নীল, সেটার রং হয়েছে বৃষ্টিভেজা আকাশের মতো ধূসর এবং মলিন। সেই রাতে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে থেকেছে। যতই সে তার চোখ দেখছিল, ততই যেন চোখের প্রতি তার মনের ভেতর প্রচণ্ড ঘৃণা জমছিল। অবশেষে সে ভাবল, ঢের হয়েছে। একসময় সে আয়নাটা দেয়ালের গায়ে ছুড়ে মারে এবং তীব্র যন্ত্রণায় কাঁদতে থাকে। তারপর অভিশপ্ত জীবনের দুর্ভোগ মেটাতে সে চিরদিনের জন্য চোখ বন্ধ করে।

[**গল্পসূত্র :** 'তার বিশ্বস্ত চোখ' গল্পটি রয়া খোরশীদের ইংরেজিতে 'হার ফেইথফুল আইস্' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়।]

লেখক পরিচিতি : রয়া খোরশীদ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন কবি এবং ছোটগল্প লেখিকা। ১৯৯৭ সাল থেকে 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ নিয়মিত কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। তিনি 'এসোসিয়েশন অফ আফগান রাইটার্স'-এর একজন সক্রিয় সদস্যা।

www.pathagar.com

দনিয়া গোবার

মা

জরাজীর্ণ কুটিরের ভেতর ফাঁকা জায়গায় মোমবাতির টিমটিমে আলো জ্বলছিল। মেঝেতে বিছানো পশমী চাদরের ওপর, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা মাটির মেঝেয়, মরচে পড়া চুলায়, দেয়ালের পাশে গোল করে পেঁচানো পুরনো কম্বলের গায়ে, তাকের ওপর সাজানো ভাঙা হাঁড়ি-পাতিলের ফুঁটোয়, এমনকি খবরের কাগজে ঢাকা একমাত্র ভাঙা জানালায় আবছা আলোর ছায়া থিরথির করে কাঁপছিল। মা যখন সতর্কতার সঙ্গে কেতলি থেকে কাপে চা ঢালছিল, তখন যুবকটি আড়চোখে তার মায়ের জীর্ণ হাতের দিকে তাকায়। সেই সময় তার মন কল্পনার শত শত পাহাড় এবং উপত্যকা পেরিয়ে চলে যায় অতীতের ফেলে আসা রঙিন দিনগুলোয়, যখন শীতের কনকনে হাওয়া এসে তার মায়ের ঘন কালো চুলে আলতো করে দোলা দিয়ে যেত।

একসময় নিস্তব্ধতাকে ভেঙে মা বলল, 'তোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নে। পরে না হয় জাতীয় মেলায় যাস। জানিস তো, আজই মেলা শেষ হয়ে যাবে।'

'জাতীয় মেলা ... ,' যুবকটি বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল। পারদের মতো ভারি ঘুমে তার চোখের পাতা ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসে। ঘুম এবং জাগরণের মধ্যবর্তী জায়গায় পৌঁছনোর পর তার মনের স্নিগ্ধ সরোবরে বুদবুদের মতো ভেসে ওঠে অতীতের অনেক ঘটনা, নানান স্মৃতি।

যুবকটির মনে পড়ে প্রতি বছর তারা দল বেঁধে একসঙ্গে মেলায় যেত। সেখানে স্বাধীনতা দিবস পালন করার জন্য ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই জমায়েত হতো।

যুবকটির বাবা তাকে প্রায়ই বলত যে অতীতে কেমন করে সাধারণ জনগণ বিদেশীদের শাসন এবং তাবেদারী প্রত্যাখান করেছিল, এমনকি সমস্ত দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে তিনবার শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেছিল। আরো বলত, কেমন করে সেই দুঃসময় নেমে

www.pathagar.com

এসেছিল নিরীহ আমজনতার ওপর। তখন এক এক করে অনেকের নামই কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং রাতের অন্ধকারে তাদের বেমালুম গায়েব করা হয়েছে। তারা কোনোদিন আর ফিরে আসেনি, এমনকি তাদের কোনো হদিসও পাওয়া যায়নি। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য এবং ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার উদ্দেশে বর্বর সরকার স্বার্থপরের মতো শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মুক্তচিন্তা থেকে জনগণকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করেছে। এছাড়াও সরকার ধর্মকে নিজেদের পছন্দ মতো অদল-বদল করে নিয়েছিল। তাই মাটির কুটিরের জীর্ণ-শীর্ণ মানুষের মনের ভেতর বছরের পর বছর স্বাধীনতার বীজ ক্রমশ অঙ্কুরিত হতে থাকে।

যুবকটির আরো মনে পড়ে কোনো এক মাতাল হাওয়ার রাতে বাবা অত্যন্ত জরুরি এক গোপন সভায় অংশগ্রহণ করতে যায়। সেই রাতে বাবার ফিরে আসার পথ চেয়ে মা খাবার নিয়ে অপেক্ষা করেছে। সে অনেক বছর আগের ঘটনা। সেই রাতে তার বাবা ফিরে আসেনি, এমনকি আর কোনোদিনও তার হদিস মেলেনি।

'এখন ওরা আর লাল পতাকা পছন্দ করে না। কেননা লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিচ্ছে না।' চায়ের কাপে আলতো করে চুমুক দিয়ে মন্তব্যের সুরে মা বলল। একটু থেমে সে আরো বলল, 'তুই সাচ্চা। অবশ্যই মেলায় কোনো আসল সহকর্মীর সন্ধান পাবি।'

মায়ের কথা শুনে যুবকটির ঠোঁটের ফাঁকে এক ঝলক বিদ্রুপের হালকা হাসি ফুটে ওঠে এবং ক্রমশ হাসিটা তার মনের ভেতর তিক্ততা ছড়ায়।

তখনও যুবকটির চোখের পাতা বন্ধ। সে তার মায়ের মোলায়েম কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। 'বড় বাড়িতে আজ আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারখানার কর্মরত বিত্তহীন দক্ষ শ্রমিকদের সরকার কথাটার অর্থ কি। ছোট ছেলেটি বলেছে, যে সরকার শ্রমিকদের জন্য শ্রমিকদের ভোটে নির্বাচিত হয়।'

'এর অর্থ হলো নেকড়ের গায়ে ভেড়ার পোশাক', বিড়বিড় করে যুবকটি বলল। ছেলের কথা শুনে উৎকণ্ঠায় মা চটজলদি তার মুখের ওপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে এনে বলল, 'ওদেরকে বলেছি, তুই কত পরিশ্রমের কাজ করিস। বাকিটুকু বলার আগেই অতিথিরা আসতে শুরু করে। মনে হয়, ওরা আমার কথাটা ঠিকমতো শুনতে পায়নি। পরে আমি আমার কাজে ফিরে যাই। যাহোক, আগামীকাল আমি এ বিষয়ে ওদের সঙ্গে আবার কথা বলব।'

মুহূর্তেই মা গলার স্বর খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওরা বলাবলি করছিল ওদের সঙ্গে যেসব শ্রমিকেরা যোগদান করতে অস্বীকৃতি

www.pathagar.com

জানিয়েছে, ওরা জনগণের শত্রু। রাষ্ট্রদ্রোহীতার জন্য ওদেরকে শাস্তি দেওয়া উচিত।'

যুবকটি চা শেষ করে খালি কাপ মেঝেতে মায়ের পাশে রেখে পা টান করে এবং চিন্তিত হয়ে কপাল চুলকায়।

'আমরা উৎসবে গিয়েছি কিনা, যাওয়ার সময় কমরেড আমার কাছে জানতে চাইলেন,' মা বলল। তার কণ্ঠস্বরে সতর্কতার সুর বেজে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্য থেমে সে আরো বলল, 'আমি আগের মতো শক্ত সামর্থ্য নই এবং ঝুপঝাপ কাজ করতে পারি না। তবুও তিনি এখনও আমাকে কাজে রেখেছেন। আসলে কমরেড খুবই দয়ালু। নিঃসন্দেহে তিনি অন্য কাউকে কাজ দিতে পারেন, এমনকি এই জীর্ণ কুটির থেকে অনায়াসে আমাদের বের করে দিতে পারেন।'

যুবকটির চোখেমুখে একধরনের উৎকণ্ঠার ভঙ্গি ফুটে ওঠে। একসময় মা ছেলেকে বোঝাতে চাইলেন। মায়ের গলার স্বরে অতীতের দীর্ঘশ্বাস, ফাঁকা বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বেহাগ বেজে ওঠে।

'দেখ, তোর বাবার মতো একগুয়েমী করিস না। তার জন্য আমরা ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছি, এমনকি আমাদের সমাজ থেকে আলাদা করা হয়েছে। লোক হিসেবে তোর বাবা খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে এবং লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে। একদিন তুই হয়তো একজন নামীদামী ডাক্তার হবি এবং অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করবি। আসলে তিনি ছিলেন স্বপ্নচারী। অথচ হঠাৎ গুম হয়ে গেলেন।'

বলতে বলতে পুনরায় মা বুকের ভেতর একধরনের অদৃশ্য চিনচিনে ব্যথা উপলব্ধি করে। তবুও সে জোর দিয়ে বলল, 'শোন বাছা, আজ রাতে তোকে বাইরে যেতেই হবে। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার জন্য যে ট্যাবলেট এনেছিস, ওগুলো খুব ভালো ঔষধ। প্রতিদিন আমি একটা করে খাই। এখন আর ব্যথা করে না। মনে আছে, আগে অই উৎসবে যেতে তুই খুব পছন্দ করতিস। এখনও সেই আগের মতোই আছে। তবে পতাকার রঙটা বদলে গেছে। জানিস, উৎসবে যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু এতটা পথ কিছুতেই হেঁটে যেতে পারব না। আমি বরং সেলাইয়ের বাকি কাজটুকু শেষ করি। একটু সবর কর, তোর জন্য খাবার তৈরি করে আনছি। মনে হয়, স্যুপটা এখনও গরম আছে।'

বলেই মা উঠে দাঁড়াল এবং ধীর পায়ে চুলার দিকে এগিয়ে গেল। যুবকটি

www.pathagar.com

তাকিয়ে দেখে তার মায়ের শিরদাঁড়াটা ধনুকের মতো বাঁকা এবং তার শরীর সামনের দিকে ঝুকে আছে। মন খারাপ করে সে ভাবল, একদিন এই কুঁজো শরীরটা পিঠ সোজা করে ঝটপট কতোই না কষ্টের কাজ করেছে। মায়ের জন্য বিষাদের একটুকরো কালো মেঘ উড়ে এসে তার মনটাকে ঢেকে দেয়। একসময় সে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়।

মা স্যুপটা পরখ করে দেখল। এখনও গরম আছে। তাকের উপর থেকে কয়েকটা থালা বাটি তুলে এনে নিচু টেবিলের উপর রাখল। তারপর মোমবাতির পাশে কাচের ফুলদানিতে একগুচ্ছ সুগন্ধি ফুল সাজায়। হঠাৎ মা টের পেল তার মুখ বরফশীতল এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা। চিনচিনে ব্যথাটা বুকের বামপাশ থেকে ক্রমশ বাম হাতে ছড়িয়ে পড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ভয়ে তার চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে বের করে ডান হাতে ছোট্ট লাল ক্যাপসুলটার খোসা ছাড়িয়ে জিহ্বার নিচে রাখল। মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় মা কাতরাতে থাকে। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল তার মাথাটা বোধহয় ফেটে যাবে।

ক্রমশ ব্যথাটা প্রশমিত হয়। কিন্তু শরীরে মা কোনো শক্তি পায় না। তবুও অবসন্ন শরীরে যুবকটির দিকে এগিয়ে আসে। তখন মোমবাতির মৃদু আলোয় তার ছায়া দেয়ালের গায়ে দীর্ঘ হয়। নিঃশব্দে মা ছেলের মুখের দিকে একবার দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে আনে। উত্তপ্ত গরমে যুবকটির মুখ বিবর্ণ এবং সারা মুখে ধূলোবালি লেগে আছে। কোনো শব্দ না করে মা কম্বলের পাশে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চিন্তার গহীন অরণ্যে হারিয়ে যায়।

'সব কিছুই কর্মীদের জন্য,' একদিন কমরেড ছেলেটা বলেছিল। মায়ের কেন জানি মনে হলো সে একজন বহিরাগত। তাই ভালো ভাবে কাজ না করার অনুশোচনায় সে ভেতরে ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। মা ভাবছে, 'বাদশার আমলে, এমনকি বিপ্লবের সময়ে, সে সারাক্ষণ নিবিষ্ট মনে কাজ করেছে। সে আরো ভাবল, না, ছেলেটার জীবন কোনোমতেই যেন তার মতো না হয়। ভালো কর্মী হতে গেলে ছেলের কি করতে হবে? যারা নিজেদের কমরেড বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে, ওরা কি ধরনের কাজ করে?'

তখনও মায়ের মগজের ভেতর ভাবনার অদৃশ্য পোকাগুলো কিলকিল করছিল। 'তার ছেলের এক বন্ধু সারা জীবন কাজ করেছে। ছেলেটি বড়ই ভালো এবং সজ্জন। ঠাট্টা-মশকরা করতে পারে। যখনই ছেলেটি বাড়িতে আসত, প্রতিবারই গল্প করে তকে রীতিমতো হাসাত। একদিন পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে যায়। সেদিন ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। তারপর থেকে কেউ

www.pathagar.com

আর ওর কোনো সন্ধান পায়নি। নিজেকে জাহির করার জন্য ছেলেটি বেশি কথা বলত।' একসময় মা এই ভেবে উপসংহারে উপস্থিত হল, 'না, তার ছেলে সে ধরনের নয়। ও বেশি কথা বলা পছন্দ করে না, এমনকি কোনো সভায়ও যায় না। বরং ও কমরেডদের মতো একজন ভালো কর্মী। আজ রাত ওর জন্য এক মোক্ষম সুযোগ। হয়তো কোনো ভালো মানুষের সঙ্গে ওর পরিচয় হবে। হয়তো ও কারোর নজরে পড়বে। তখন হয়তো ওর কোনো বিপদ হবে না। তাই আজ রাতে যাওয়ার জন্য ওকে উৎসাহ দেবে। বুড়ো মাকে খুশি করার জন্য তাকে আজ যেতে হবে। হ্যাঁ, সে কোনো ধরনের বিপদে পড়বে না।'

পেছনে জীর্ণ কুটির এবং দাঁড়িয়ে থাকা উৎকণ্ঠিত মাকে ছেড়ে গ্রীষ্মের নিস্তব্ধ রাতের আঁধার চিরে ভগ্ন রাস্তায় ছেলেটির দীর্ঘ ছায়া ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে। একসময় নির্মাণাধীন দালান, যেখানে দিনের পর দিন ছেলেটি মাথায় করে ইট বহন করেছে, এবং বাসস্থান, যেখানে তার অসহায় মা একলা, যার ভাগ্য সে পরিবর্তন করতে পারেনি, পেরিয়ে যেতে যেতে সে ভাবল, সে এখন ভীষণ একা। সেই মুহূর্তে তার মস্তিষ্কের ভেতর হাজার চিন্তার পোকাগুলো বনবন করে ঘুরতে থাকে।

পেছনে ক্যাচক্যাচ করে দরজা বন্ধ করার সময় মায়ের ঠোঁটের ফাঁকে শব্দহীন এক চিলতে হাসির ঢেউ খেলে যায়। মনে মনে সে ভাবল, যে করেই হোক সে তার সংসারে বাতি জ্বালিয়ে রাখবে। তখন একধরনের পুলক অনুভূতিতে তার মন ভরে যায়। সব সময় সে ছেলের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণেছে। ছেলের বয়স তখন নিতান্ত কম ছিল, যখন সে এলাকার এক বড়লোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত। সে সময় তার স্বামী নিখোঁজ হয় এবং বসতবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়। কাজের সময় ছেলে তার কাছেই থাকত। মনিব দয়া করে তাদের পেছনে কুঁড়েঘরে থাকার জায়গা দিয়েছিল এবং নিয়মিত দু'বেলা আহার দিত। প্রতিদিন ছোট্ট ছেলেটি মনিবের ছেলেমেয়েদের টিটকারী এবং ঠাট্টা শুনত। তার খুব অভিমান হতো, যখন সে তাকিয়ে দেখত মনিবের ছেলেমেয়েরা বইখাতা নিয়ে স্কুলে যেত এবং আসত। সে সময় ওদের হাসিখুশি মুখে আনন্দের পরাগ ছড়িয়ে থাকত। তখন সে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বপ্নের অলীক ভুবনে হারিয়ে যেত।

এভাবেই ছেলেটির শৈশবের সোনালি দিনগুলো ফুরিয়ে যায়। দৈহিক পরিশ্রম তাকে অনেক বেশি বলবান করেছে। শহরের মোটেল থেকে পেছনের দরজা দিয়ে উচ্ছিষ্ট খাবার আনত। কুঁড়েঘর টিকিয়ে রাখার জন্য মা এই বৃদ্ধ

www.pathagar.com

বয়সে শীর্ণ শরীর নিয়ে বড় বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে।

এখনও ছেলেটি তার বুকের ভেতর বাবার স্বপ্ন ধারণ করে আছে। তার কঁচি মন ছুঁটে বেড়ায় স্নেহ-মমতা আর সুবিচারের পেছনে। তার প্রজ্জ্বলিত চোখের মনিতে তাদের দুঃসহ জীবনের করুণ কাহিনীর ছবি ফুটে ওঠে।

শেষ সরু রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার পর যুবকটি আলোকিত শহরের বাতি দেখতে পেল। পাকা রাস্তায় সে আরো দ্রুত হাঁটতে পারে। এখন তার চোখে পড়ে খোলা মাঠের হাজার হাজার বাতি। পেছনে ফেলে আসা নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে সে শুনতে পায় উৎসবে আগত জনতার অফুরন্ত আনন্দ আর উল্লাসের কোলাহল।

নদীর ওপর পুল পেরিয়ে সে সবুজ মাঠের সরু পথ ধরে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ সে দেখতে পেল ভয়ে একটা ছোট ছেলে তার বাবা-মার হাত ধরে আছে। আশেপাশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পাকা তরমুজ আর ভাজা কাবাবের গন্ধ, এমনকি শিশুদের চ্যাঁচামেচি এবং বড়দের হাসি-ঠাট্টা ও গান-বাজনার আওয়াজ। আচমকা একটা পাথরের সঙ্গে সে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে এবং ছোট ছেলেটিকে সে আর দেখতে পায় না।

আতশবাজির রঙ-বেরঙের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চারপাশ। বেশ খানিকটা দূরের অসংখ্য তাঁবু দেখতে যেন কল্প-কাহিনীর ছোট ছোট রাজপ্রাসাদ। রক্ত-রঙিন লাল পতাকায় সয়লাব হয়ে গেছে পুরো এলাকা। তাঁবুর আশেপাশের রাস্তায় চকচকে নতুন গাড়ির ভিড়। এ সব গাড়ি করে দূরের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসেছে, কেউ বা আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে আলোকিত জায়গা ছেড়ে কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরব জায়গায় যায়।

একসময় যুবকটি সাবধানে সাধারণ মানুষের মাঝে ঢুকে পড়ে। একপাশে ছোট এক পরিবার ঘাসের ওপর পুরনো কম্বল বিছিয়ে বসেছে। হঠাৎ তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আটকে যায় একটা ছোট মেয়ের মুখের ওপর। মেয়েটি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখের চারপাশে লেগে আছে তরমুজের ভেজা দাগ। মেয়েটি একটুকরো তরমুজ মুখের কাছে ধরে আছে। একধরনের বিষণ্নতা ঢেকে দেয় তার মনের আকাশ। ব্যথিত মনে সে লোকজনের কোলাহল ছেড়ে ধীর পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

কাছাকাছি এক তাঁবুর ভেতর কেউ একজন একোর্ডিয়ান বাজিয়ে গান করছে। থমকে দাঁড়িয়ে যুবকটি গভীর মনোযোগ দিয়ে গানের কথা শোনে। গানের গীতিকার তার বাবার পরিচিত। মা যখন সুস্থ ছিল, তখন মাঝেমধ্যে

www.pathagar.com

এ গান গাইত। 'গীতিকারের কি হয়েছে?' আনমনে সে প্রশ্ন করে। জনতার ভিড়ের জন্য গায়ককে দেখতে না পেয়ে সে একটা গাছের নিচে গিয়ে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে ...

'যে করেই হোক জীবন একদিন শেষপ্রান্তে পৌঁছুবে
তখন দাসত্বের কোনো প্রয়োজন হবে না
দাসত্ব যদি জীবনের মাপকাঠি হয়
তবে সে জীবনের প্রয়োজন নেই।
তোমাকে হেয় করার জন্য তোমার ওপর যদি
আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো মণি-মুক্তা ঝরে
তবে আকাশকে বলে দাও, থামো,
বৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই।'

গান শেষে যুবকটি গাছের ছায়া ছেড়ে খোলা জায়গায় হাঁটতে থাকে। একসময় সে ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শোয়। ভেজা ঘাসে তার পাতলা সার্ট ভিজে উষ্ণ শরীরকে শীতল করে।

যুবকটি অনেক দূরের আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা লক্ষ কোটি ঝলমলে তারার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'পৃথিবীর অন্য প্রান্তের লোকজন এখন কি করছে?' আশ্চর্যান্বিত হয়ে সে আপন মনে প্রশ্ন করে।

যুবকটির আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্মৃতির ধূসর পর্দার অন্তরালে ঢেকে যায় উৎসবের সঙ্গীত, জনতার কোলাহল, আতশবাজি এবং চকচকে নতুন গাড়ির ভিড়। ভেজা ঘাসের ওপর শুয়ে সে মনে মনে এতক্ষণ যে সব স্বপ্ন এঁকেছিল, তা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। মায়ের কথা তার মনে পড়ে। কি হয়েছে মায়ের স্বপ্ন-আশার? মা কত কষ্ট করে তাকে বুঝাতে চেয়েছেন যে সে নিরাপদ থাকবে। ভাবতে ভাবতে তার চোখ ভিজে যায়। সে কয়েক বার চোখের পলক ফেলে এবং চোখের পাতা জোরে চেপে ধরে। খানিকটা সময় চোখ বন্ধ করে রাখে। তখন সে ঘাসের নিচে শক্ত মাটি অনুভব করে। চুপচাপ ভাবতে থাকে কতক্ষণ সে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? অন্ধকারে ঘূর্ণায়মান ঝরা পাতার মতো তার বিক্ষিপ্ত মন ঘুরতে থাকে।

হালকা পায়ের প্রায় ফিসফিসানির মতো শব্দ তুলে ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ন্ত স্কার্ট আর এলোমেলো কালো চুল এবং অলৌকিক বন্য ফুলের আকুল করা মিষ্টি মধুর সুঘ্রাণ যুবকটির একাকীত্বের জীবনকে বিদীর্ণ করে ছুঁইয়ে যায়। ঈথারে মহিলার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যাবার আগে তার কানে ভেসে আসে, 'হায়, আমি আমার পার্স হারিয়ে ফেলেছি।'

www.pathagar.com

যুবকটি চোখ মেলে কনুইয়ের ওপর ভর করে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরের উৎসের সন্ধানে ঘুরে তাকায়। রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে সাদা পরীর মতো কেউ একজন ক্রমশ তার দিকেই এগিয়ে আসছে। মহিলার ঢেউ খেলানো কালো চুল বাতাসে উড়ে তার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের ওপর থেকে সরে প্রায় খোলা কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে। খানিকটা বাঁকা হয়ে মহিলা তার সামনে বসে।

যুবকটির বুকের ভেতর ধুকপুকানির শব্দ আরো দ্রুত হয় এবং সে নিচের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। ঝলমলে ছোট পার্সটা বহাল তবিয়তে তার কনুইয়ের পাশে পড়ে আছে। মনে হয় ওটা যেন তাকে উপহাস করছে। যুবকটি হাত বাড়িয়ে পার্সটা তুলে মহিলার দিকে এগিয়ে ধরে। মহিলার নিঃশ্বাসের গরম বাতাস সে চোখেমুখে টের পায়। মহিলার উজ্জ্বল চোখের তারায় আনন্দের ঢেউ খেলে যায় এবং সরাসরি যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নরম হাতে সে যুবকটিকে স্পর্শ করে। যুবকটির সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায় এবং আনন্দে তার মন ভরে ওঠে। মহিলা প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'শুকরিয়া।' বলেই সে তার পথে চলে যায়।

দ্রুত গতিতে মহিলা অপেক্ষারত তার বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হয়। যুবকটিকে মহিলা কি বলেছে, সে কথা শোনার জন্য বান্ধবীরা তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। আচমকা তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবকটির দিকে আড়চোখে তাকায়। কোনো কথা না বলে তারা চটজলদি নিজেদের গন্তব্যের দিকে পা বাড়ায়।

একসময় মহিলাদের মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি যুবকটির ফাঁকা হৃদয়ের গোপন অলিন্দে হারিয়ে যায়। চারপাশের শব্দাবলি একাকীত্ব জীবনে বহন করা তার কাছে দুঃসহ বলে মনে হয়। উজ্জ্বল আলোয় তার চোখ ঝলসে যায়। মিটিমিটি তারকাখচিত দূরের আকাশের আবছা আলো তার গায়ের ওপর এসে পড়ে। কোথাও কোনো দূর উপত্যকা থেকে রাতের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে অগণিত মানুষের কোলাহল ভেসে আসে। তার গলা শুকিয়ে কারবালা। চোখে যেন আগুনের হল্কা। তার কাঁধ সামান্য ঝুকে আছে। পায়ের নিচের ঘাস গ্রীষ্মের গরম হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

রাতের ফাঁকা রাস্তায় যুবকটির জুতার আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সে অন্ধকার সরু ধূলিময় রাস্তা ধরে এগোতে থাকে।

কুঁড়ে ঘরের ভেতর থকথকে অন্ধকার। এক পলকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে যুবকটি তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। তার চিৎকারের তীব্র আওয়াজ চারপাশের গুমোট হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এবং একধরনের ভয় আর আতংক কালো ডানা

www.pathagar.com

মেলে তাকে তেড়ে আসে। মনের গভীরে অনিশ্চিত ভাবনা নিয়ে সে এগিয়ে যায়। দরজাটা সামান্য খোলা।

'মা?' যুবকটির কণ্ঠ বেয়ে বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দটি কেমন যেন ভাঙা এবং ফিসফিসানির মতো শোনাল। তার ঠোঁট শুকিয়ে আমসি এবং তেতো। তবুও সে পুনরায় ডাকে, 'মা, মা।' সঙ্গে সঙ্গে সে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে ভেড়ানো দরজার পাল্লা খোলে। একটা কিছুর ওপর তার দৃষ্টি আটকে যায়। সে ভেতরে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসে এবং ভয়ার্ত হাত বাড়িয়ে ধনুকের মতো বাঁকা পিঠে হাত রাখে। তারপর খুব দ্রুত সে তার অতি প্রিয় এবং আদরের মায়ের হিমশীতল শুকনো জিরজিরে কাঁধ এবং চুল স্পর্শ করে।

যুবকটি মাকে ডাকতে থাকে। প্রথমে অনুনয় বিনয়ের নরম সুরে এবং পরে রীতিমতো চিৎকার করে। সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আর্তচিৎকার করে ডাকে, 'মা, মা, মা ...।'

বাইরে একটা নেড়ি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে অন্ধকারের দিকে চলে গেল।

[**গল্পসূত্র** : 'মা' গল্পটি দনিয়া গোবারের ইংরেজিতে 'আয়া' গল্পের অনুবাদ। আফগানিস্তানের এক বিশেষ জনগোষ্ঠী মাকে 'আয়া' সম্বোধন করে। ইংরেজিতে গল্পটি ২০০১ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গল্পটি জোহরা সায়িদ এবং সাহার মুরাদির সম্পাদনায় 'ওয়ান স্টোরি, থার্টি স্টোরিজ : অ্যান এনথ্রোলজি অব কন্টেম্পোরারি আফগান আমেরিকান লিটারেচার' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।]

লেখক পরিচিতি : দনিয়া গোবারের জন্ম কাবুলে। তার বাবা, মীর গোলাম মোহাম্মদ গোবার, আফগানিস্তানের একজন স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী এবং লেখক। ব্যক্তিগত জীবনে দনিয়া গোবার একজন ডাক্তার। কিন্তু কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী এবং তুখোড় বক্তা হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী ডিগ্রি লাভের পর তিনি ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক হেলথে মাস্টার ও জার্মানীর ওয়েস্ট বার্লিন থেকে জেনারেল মেডিসিনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তার লেখা অসংখ্য গল্প এবং কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার জন্য তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল পয়েট অব মেরিট ২০০০-২০০১' পুরস্কার এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব পয়েটস্ থেকে 'বেস্ট পয়েট অব দ্য ২০০০' স্বীকৃতি লাভ করেন।

www.pathagar.com

আকরাম ওসমান

মানুষ কথা রাখে

যেন আলতো করে কুয়াশার বরফকুচি ঝরে পড়ছে। জানালা গলিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে শের একেক করে কুয়াশার মিহি কণা গুণছে— এক, দুই, তিন ... এক, দুই, তিন, চার ... এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। তুলা ধোনার লোকেরা উঁচু থেকে এমনভাবে তুলা ধুনছে যে বাতাসে পেঁজো তুলা উড়ে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরনো খড় আর মাটির ঘরের ছাদ এবং বারান্দায় স্তূপাকারে জমা হচ্ছে। হঠাৎ দেখে মনে হয় চারপাশ যেন সাদা বরফের কম্বলে ঢেকে গেছে। শের কয়েক সেকেন্ড দম বন্ধ করে থাকে। তখন সে তাকের উপর রঙিন সুতার রীলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাকের খানিকটা উপরে অনেকগুলো পেরেক লাগানো। সেখানে সে বিভিন্ন সাইজের ঘুড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে। অনেক বছর ধরে সে ঘুড়ি বানায় এবং ঘুড়ির সুতা মাঞ্জা দেয়। পুরনো কাবুলের শোর বাজার থেকে শুরু করে পায়েন চক পর্যন্ত সবার কাছে সে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চ্যাম্পিয়ান ঘুড়িওয়ালা হিসেবে সুপরিচিত।

এতদিন শের সনাতন নকশা অনুসারে ঘুড়ি বানাত। কখনও ঘুড়ির মাঝখানে চোখ এঁকেছে, আবার কখনও পাখির মাথা কিংবা ফুল এঁকেছে। কিন্তু যখন তার বয়স চৌদ্দ বছর এবং সবেমাত্র ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফ উঠতে শুরু করেছে, তখন থেকে পুরনো নকশার প্রতি তার একধরনের বিতৃষ্ণা জন্মায়। ফলে সে আরো বেশি আকর্ষণীয় এবং নতুন নকশার ঘুড়ি বানাতে শুরু করে। এ জন্য সে গাঢ় রঙের ভালো এবং দামী কাগজে বিভিন্ন ধরনের ঘুড়ির নকশা তৈরি করে। কিন্তু কোনোটাই তার মনের মতো হয় না। চোখ ধাঁধানো ঘুড়ি বানানোর জন্য সে মরিয়া হয়ে ওঠে। সেই কাল্পনিক ঘুড়ির বর্ণনা কিছুতেই শের ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। একের পর এক ঘুড়ি বানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনোটাই তার কল্পনার সঙ্গে মেলে না। প্রচণ্ড বিরক্ত এবং নিরুৎসাহিত হয়ে সে সেলফের উপর সাজিয়ে রাখা ঘুড়ির দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে জানে না, আসলে তার চোখ কি খুঁজছে।

www.pathagar.com

তাহিরা তার খালাতো বোন। গুটিশুটি হয়ে কম্বলের নিচে শুয়ে সে দেখছে শের গভীর চিন্তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং সে তার নিজের আপন জগতে মহা ব্যস্ত। প্রায় চিৎকারের মতো করে তাহিরা ডাকে, 'শের, তোমার কি হয়েছে? তুমি কি সিরকা, নাকি অন্য কিছু খেয়েছ?'

তাহিরার বাঁকা কথায় শেরের ভাবনার শান্ত দীঘিতে টুপ করে ঢিল পড়ে। সেলফ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে সে সরাসরি তাহিরার কালো চোখের দিকে তাকায়। তাহিরার চোখ দু'টি হরিণীর চোখের মতো সুন্দর, মায়াবী এবং নিষ্পাপ ধরনের। ভুরু জোড়া অত্যন্ত তীক্ষ্ম। অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকানোর সময় আচমকা দু'জনের মনের ভেতর তড়িৎ গতিতে অলৌকিক একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের অদৃশ্য ঢেউ খেলে যায়। তাহিরার হৃদয়ের গভীর গোপন থেকে একটা তীর ছুটে এসে যেন শেরের বুক বিদীর্ণ করে দিয়েছে। মুহূর্তেই শেরের হাত হিম হয়ে আসে এবং তার বুকের ভেতর ধুকপুকানির শব্দ আরো দ্রুত হয়।

একটা কথাও না বলে তাহিরা সরাসরি শেরের মুখের দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হাসল। হাসির সময় তার মুক্তোর মতো শুভ্র দাঁত শেরের দৃষ্টি এড়াল না। সম্মোহিতের মতো সে তাহিরার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হলো তাহিরার দাঁতগুলো যেন কোনো শীতের সকালের উজ্জ্বল এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ তুষার কণা। দৃষ্টি ঘুরিয়ে শের জানালা গলিয়ে বাইরের বরফকুচি দেখতে থাকে। তাহিরার গাল দু'টো বরফের চেয়ে আরো বেশি সাদা। অন্যরকম এক অনুভূতিতে শেরের মন কানায় কানায় ভরে যায়। তাহিরার মতো অপূর্ব সুন্দরী খালাতো বোন পেয়ে আসলেই সে অত্যন্ত ভাগ্যবান। একসময় শের পিঠ সোজা করে বসে। তখন তাহিরা কম্বলের ভেতর থেকে হাত বের করে পাশের ট্রে থেকে কয়েকটা কাজুবাদাম আর শুকনো আঙুর তুলে নেয়। তাহিরার দীর্ঘ আঙুলের উপর শেরের দৃষ্টি আটকে যায়। তাহিরার আঙুলে নীলা পাথরের আংটি। পুনরায় শের জানালা গলিয়ে বাইরের নীল আকাশের দিকে তাকায়। তাহিরার আংটির নীলের সঙ্গে আকাশের নীল কোনোমতেই তুলনা করা যায় না। তাহিরার আঙুল দেখে শেরের মনে পড়ে পাহাড়ী কোন ফুল গাছের ডাটির কথা। আনমনে সে দূরের পাহাড়ের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। সাদা বরফে ঢেকে আছে পাহাড়ের চূড়া। আপন মনে শের বলল, পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো একজন মানুষের জন্য খুবই গৌরবের।

ক্রমশ শের ভাবনার আরো অতলে ডুবে যেতে থাকে। বোবা দৃষ্টিতে সে

www.pathagar.com

তাহিরার মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে। বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে তাহিরা বলল, 'তুমি কি স্বপ্ন দেখছ, নাকি অন্য কিছু? আমি কি জিজ্ঞেস করেছি, তুমি ভুলে গেলে?'

জবাবে শের বলল, 'আমার একটাই মাথা এবং সে মাথায় হাজার চিন্তার পোকারা সারাক্ষণ কিলবিল করে। দুঃখিত, তোমার প্রশ্ন আমি মনোযোগ দিয়ে শুনিনি।'

তাহিরা বলল, 'ঠিক আছে। আসলে এখন তো তোমার রঙিন স্বপ্ন দেখার সময়।'

মনে মনে শের ভাবল, 'স্বপ্ন দেখার সময় কেন? তাহলে কি তাহিরা এমন কিছুর ইঙ্গিত করল, যা আগামীতে ঘটবে। কী এমন ঘটতে পারে?' ভাবতে ভাবতে একসময় সে শব্দ করে হেসে বলল, 'তোমার নতুন কাজের জন্য অভিনন্দন। তুমি কি গণক হতে চাও, নাকি অন্য কিছু?'

তাহিরা চোখেমুখে দুষ্টুমির হালকা চিহ্ন এঁকে বলল, 'শোন শের, আমি তোমার ভবিষ্যত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দিনদিন তুমি আরো বেশি স্বপ্নচারী হবে, এমনকি নির্ঘুম রাত কাটাবে। তখন খাওয়া-দাওয়ার প্রতি তোমার কোনো রুচি থাকবে না। ফলে তোমার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে।'

তাহিরার ভবিষ্যতবাণী শুনে শের শব্দ করে হেসে উঠল। একসময় হাসি থেমে গেলে সে বলল, 'ভালো কথা বলো। তোমার কি অন্য কিছু বলার নেই?'

তাহিরা চুপ করে থাকে। কিন্তু পুনরায় তার মোহনীয় দৃষ্টি এক পলকের জন্য আটকে যায় শেরের মুখের উপর। প্রচণ্ড অভিমানে শের বেমালুম ভুলে যায় আসলে সে কি বলতে চেয়েছিল।

তবুও চোখেমুখে কপট হাসির রেণু ছড়িয়ে শের বলল, 'আমি জানি না এ মুহূর্তে আমার কি বলা উচিত। মনে হয়, তুমি ঠিকই বলেছ।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাহিরা প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'দেখেছ, কথাটা তুমি তোমার নিজের মুখেই স্বীকার করলে।'

শের কোনো কথা বলল না। বরং তাহিরার কথায় সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে সে হালকাভাবে বারদু'য়েক মাথা দুলিয়ে মুখ নিচু করে। কিছুক্ষণ তির্যক দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকানোর পর যখন সে মাথা তোলে, তখন পুনরায় দেয়ালের গায়ে ঝুলে থাকা প্রাণহীন ঘুড়িগুলোর দিকে তার নজর পড়ে। সে ভাবে, যদি এই ঘুড়িগুলোর সৌন্দর্য সম্পর্কে তাহিরা কিছু বলে। কিন্তু তাহিরাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে সে শরমিন্দা বোধ করে এবং নিজের

www.pathagar.com

জিহ্বা সংযত করে।

তাহিরা জিজ্ঞেস করে, 'কি ভাবছ?'

আলতো করে শের বলল, 'তোমাকে।'

আশ্চার্যান্বিত হয়ে তাহিরা জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে?'

এবার জোর দিয়ে শের বলল, 'হ্যাঁ, তাই।'

কথাটা বলেই শের এক মুহূর্তের জন্য থেমে পুনরায় বলল, 'তোমার মতো যদি ঘুড়িগুলোর এত সুন্দর মায়াবী চোখ থাকত, তাহলে খুব ভালো হতো, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে তাহিরা জিজ্ঞেস করে, 'কিসের জন্য?'

শের বলল, 'তাহলে আমি বাড়ির ছাদের উপরে খোলা আকাশে ঘুড়িগুলো উড়াতাম। চারদিক থেকে মানুষেরা আমার ঘুড়ির চোখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত।'

পুনরায় তাহিরা জিজ্ঞেস করে, 'তখন কত দামে তুমি তোমার ঘুড়ি বিক্রি করবে।'

জবাবে শের বলল, 'হাজার হাজার আফগানী।'

তাহিরা বলল, 'এত অল্প দামে!'

সঙ্গে সঙ্গে শের বলল, 'তাহলে এক লক্ষ আফগানী।'

দুষ্টুমি করে তাহিরা বলল, 'মনে করো, একদিন তুমি সত্যি অনেক বড়লোক হয়েছ। তোমার কাছে অঢেল আফগানি। তখন এত আফগানি দিয়ে তুমি কি করবে?'

শের বলল, 'তখন আরো বেশি ঘুড়ি বানানোর জন্য অনেক অনেক সুন্দর কাগজ এবং বাঁশের কঞ্চি কিনব।'

বিস্ফারিত চোখে তাহিরা বলল, 'আশ্চর্য!'

শের বলল, 'কিসের আশ্চর্য? প্রত্যেকটা ঘুড়িতে তোমার মায়াবী চোখ আঁকব। তারপর ঘুড়িগুলো যখন আকাশে উড়াব, তখন সবাই হা করে তাকিয়ে দেখবে তোমার চোখ কত সুন্দর।'

এবার তাহিরা শব্দ করে হেসে উঠে। একটু বাদে হাসি থামিয়ে বলল, 'তারপর তুমি কি করবে?'

জবাবে শের বলল, 'তারপর একই জিনিস করব। যতদিন বাঁচব, ততদিন আমি আরো অনেক ঘুড়ি বানাব।'

শেরের ঘরের দেয়ালে অসংখ্য ঘুড়ি ঝুলছে। পরদিন সে ওখান থেকে কয়েকটা ঘুড়ি নামিয়ে পাশের বাসার ছেলেটাকে দেয়।

www.pathagar.com

সেদিন থেকে অনেক রাত পর্যন্ত শের ঘুড়ির কাগজ কাটে। কাগজের গায়ে তাহিরার মুখের আলপনা আঁকার চেষ্টা করে। সেসব আলপনায় ফুটে উঠবে তাহিরার চোখের দীপ্ত চাহনি, টিয়া পাখির মতো টকটকে লাল ঠোঁট, এমনকি তার আবেগের পরশমাখা ভালোবাসা, যে ভালোবাসা অনায়াসে একজন পুরুষের হৃদয় হরণ করতে পারে এবং প্রতিটি অঙ্গে কামনার অগ্নি জ্বালাতে পারে।

ক্রমশ ঘরের ভেতর ছেঁড়া কাগজের স্তূপ জমা হতে থাকে। শের এক একটা কাগজের সঙ্গে অন্য কাগজ আঠা দিয়ে জোড়া দেয়। ঘুড়িতে সে নানা ধরনের মুখের ছবি আঁকে, কিন্তু কোনোটাই তাহিরার মুখের মতো হয় না। তাই সে পুরো একমাস কোনো ঘুড়ি ওড়ায়নি এবং কাউকেই প্রতিদ্বনিন্দ্বতায় আহ্বান জানায়নি।

একদিন শের যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বি ফজলু জিজ্ঞেস করে, 'শের, ইদানিং তোমার কি হয়েছে? তুমি কি ঘুড়ি ওড়ানো ছেড়ে দিয়েছ? আশেপাশের কারোর সঙ্গে তোমার কোনো দেখা নেই।'

জবাবে শের বলল, 'ফজলু, আমি অন্য কিছু বানাচ্ছি। এমন কিছু বানাচ্ছি, যা তুমি কখনও কল্পনা করনি, এমনকি স্বপ্নেও দেখনি।'

উপহাসের ভঙ্গিতে ফজলু জিজ্ঞেস করে, 'কি বানাচ্ছ? বেলুন, নাকি উড়োজাহাজ?'

শের বলল, 'তারচেয়েও অনেক ভালো কিছু। আমি ঘুড়িতে একজন নববধূর সুন্দর মুখ আঁকছি।'

ফজলু বলল, 'অভিনন্দন। আশাকরি শীঘ্রই আমরা মিষ্টি আর নকুলের ভাগ পাব।'

ফজলুর কথার পিঠে শের কোনো কথা না বলে পুনরায় সে তার কাজে ফিরে যায়। ফজলুর যদিও কাঁচের টুকরো দিয়ে ঘুড়ির সুতা মাঞ্জা দেওয়ার সুখ্যাতি রয়েছে, কিন্তু কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। বরং সবাই তাকে হারুপার্টি হিসেবে চেনে। কেননা সে সব সময় ঘুড়ি খেলায় অন্যদের কাছে হেরে যায়। এছাড়া সে মিথ্যাবাদী এবং বাচাল।

তাহিরার মুখেই শের শুনেছে যে ফজলু তার পেছনে লেগেছে। যখনই শের ফজলুকে দেখে, তখনই প্রচণ্ড রাগে তার শরীরের রক্ত টগবগ করতে থাকে। তখন তার ইচ্ছে হয় নিজের হাতে সে ফজলুর গায়ের চামড়া তুলে ফেলে।

ফজলুও শেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। কেননা সে জানে, শের থাকলে

www.pathagar.com

কোনোদিনই সে তাহিরাকে পাবে না। তাহিরাকে নিয়ে তাই সে নানা ধরনের ফন্দি-ফিকির আঁটতে শুরু করে। একদিন সে তাহিরার বড় ভাই কুস্তিগীর পালোয়ান মাহমুদকে বলল যে শের এবং তাহিরা একে অপরকে ভালোবাসে। ফজলু এক কদম বাড়িয়ে আরো বলল যে ওদের সম্পর্কের কথা প্রতিবেশি সবাই জানে। সেই থেকে মাহমুদ শুধু শেরকে তাদের ঘরে ঢুকতে বারণ করেনি, বরং উভয় পরিবারের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে।

তারপর থেকে বুকের ভেতর একরাশ কষ্ট নিয়ে শের একাকী জীবনযাপন শুরু করে। তাহিরার সঙ্গে তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তাহিরা গৃহবন্দি। তাদের সংসারে তার মা, বদমেজাজী বাবা এবং তিন কুস্তিগীর পালোয়ান ভাই আছে।

শের নিজের কৃতকর্মের জন্য তাহিরাকে কথাটা বলতে পারেনি। একদিন তাহিরার বাবা মহসিন খান স্ত্রীর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডার সময় চিৎকার করে ঘোষণা করে, 'আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ুক, তবুও অই ঘুড়িওয়ালা এবং কবুতর পালকের সঙ্গে কিছুতেই আমার মেয়েকে তুলে দেব না। তোমার ভবঘুরে ভাগ্নে ছাড়া কি পৃথিবীতে আর কোনো ছেলে নেই, যার সঙ্গে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারি?'

মহসিন খানের ঘোষণা শোনার পর শের কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না তার কি করা উচিত। কেননা তার সামনে সৌভাগ্যের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনকি স্বপ্নেও এখন সে আর তাহিরাকে দেখতে পায় না। দিনের পর দিন তার চেহারায় মলিনতার ছায়া গাঢ় হয়ে ওঠে। খাবারের প্রতি কোনো উৎসাহ নেই। সারারাত জেগে সে বিশাল আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা অগুণিত তারা গোণে। ক্রমশ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার গায়ে প্রচণ্ড উত্তাপ। অদ্ভুত একধরনের জ্বরে তার শরীর পুড়ে যাচ্ছে, যেন কোনো চুলার জ্বলন্ত আগুনে মাছ ভাজা হচ্ছে।

সকালে শের যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন তার মাথার চুল থাকে আলুথালু এবং চোখ দু'টো ভীষণ লাল, উদাস। ফজলুর মুখোমুখি হতে সে মোটেও আগ্রহ বোধ করে না। কেননা রাস্তায় দেখা হলেই ফজলু টিপ্পনি কেটে বলে, 'শের, কোথায় তোমার উড়োজাহাজ? বেলুনের খবর কি? কখন আমরা তোমার বিয়ের মিষ্টি আর নকুল খাব?'

ফজলুর খোঁচার পরও শের কিন্তু তার কাজ থামায়নি। ঘুড়ির সবগুলো নকশার ভেতর সে তাহিরার অনিন্দ-সুন্দর মুখ খোঁজে। বুকের ভেতর আশার টিমটিমে প্রদীপ জ্বালিয়ে সে ঘুড়ি বানাতে থাকে, কিন্তু কোনো ঘুড়ির মধ্যে সে

www.pathagar.com

তাহিরার মুখের আদল খুঁজে পায় না।

ইতোমধ্যে কয়েক মাস কেটে গেছে। রোজাও শেষ হয়ে গেছে। তারপর কোরবানীর ঈদও এসে চলে গেছে। এ সময়ে শেরের কাছ থেকে কেউ কোনো খবর তাহিরার কাছে পৌঁছায়নি, এমনকি তাহিরার কাছ থেকে কোনো সংবাদ শেরের কাছে আসেনি। শের অনেক চেষ্টা করেও তাহিরাদের বাসায় যাওয়ার কোনো অজুহাত খুঁজে পায়নি। সুতরাং সে তার ঘুড়ি বানানোর কাজে আরো বেশি মনোনিবেশ করে। ঈদের আগের দিন সন্ধ্যেয় সে তার মনোহর ঘুড়ির গায়ে উজ্জ্বল হরফে সুন্দর করে লেখে 'হ্যাপি ঈদ'।

রাতের বেলা শের বিছানায় যাওয়ার সময় বাইরে তেমন কোনো বাতাস ছিল না। তবে মৃদুমন্দ বাতাসে শুকনো মৃত গাছের ডালে একধরনের বিষাদমাখা মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ঘরের ভেতর থেকে শের স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। একসময় সেই শব্দ থেমে যায়।

শৈশবের দিনগুলোর কথা শেরের মনে পড়ে। তখন হালকা বাতাস এসে তাদের বাড়ির ছাদের উপর উদাস ভঙ্গিতে চক্রাকারে ঘুরত। আরো জোরে বাতাসের জন্য অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সে সুর করে গাইত, 'বাতাস, তুমি শো শো করে প্রচণ্ড জোরে বও'।

অস্থির মনে সারারাত শের ফেলে আসা শৈশবের গান গেয়েছে। কোথাও বাতাসের কোনো দোলা নেই। অনেকে যেমন জ্বর হলে কম্পমান শরীরে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকে, তেমনই শেরও কম্বলের নিচে পা গুটিয়ে শোয়। তখন সে শুধু তাহিরার কথা ভাবতে থাকে। তার ভাবনার আকাশে রঙিন স্বপ্নের মতো তাহিরার মুখ ওড়াওড়ি করে। মনে হয় প্রচণ্ড বাতাসে তাহিরার মুখ একদিক থেকে অন্যদিকে দোল খাচ্ছে। ভয়ংকর দৃশ্য দেখে একসময় সে ভয়ে চিৎকার করে বিছানায় উঠে বসে। ঘরের চারপাশে নিকষ অন্ধকার। কোথাও কোনো টুঁ শব্দ নেই। এটা নিছক স্বপ্ন ভেবে সে শয়তানকে গালমন্দ করে এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে। সে টের পায় তার হাত বরফের মতো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তবে শরীরে কোনো জ্বরের চিহ্ন নেই। তাই সে হাত-পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গে। বালিশে মুখ গুজে শোয়। তখন সে ক্রমশ ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে থাকে। সে আর্তচিৎকারের মতো করে বলে, তাহিরা, তাহিরা, আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি। তাহিরা, আমার ভাগ্য গনণাকারী। তাহিরা, তুমি তো এখন আনন্দেই আছ। তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ, ধবধবে দাঁত, অপূর্ব সুন্দর ঠোঁট, মসৃণ ফর্সা হাত, যা কি-না ফুলের ডাটির চেয়েও নরম, হাঁসের বুকের পালকের চেয়েও শুভ্র।

www.pathagar.com

ভোরের অন্ধকার ফুঁড়ে সূর্য উঠার আগে শের লক্ষ্য করে তার সুন্দর বড় ঘুড়িটা ঘরের দেয়ালে ঝুলছে। প্রায় চিৎকারের মতো সে বলল, 'বাতাস, তুমি শো শো করে প্রচণ্ড জোরে বও'।

এক মুহূর্ত বাদেই বাতাসের বেগ বেড়ে গিয়ে দরোজায় আঘাত হানে। বাইরে বাতাসের তোড়ে গাছের পাতারা যেন ঝিরঝির শব্দ তুলে সঙ্গীত পরিবেশন করছে। চটজলদি শের বিছানা ছেড়ে ওঠে। যদিও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তবুও সে জানালার পাল্লা খোলে এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাইরের সতেজ কোমল বাতাস টেনে নেয় বুকের ভেতর।

রাতটা ছিল ঈদের রাত। অন্য সব দিনের চেয়ে সেদিন ভোর না হতেই বেকারীর লোকজন আগেভাগে কাজ শুরু করে দিয়েছে। পোড়া কাঠের গন্ধে আশেপাশের হাওয়া ভারী হয়ে গেছে। শেরের কণ্ঠনালী বেয়ে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস। কি ভেবে যেন সে দেয়াল থেকে হ্যাঁচকা টানে ঘুড়িটা তুলে আনে। তারপর বাইরে এসে আলতো করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। অনেকটুকু সুতা ছেড়ে সে কয়েকবার টেনে আপন মনেই বলল, 'আজ ঈদ। সকালে তাহিরা নতুন পোশাক পরবে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সে আনন্দফূর্তি করবে। বাবা-মা তাকে বিভিন্ন ধরনের উপহার দেবে। এই ঘুড়ি, তুমি আজ কি করবে? তুমি কি আজ শুধু আকাশেই উড়ে বেড়াবে? তুমি কি তাহিরার সঙ্গে দেখা করবে, নাকি করবে না? ওর সঙ্গে যদি তুমি দেখা করো, তাহলে ভালো। আর যদি দেখা না করো, তবে আমি তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। তারপর আগুনে পুড়িয়ে ছাই করব।' একসময় উত্তেজনা প্রশমিত হলে শের শান্ত হয়। শেষ প্রহরের আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা ক্লান্ত নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে সে শব্দহীন হাসে। বিনিময়ে নক্ষত্রেরাও যেন তার দিকে হাসির পরাগ ছড়িয়ে দেয়।

ইতোমধ্যে জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে মুয়াজ্জিনের আযানের সুর ভেসে আসে, আল্লাহু আকবর। স্বগোক্তির মতো করে শের বলল, 'হে আল্লাহ, আপনি মহান। নবী করীম (সা.), তাঁর বিশ্বস্ত চার খলিফা (রা.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.), তাবে-তাবেঈন এবং সকল ওলি আউলিয়ার উছিলায় আপনি আমার দোয়া কবুল করুন, যেন আরো অনেক জোরে বাতাস বয়।'

এই ভেবে শের স্বস্তি অনুভব করে যে সে আন্তরিকতার সঙ্গে দোয়া করেছে। পুনরায় সে বিছানায় ফিরে যায় এবং একসময় গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্নে অনেক দূরের এক অচেনা দেশে গিয়ে পৌঁছে।

www.pathagar.com

সকালে যখন তার ঘুম ভাঙে, তখন বাতাসও আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে। শেরের মনে হয় বাতাস যেন কাপড় শুকানোর দড়িতে ঝুলন্ত কাপড়ের সঙ্গে খেলা করছে। কাপড়ের ওড়াওড়ি দেখে শের বাতাসের দিক-নির্দেশনা ঠিক করে। সে সময় তার মনের মধ্যে একধরনের উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায়। চটজলদি সে পোষাক পরে এবং মা-বাবাকে সালাম করে ঈদ মোবারক জানায়। তারপর ঘুড়ি এবং লাটাই নিয়ে বাড়ির ছাদে ওঠে। সুতা ছেড়ে সে আকাশে ঘুড়ি ওড়ায়। প্রচণ্ড বাতাসে ঘুড়ি এদিক-ওদিক গোত্তা খায়। শক্ত হাতে শের লাটাই ধরে রাখে।

বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ত্বড়িত গতিতে ঘুড়ি এমনভাবে উপরে উঠছে যেন দেখে মনে হয় ঘুড়িটা লড়াইয়ের কোনো উদ্যত মোরগ। শের ছাড়া আশপাশের ছাদের ওপরে উঠে আরো অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। প্রপেলারের মতো শেরের বড় ঘুড়ি অন্যান্য ঘুড়ির সীমানা পেরিয়ে আরো উপরে উঠে যাওয়ার সময় কয়েকটা ঘুড়ির সুতা কেটে ফেলে। তখন অনেকেই নিজেদের ঘুড়ির সুতা গুটিয়ে নেয়। একসময় বিশাল আকাশের বুকে শেরের ঘুড়ি ছাড়া অন্য কোনো ঘুড়ি দেখা যায় না। সে মনের আনন্দে ঘুড়ি ওড়াতে থাকে। মাঝেমাঝে ঘুড়িটা এমনভাবে গোত্তা খায় যেন কোনো কবুতর ডিগবাজী খাচ্ছে। দূর থেকে ঘুড়ির গায়ের লেখা 'হ্যাপি ঈদ' স্পষ্ট দেখতে পেয়ে শেরের মনের মধ্যে পূর্ববর্তী পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে যায়। যখন তার ফুরফুরে মন উড়ে যায় দূরের বন্ধুর কাছে, তখন সে আরো বেশি সুতা ছাড়ে। একসময় প্রিয়তমার বাড়ির ছাদের উপর ঘুড়ি উড়তে থাকে।

ফজলু নিজেদের ছাদের উপর থেকে শেরের ঘুড়ি ওড়ান দেখছিল এবং মূহূর্তেই সে বুঝতে পারে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। শেরকে আশ্চর্যান্বিত করে সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ঘুড়ি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে।

যদিও ফজলু আসন্ন বিপদের গন্ধ উপলব্ধি করে, কিন্তু কিছুতেই সে তার মনোযোগ হারাতে চায় না। ঘুড়ি বেশি উপরে উঠার আগেই শেরের ঘুড়ি ঈগল পাখির মতো পলকে উড়ে এসে তার ঘুড়ির সুতা কেটে ফেলে। স্বগতোক্তির মতো করে শের বলল, 'যার যা প্রাপ্য, তাই সে পায়।'

তাহিরা তার নিজের জগতে মশগুল। চুল বেঁধে সাজসজ্জার পর সে নতুন সিল্কের জামা পরে। বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খদ্দেরের মতো সে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে। নিজের কাছে নিজেকে তার অপূর্ব সুন্দরী বলে মনে হয়। সে ভাবে, নিশ্চয়ই অন্যরা তার এই ফুলের মতো অপূর্ব সুন্দর মুখ দেখে মুগ্ধ হবে। আয়নার ভেতরে প্রতিচ্ছবি আলতো হেসে তার ভাবনার

www.pathagar.com

সঙ্গে সুর মেলায়।

জানালার কাছে যাওয়ার সময় আনন্দ-উল্লাসে তাহিরা এক পাঁক ঘোরে। সে সময় কাচের মতো স্বচ্ছ আকাশ এক ঝলক হাসি ছড়ায় তার দিকে, এমনকি উজ্জ্বল সোনালি সূর্যটাও যেন তার মুখের উপর স্বর্ণের রেণু মেখে দেয়। তাহিরা যখন চুলের বিনুনি নিয়ে আনমনে খেলা করছিল, তখন তার দৃষ্টি কেড়ে নেয় উড়ন্ত একটা সাদা হাঁস। একটু বাদে হাঁসটা উড়ে চলে যাওয়ার পর সে দেখতে পেল 'হ্যাপি ঈদ' লেখা ঘুড়িটা আকাশে উড়ছে। সে সতর্কতার সঙ্গে লেখাটা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে ওঠে শব্দহীন এক টুকরো কোমল হাসি। ঘুড়িটা তার দারুণ পছন্দ হয়েছে। ইচ্ছে করে হোক, অথবা অনিচ্ছায় হোক, অস্ফুট গলায় সে বলল, 'তোমাকেও ঈদ মোবারক।'

যাহোক, ঘুড়িটা খোলা হাওয়ায় এদিক-ওদিক, এমনকি উপরে-নিচে উড়ে বেড়াচ্ছে। কখনও ঘুড়ির ছায়া এসে ছাদে পড়ছে, আবার কখনও অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। কৌতূহলী তাহিরা এক দৌড়ে তাদের ঘরের ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। দূর থেকে সে দেখে শের তাদের ঘরের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। তাহিরা তার বুকের ভেতর ধুকপুকানীর শব্দ শুনতে পায়। তাহিরাকে দেখতে পেয়ে শেরেরও সারা শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। মুহূর্তেই শের মনোযোগ হারিয়ে ফেলে এবং ঘুড়িটা গোত্তা খেয়ে তাহিরাদের উঠোনে পড়ে। কপাল মন্দ হলে যা হয়, তাই হয়েছে। তাহিরার ছোট ভাই ফরিদ ঘুড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখানোর জন্য তার বাবার কাছে যায়। ফরিদের বাবা তখন কোরবানীর ভেড়া জবেহ্ করার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। খুশিতে চিৎকার করে ফরিদ বলল, 'বাবা, বাবা, আমি একটা ঘুড়ি পেয়েছি।'

জবেহ্ করার সময় কিছুতেই মির্জা মোহাম্মদ মোহসিন খান কোনো বাধা সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি ভেড়ার গলায় ছুরি চালালেন। জবেহ্ করার পর তিনি রাগান্বিত স্বরে বললেন, 'হতচ্ছাড়া ছেলে। তুই কি পেয়েছিস?'

ভয়ে ফরিদ থমকে দাঁড়ায় এবং অপরাধীর মতো চোখ তুলে বাবার মুখের দিকে তাকায়। অস্ফুট স্বরে সে বলল, 'আমি একটা ঘুড়ি পেয়েছি।'

মোহসিন খান বললেন, 'বুদ্ধ কাঁহাকার, এদিকে আয়।'

ফরিদ রীতিমতো হতচকিত এবং ভীত। তবুও সে কাছে গিয়ে বাবার রক্তাক্ত হাতে ঘুড়িটা তুলে দেয়।

তাহিরা ছাদে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখছিল। ঘুড়িটার জন্য সে উদ্বিগ্ন। ঘুড়ির

www.pathagar.com

গায়ে লেখা 'হ্যাপি ঈদ' পড়ার সময় মহসিন খানের রক্তমাখা হাত থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে ঘুড়ির ওপর। সন্দেহের তির্যক চোখে তিনি চারপাশে তাকালেন। পরক্ষণেই ছাদের দিকে তাকিয়ে তাহিরাকে দেখতে পেলেন। কোনো কিছু না ভেবে তিনি ঘুড়িটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। হাতের আস্তিন গোটাতে গোটাতে তিনি প্রতিজ্ঞার ভঙ্গিতে তাহিরাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সবুর করো। তোর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।'

তাহিরা ছাদের কিনারা থাকে সরে যায় এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে ফরিদ তার মায়ের কোলে ঝাপিয়ে পড়ে এবং চিৎকার করে বলে, 'মা, বাবা আমার ঘুড়িটা ছিঁড়ে ফেলেছে।'

ফরিদের মাথায় মা সান্ত্বনার নরম পরশ বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, সোনা মানিক। চুপ কর। তোর বাবা যেন কান্নার শব্দ শুনতে না পান। আসলে তিনি ঠিকই করেছেন।'

ফরিদ পাল্টা জিজ্ঞেস করে, 'কেন? কেন?'

মনের ভেতর হাজার প্রশ্ন নিয়ে তাহিরা, ফরিদ এবং তাদের মা ঈদের দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু জবেহ্ করা ভেড়ার মাংসের কাবাব বানানোর সময় মহসিন খানের রাগ বেড়ে দ্বিগুণ হয় এবং তিনি সারাদিন বাঘের মতো গর্জন করেন।

সেদিন থেকে তাহিরাকে ছাদে যাওয়া বারণ করেন মহসিন খান এবং তাহিরা চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি জীবন কাটাতে শুরু করে। পরিবারের কারোর সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই মহসিন খান অনেক দূরে অন্য জায়গায় বাড়ি কিনেন। শীতের ঠিক আগে তারা সবাই সেই নতুন বাড়িতে চলে যায়। যাহোক, শের কোনো কিছু না জেনে তখনো মহসিন খানের বাড়ির ছাদের ওপর ঘুড়ি ওড়ায় এবং অন্য ঘুড়ির সঙ্গে কাটকাটি করে।

শের একদিন মহসিন খানের বাড়ির সামনের রাস্তায় ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে মহসিন খানের ঘরের দরজায় বড় তালা ঝুলছে। যখন সে দেখতে পেল দরজায় তালা এবং 'বাড়ি ভাড়া' লেখা ঝুলছে, তখনই সে থমকে থেমে যায়। কয়েক মিনিট সে হতভম্বের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। সে রীতিমত বিধ্বস্ত। দূর থেকে তাহিরাকে এক পলক দেখার যেটুকু আশা তার মনের ভেতর জমা ছিল, তা যেন এক নিমিষে হারিয়ে যায়। গভীর শোকে তার কণ্ঠনালী বেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। আমার দুনিয়া ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমি এখন কি করব? কিভাবে তাহিরাকে খুঁজে

www.pathagar.com

পাব? পাড়ার সমস্ত অলিগলি সে তন্নতন্ন করে খোঁজে।

তাহিরার কোনো হদিস সে খুঁজে পায় না। তার মনে হয় তাহিরা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। সে ভাবে, ভালোবাসার কি যে জ্বালা, যার কোনো ঔষধ নেই। শুধু জ্বলে পুড়ে ভস্ম হওয়া ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। এই যন্ত্রণা আল্লাহপাকের তরফ থেকে এসেছে ভেবে সে তা সাদরে গ্রহণ করে।

শেরের ভাবনার পুরোটা জুড়ে শুধু তাহিরার উপস্থিতি। বিশেষ করে তার মনে পড়ে তাহিরার প্রাণখোলা উচ্ছল হাসি এবং গল্প বলার ঢং, এমনকি পরিহাসের ভঙ্গিতে যখন সে বলেছে, 'তুমি আরো বেশি স্বপ্নচারী হবে, খাওয়াদাওয়ার প্রতি তোমার অনীহা দেখা দেবে এবং তোমার চেহারা শুকিয়ে আমসি হয়ে যাবে। তুমি নির্ঘুম রাত কাটাবে।'

নিজেকে শের বলল, 'যদি সমস্ত পৃথিবীটা সড়ক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যদি জান্নাত আর দুনিয়ার সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, যদি আমাকে সাত সমুদ্দুর তের নদী পাড়ি দিতে হয়, যদি আমাকে পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করতে হয়, তবুও আমি তাহিরাকে খুঁজব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন না একদিন আমি ওকে খুঁজে পাবোই। অবশ্যই আমি ওর বাবার পাষাণ মনকে নরম করব। যদি তার মন গলে, তাবে ভালো। আর যদি না গলে, তাহলে তিনি তার শেষটা দেখতে পাবেন।'

প্রেমিক কখনও মৃত্যুকে ভয় করে না,
ভালোবাসা কখনও পাহাড় কিংবা জেলখানা ভয় করে না,
প্রেমিকের মন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো,
যা রাখালের রক্তচক্ষু কিংবা চিৎকারে ভয় পায় না।

সেদিন থেকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা শের শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে তাহিরাকে খুঁজতে থাকে। মনের ভেতর জাগানিয়া আশা নিয়ে সে সবাইকে তাহিরার কথা জিজ্ঞেস করে।

একদিন সড়কের শেষ প্রান্তের ঠেলাগাড়ির চালক মোরাদের কাছ থেকে তাহিরাদের নতুন বাড়ির খবর পায় শের। এই মোরাদই মহসিন খানের মালসামান ঠেলাগাড়ি করে নতুন বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।

মোরাদের কথা শুনে শেরের মনের ভেতর খানিকটা আশার আলো জ্বলে ওঠে। সে এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে মহসিন খানের বাড়ির সন্ধান পায়।

প্রথম কয়েকদিন শের তাহিরাদের বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করে। কিন্তু একদিন মহসিন খানের বাড়ির কাজের মেয়েটি তাকে দেখে ফেলে। মেয়েটি

www.pathagar.com

বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দেয়। মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও তাহিরার তিন পালোয়ান ভাই তৎক্ষণাৎ শেরের খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারা শেরকে পাঁজাকোলা করে বাড়িতে নিয়ে যায়। বড় ভাই মাহমুদ তিরস্কার করে শেরকে বলল, 'তুই একটা আস্ত বদমাশ। এখানে কি করছিলি?'

নিজেকে সংযত রেখে শের বলল, 'আমি আপনার খালাতো ভাই, শের। কি হল, আমাকে কি চিনতে পারছেন না?'

স্কুলে পড়ুয়া মেজ ভাই নাদির হেঁয়ালির সুরে বলল, 'ঘুড়িওয়ালা আর হাঁস বিক্রেতাকে কে চেনে না? তোকে সবাই খুব ভালো করে চেনে।'

নাদিরের অপমানিত কথা শোনার পর শের প্রচণ্ড রাগে বলল, 'মুখ সামলে ভদ্রভাবে কথা বল।'

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়। নামের মরতবা অনুসারে প্রথমে শের সিংহের মতোই লড়েছে। সে এলোপাতাড়ি ঘুষি মেরে তার খালাতো ভাইদের মুখ থেকে রক্ত ঝরায়। একসময় তার দম ফুরিয়ে এলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন চারদিক থেকে অনবরত তাদের কিল-ঘুষি আর লাথি এসে পড়ে তার উপর। ওরা এমন করে মেরেছে যে শেরের চেহারা পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছে। অবশেষে একজন এগিয়ে এসে মারামারি থামিয়ে দেয়। সবচেয়ে ছোট ভাই ফরিদ ভীষণ আনন্দ অনুভব করে। ভেংচি কেটে সে বলল, 'অনায়াসে তুমি এখন যেতে পারো। যাও, গিয়ে পুলিশকে বলো।'

উত্তরে শের বলল, 'পুলিশকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ভালো মানুষ সময়ের অপেক্ষায় থাকে।'

শের উঠে পরনের কাপড়চোপড় থেকে ধূলোবালি পরিষ্কার করার সময় রাস্তার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তার চারদিকে ঘিরে ধরে। একসময় সে সরকারি ট্যাপের পানিতে রক্তাক্ত মুখ ধুয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে।

সেদিনই শের উপহার হিসেবে এক ব্যাগ মিষ্টি আর নকুল নিয়ে হাজির হয় কুস্তিগীর ইয়াসীনের ব্যায়ামাগারে। ইয়াসীনের ছাত্র হিসেবে সে ব্যায়ামাগারে যোগদান করে।

এক বছর পর শেরের হাতের মাংসপেশী পুরু হয় এবং বুকের ছাতি লোহার ঢালের মতো শক্ত হয়। শের এবং অন্যান্য শিক্ষানবীশ কুস্তিগীরেরা যখন গা গরম করে, তখন একমাত্র ওস্তাদ ইয়াসীন ছাড়া আর কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারে না। ইয়াসীন তার দক্ষতা এবং বিভিন্ন কায়দায় শেরকে কুপোকাত করতে পারে। দিনে দিনে শের একজন নামকরা কুস্তিগীর হয়ে ওঠে এবং তার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

নববর্ষের আগে ঈদগাহ্ মসজিদের পাশে হাজুরী গার্ডেনে সমস্ত কুস্তিগীর জমায়েত হয়েছে। কুস্তিগীররা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তাহিরার বড় ভাই মাহমুদকে শের চ্যালেঞ্জ করলে মাহমুদ বিনাবাক্যে তা গ্রহণ করে। উভয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা নববর্ষের দিন বিকেলে লড়বে। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে শের বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নিতে পারেনি। কুস্তিগীর মাহমুদ অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সে সিংহের মতো লড়তে পারে। কারোর কোনো সন্দেহ নেই যে মাহমুদ অনায়াসে শেরকে দু'হাতে উপরে তুলে মাটিতে ছুড়ে দিতে পারে এবং উপস্থিত দর্শকদের হাসির খোরাক যোগাতে পারে। দিন যতই ঘনিয়ে আসে, শের বিভিন্ন মাজারে গিয়ে মানত করে এবং নির্ঘুম রাতে বিছানায় শুয়ে লড়াই নিয়ে ভাবে।

অবশেষে নির্ধারিত সময় আসে। শের এবং মাহমুদ মুখোমুখি দাঁড়ায়।

মাহমুদের হাত বেশ লম্বা। শের নড়াচড়া করার আগেই মাহমুদ তাকে উপরে তুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে। দর্শকেরা তুমুল হাততালি দেয়। অনেকে দারুণ উত্তেজনায় আল্লাহর নাম স্মরণ করে।

একসময় শেরের ধৈর্য্য শেষ সীমানায় এসে পৌঁছে। কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে। মেঝেতে শুয়ে সে তার শেষ কৌশল প্রয়োগ করে, যা তার গুরু ইয়াসীন শিখিয়েছে। আচমকা সে মাহমুদকে পাল্টা আক্রমণ করে এবং চোখের পলকে ধরাশায়ী করে। এত বেশি জোরে মাহমুদ মেঝেতে পড়ে যায় যে সে চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেল না। তার চারপাশে শুধু অন্ধকার এবং সবকিছু যেন পেন্ডুলামের মতো ঘুরছে।

ক্ষমার হাত বাড়িয়ে শের মাটি থেকে মাহমুদকে টেনে তুলে কোলাকুলি করে। তারপর সে উৎফুল্ল দর্শকদের ভীড় এড়িয়ে বাইরে চলে যায়। শেরের এরকম ব্যবহার মাহমুদ মোটেও আশা করেনি। সে তার খালাতো ভাইয়ের নৈপুণ্যে রীতিমত বিস্মিত। সত্যিকার কুস্তিগীর হিসেবে সে সেদিন বিকেলেই খালার বাড়িতে যায়, যে বাড়ি এতদিনে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। শেরের সঙ্গে সমঝোতা করার পর সে বলল, 'শের, তুমি আসলেই শের, ঠিক সিংহের মতোই শক্তিশালী। আমার ভুল হয়েছে। চল, অতীতের সব ঘটনা ভুলে যাই। পবিত্র কোরান শরীফকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে তুমি আর আমি চিরদিনের জন্য সত্যিকারের ভাই।'

শের কাঁপতে থাকে, কিন্তু সে তা প্রকাশ করে না। একসময় তারা আবার কোলাকুলি করে এবং শপথ করে যে এখন থেকে তারা দু'জন আসল ভাই। মাহমুদের নমনীয়তায় মহসিন খান এবং তার পরিবারের সবার সঙ্গে শের

www.pathagar.com

মিলমিশ করে। তাদের মাঝে অতীতের পুরনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এত ঘটনার পর তাহিরা খুবই খুশি যে সে আবার শেরের সঙ্গে অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারবে।

এরপর থেকে তাহিরার মনের গোপন গভীর নিস্তব্ধ সরোবরে আনন্দ-ফূর্তির তরঙ্গ বইতে শুরু করে এবং দিনদিন তা বেগবান হতে থাকে। অন্যদিকে শের গভীর চিন্তা-ভাবনার অকূল দরিয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে দিনে দিনে আরো বেশি শুকিয়ে যেতে থাকে। তার মনে হয় সে যেন কঠিন পাথর আর শক্ত কিছুর মাঝে পড়ে ক্রমাগত পিষ্ট হচ্ছে। তার একদিকে প্রেম, আর অন্যদিকে ভাতৃত্ব। তাহিরা একদিকে মাহমুদের আপন বোন, আবার অন্যদিকে কোরান শরীফ সাক্ষী রেখে মাহমুদকে সে ভাই হিসেবে মেনে নিয়েছে। তাই তাহিরা তারও বোন।

'তাহিরা, নাকি মাহমুদ? ভালোবাসা, নাকি ভাতৃত্ব?' এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলনায় দুলতে দুলতে শের নিজেকেই নিজে বলল, 'সত্যিকার মানুষ তার কথা রাখে। মাহমুদকে আমি কথা দিয়েছি। এখন থেকে সে আমার আসল ভাই। তাই তাহিরার ভালোবাসা আমার জন্য হারাম। আমি আর ওদের বাড়ি যাব না। তাহিরা সম্পর্কে কোনো আলাপ করব না, এমনকি ওকে নিয়ে একটুও ভাবব না।'

প্রতিজ্ঞা করার পর থেকে শেরের আচার-আচরণ এবং চিন্তাধারা আমূল বদলে যায়। যখন তখন সে বিভিন্ন কবরস্থান এবং পীর-আউলিয়াদের মাজারে যাতায়াত শুরু করে। অজু করে বিকেলে সে কবরস্থানে গিয়ে বিশেষ নামাজ আদায় করে এবং নামাজের শেষে হাত তুলে মোনাজাত করার সময় সে গোপনে অশ্রু বিসর্জন করে। মানুষের কবরগুলো আগাছায় ঢেকে গেছে। নিজেকে সে বলে, 'একদিন সবাইকে মরতে হবে। সবাইকে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। অল্প সময়েই সব শেষ হয়ে যাবে।'

কিন্তু কোনো কিছুই শেরের অস্থির মনকে শান্ত করতে পারে না। রাতে সে তার ঘরে ফিরে গিয়ে ছাদের উপর উঠে বসে থাকে। এ ছাদের উপর থেকেই সে ঈদের দিন সকালে 'হ্যাপি ঈদ' লেখা ঘুড়ি উড়িয়ে তাহিরাকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। সে দেখতে পায় কাবুলের প্রাচীন কেল্লা বালা হিশারের চূড়া ভেদ করে ধীরে ধীরে অন্ধকার আকাশ ফুঁড়ে মলিন চাঁদ উঠছে। একসময় চাঁদের সিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শহরে। সে চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'ও চাঁদ, পূর্ণ চাঁদ, বিশাল আকাশে তুমি একা। তুমি কি আমাকে

www.pathagar.com

দেখতে পাও? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এই সিংহটা কেমন করে কাঁদছে?' তার চোখ থেকে গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে সার্টের কলার ভিজিয়ে দেয়। কিন্তু তার এই আকুল কান্নায় চাঁদ কোনো সাড়া দেয়নি, বরং আস্তে আস্তে দূরের পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে যায়। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আর হতাশায় শের মাটিতে এক দলা থুতু ফেলে অকৃতজ্ঞ দুনিয়াকে অভিসম্পাত দেয়।

শের প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আলি রেজা খান মসজিদে যায়। সেখানে আলেমদের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা এবং ধর্মীয় বয়ান শোনে। তাতে সে মনের ভেতর একধরনের শান্তি পায়। কিন্তু ভোর হলেই তার সামনে পুনরায় ভেসে ওঠে তাহিরার মুখ, যেমন পূবের অন্ধকার আকাশ বিদীর্ণ করে জেগে ওঠে সকালের নতুন সূর্য। তখন তার মনে হয় তাহিরার অদৃশ্য পেলব হাতের স্পর্শ যেন সমস্ত শরীরে নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি মুছিয়ে দিয়ে একধরনের অদ্ভুত উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কেমন করে সে তাহিরার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে? সর্বত্র তাহিরার উপস্থিতি। সে তাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

একদিন শেষ অপরাহ্নে সূর্য ডোবার পর শের যখন আনমনে বালা হিশারের উত্তরে অবস্থিত শহীদদের কবরস্থান থেকে ফিরছিল, তখন সে দেখতে পেল বোরকা পরা দু'জন মহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে। শের তাদের এড়িয়ে যেতে চাইল, কিন্তু একজন সরাসরি তার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায় এবং চিৎকার করে বলল, 'শের, আমার প্রিয়তম, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

তাহিরার কণ্ঠস্বর শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শের থমকে দাঁড়ায়। স্থাণুর মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন কোনো শুকনো মরা গাছ।

মুখ থেকে বোরকা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহিরার চেহারার রোশনাইয়ে আশেপাশের কবরের শ্বেতপাথরগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্য শের তাহিরার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে নিশ্চুপ থাকে। তাহিরা জিজ্ঞেস করে, 'প্রিয়তম শের, এখানে তুমি কি করছিলে?'

শের বলল, 'কিছু না।'

সঙ্গে সঙ্গে তাহিরা জিজ্ঞেস করে, 'কিছু না বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও?'

শের কোনো কথাই বলল না। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে একজনের প্রতি অন্যজনের ভালোবাসার আগুন জ্বলছে। তাহিরার সঙ্গী তাদের কাজের মেয়ে। ও সবকিছু জানে।

www.pathagar.com

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি সবই দেখছিল এবং মনে মনে প্রার্থনা করছিল মহান আল্লাহ্ তা'আলা যেন এই দু'জনের মনের আশা পূর্ণ করেন। অবশেষে তাহিরাকে শের জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখানে কি করছিলে?'

উত্তরে তাহিরা বলল, 'আমি কবরে একটুকরো ফিতে বাঁধতে এবং দোয়া করতে এসেছিলাম।'

শের জিজ্ঞেস করে, 'কার জন্য? সবকিছু ঠিক আছে?'

তাহিরা বলল, 'আমার নিজের জন্য।'

খোঁচা দিয়ে শের জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নিজের জন্য?'

তাহিরা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। আবেগে তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সে কান্নাজড়িত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমার জন্য, এমনকি তোমার জন্যও। আল্লাহপাক যেন তোমার কোনো ক্ষতি না করেন। তিনি যেন তোমাকে কোনোদিন আমার দৃষ্টির সীমানার বাইরে নিয়ে না যান।' প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলেই তাহিরা চুপ করে থাকে।

শের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কণ্ঠস্বরে খানিকটা তেতো মিশিয়ে বলল, 'শোনো তাহিরা, অনেকদিন আগে তুমি কিন্তু আমার ভবিষ্যত বলেছিলে। এখন আমার চোখে ঘুম নেই, খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি এবং দিনদিন আমি শুকিয়ে যাচ্ছি। তুমি আর কি চাও?'

তাহিরা বলল, 'তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই চাই না। কথাটা বললাম, কেননা আমি তোমাকে দারুণ পছন্দ করি এবং এখনও ...'

শের জিজ্ঞেস করে, 'এখনও কি?'

তাহিরা বলল, 'তুমি ভালো করেই জানো। ন্যাকামো করো না।'

পুনরায় শের জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি জানি?'

তাহিরা বলল, 'সত্য কথা। আমাদের সম্পর্কটা তুমি খুব ভালো করেই জানো— শুধু তোমার আর আমার।'

গলার স্বরে একবাটি দুঃখের করুণ রস মিশিয়ে শের বলল, 'তোমার আর আমার মধ্যে অন্যরকম কোনো সম্পর্ক নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। সেসব মধুর দিনগুলো দিগন্তের ওপারে হাওয়ায় ভেসে গেছে, হারিয়ে গেছে অন্ধকার গহ্বরে।'

শেরের মুখে তার এবং মাহমুদের ঘটনা শুনে তাহিরা ভীষণ আঘাত পেয়েছে। শের এবং মাহমুদ কোরান শরীফ সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছে যে তারা দু'জন একে অপরের আসল ভাই। তাহিরা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে। একসময় বিদায়ের কালে শের বলল, 'পরজন্মে আমাদের আবার দেখা হবে।'

www.pathagar.com

তাহিরা বলল, 'প্রিয়তম শের, তুমি মাহমুদকে কথা দিয়েছ এবং প্রতিজ্ঞা করেছ, কিন্তু আমি তো কোনো কথা দিইনি, এমনকি প্রতিজ্ঞাও করিনি। সত্যি, আমি তোমাকে ভলোবাসি। সবসময় আমি তোমাকেই চাই। তুমি যদি আমার কাছে না আস, তবে তার জন্য তোমাকে হাশরের ময়দানে জবাবদিহী করতে হবে।'

কোনো কথা না বলে শের চলে যায়। তাহিরাও ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

কয়েক মাস পর চারদিকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে যে মহসিন খান তার মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেবার আনজাম করছে। তখন কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে তাহিরা বিষ পান করে আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে বেঁচে যায়। শেরের কানে খবরটা পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে আতংকে তার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। তার মনে হয় সে যেন সবকিছু তছনছ করে ফেলেছে। কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে তার প্রতীজ্ঞার প্রতি অনড় থাকে।

কয়েকদিন বাদে শের এবং তার মা তাহিরার বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে মহসিন খানের বাড়ির দিকে রওনা হয়। সে রাতে শের আতংক আর উৎকণ্ঠায় দাঁত দিয়ে এত জোরে নখ কাটে যে তাতে রক্ত বের হয়। তবে কেউ জানে না আসলে তখন তার মনের ভেতর কিরকম ভয়ংকর ঝড় বয়ে গিয়েছিল। যাহোক, শিল্পীরা যখন ঐতিহ্যবাহী বিয়ের সঙ্গীত 'আয়েস্তা বুড়ো' (ধীরে চল) পরিবেশন করছিল, তাহিরা তখন ধীর পায়ে শেরের সামনে থেকে চলে যায়। শুধু তাই নয়। তাহিরার এই চলে যাওয়া যেন অতীতের স্মৃতিময় মুহূর্ত থেকে চলে যাওয়া, এমনকি সে সব মধুর ঈদের দিন থেকে এবং জোৎস্না-প্লাবিত নির্জন রাত থেকে নিজেকে দূরে সরে যাওয়া। শেরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার পর সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একজন বেঁটে-মোটা ভুড়িওয়ালার সংসারে প্রবেশ করে।

তাহিরার বিয়ের পর থেকে প্রতিদিন শেরের দশ বছর বেড়ে যেতে থাকে। পঁয়তাল্লিশের আগেই তার মাথার চুল তুলার মতো শুভ্র দেখায় এবং অর্ধেক দাঁত পড়ে যায়। তখন সবাই তাকে বাবা শের বলে সম্বোধন করে। সে শিরাজী বাজারের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা দোকান ভাড়া নেয়। ছেলেরা তার দোকান থেকে ঘুড়ি, সুতা এবং লাটাই কিনে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। যাহোক, জীবনের সবকিছু হারিয়ে শের এখন ঘুড়ি ওড়ানোর কোনো উৎসাহ পায় না। অন্ধকার সরু গলির শেষ প্রান্তে বিধ্বস্ত ভাঙা মন নিয়ে জুবুথুবু বুড়োর মতো সে কোনো মতে বেঁচে আছে।

কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর করে শের চলাফেরা করে। দোকানের বেঞ্চে

www.pathagar.com

বসে সে সবসময় ছাদের উপর বাচ্চা ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দ আর চেঁচামেচি শুনতে পায়। ওদের কণ্ঠে 'হাইডারাক জায়লানি, বাতাস আরো জোরে বও', শোনার সময় তার ফেলে আসা দিনের কথা খুব মনে পড়ে।

সে-ও তখন দোকানের এক কোণে বসে ছেলেদের সুরের সঙ্গে সুর মেলায় এবং মনে মনে ভাবে তার বয়স যেন মাত্র কুড়ি বছর। এভাবেই তার আরো ছয় মাস কেটে যায় এবং কোরবানীর ঈদ প্রায় আসন্ন। আরো একবার সে একের পর এক বিভিন্ন ধরনের ঘুড়ির নকশা তৈরি করতে থাকে। সে সময় চারপাশে কাঁটাছেঁড়া কাগজের স্তূপ জমা হয়।

কিন্তু যা-ই তৈরি করুক না কেন, কোনোটাই শেরের মনের মতো হয় না। সে অতীতের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে। তার ভাবনা জুড়ে শুধু তাহিরা। হঠাৎ মনে পড়ে সেই রাতের কথা। সে একটা ঘুড়ির ঠিক মাঝখানে 'হ্যাপি ঈদ' লিখে নিজেকেই প্রশ্ন করে, 'কার জন্য? কেন?' অনুশোচনা আর গভীর বেদনায় সে ঘুড়িটা দোকানের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে দু'হাঁটুর মাঝে মাথা লুকায়।

সেই আগের ফজলু, যে এখন বাবা ফজলু নামেই অধিক পরিচিত, একদিন শেরের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। শের তখন মনমরা হয়ে দোকানে বসেছিল। ফজলু উপহাস করে বলল, 'এই শের, তোমার বেলুন কোথায়? তোমার উড়োজাহাজ দেখালে না? কবে আমরা তোমার বিয়ের মিষ্টি আর নকুল খাব?'

শের মাথা তুলে রক্তিম চোখে তাকিয়ে ফজলুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরখ করে। ফজলু তার উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'তুমি একটা আস্ত বধির। কিসের ধ্যানে মশগুল তুমি যে আমার কথা তোমার কানে যায়নি?'

উত্তরে শের বলল, 'আমি কাপুরুষদের কথা ভাবছি। আমি ভাবছি রামছাগলের কথা, এমনকি তোমার কথাও।'

ফজলু ব্যাঙ্গাত্মক হাসি হাসল। তখন তার পোকায় খাওয়া দাঁত আর পঁচা রক্তিম মাড়ি দেখে শেরের বুড়ো শেয়ালের কথা মনে পড়ল, যে কিনা ভাণ করে সে কিছুই জানে না, অথচ হটকারিতায় পটু।

অবজ্ঞার সুরে শের বলল, 'এখান থেকে চলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

ফজলু বলল, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। সেসব দিন আজ ইতিহাস, যখন তুমি চ্যাম্পিয়ান ছিলে। এখন আমার পালা। তোমাকে পিটিয়ে আমি তক্তা বানিয়ে ফেলব।'

www.pathagar.com

ফজলুর কথা শুনে শের বলল, 'তাহলে এখনও তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

ফজলু বলল, 'আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।'

শের বলল, 'হায় আল্লাহ, তবে তো তোমার সাহস আছে।'

ফজলু বলল, 'উফ, তোমার দোকানে পচা দুর্গন্ধ। দূর হও, ধাড়ি ইঁদুর। তুমি শুধু কথা বলতে পার, আর কিছুই পার না।'

রাগে শের ফুঁসতে থাকে। তার ইচ্ছে হলো সে দু'ধারে শান দেওয়া বড় ছুরি ঢুকিয়ে ফজলুর পেট থেকে নাড়িভুড়ি সব বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু সে জানে, আল্লাহপাক দূর থেকে সবকিছু দেখতে পান। তারপর সে এতো জোরে গর্জন করে ওঠে যে আশেপাশের দোকানীদের কানে গিয়ে পৌঁছে। সে চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে, ফজলু। এটা হলো সীমানা, আর ওটা হলো লড়াইয়ের ময়দান। সারা জীবন আমি এর পেছনে সময় ব্যয় করেছি। তুমি যদি সত্যি সাহসী হও, তাহলে আগামীকাল দু-রাহীতে এসে তোমার ঘুড়ি ওড়াও।'

ফজলু বলল, 'ঠিক আছে, তাই হবে। এখন শান্ত হও।'

শের এবং ফজলুর তর্কাতর্কি রাস্তার সবাই শুনছে, এমনকি সেই তর্কাতর্কির আওয়াজ আশেপাশের অন্যান্য রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার বিকেলে দু-রাহীতে শত শত ঘুড়ি নিয়ে উৎসাহী এবং দক্ষ লোকেরা জমায়েত হয়েছে। বাবা শেরের ডানে এবং বায়ে দু'জন যুবক কুস্তিগীর। সে মাঠের কাছে দাঁড়িয়েছে। তার পরনের সবুজ প্যান্ট এবং মাথার লাল পাগড়ি অনেক দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। সে যখন সামান্য ঢালু বেয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল, তখন উপস্থিত জনতা দু'পাশে সরে তাকে পথ করে দেয়। তারপর ফজলু আসে। ঔদ্ধত্য তার হাঁটা। ভাবটা এমন যেন সে খোরাই কেয়ার করে। ফজলুর অনর্গল ফাঁকাবুলি শুনতে শুনতে পড়শীদের অনেকে তাকে অনুসরণ করে।

লড়াইয়ের আগে দু'জনের কাছে নিয়মকানুন পরিষ্কার করে বলা হয় এবং উভয়েই তা বিনাবাক্যে গ্রহণ করে। শের একজন সাহায্যকারীকে বলল, 'তুমি আকাশে ঘুড়ি ওড়াও, আমি লড়াই করি।'

সেই নীল এবং সাদা ঘুড়ি, যার গায়ে শের 'হ্যাপি ঈদ' লিখেছিল, আকাশে ওড়ায়। বাতাস কেটে ওপরে ওড়ার সময় ঘুড়িটা দেখতে অবিকল মোরগের ঝুটির মতো দেখাচ্ছিল।

ফজলুর ঘুড়ির রঙ লাল আর কালো। ঘুড়িটা বুলেটের মতো ওপরে ওঠে

www.pathagar.com

এবং শেরের ঘুড়ির পাশে গিয়ে পৌঁছে। পরমুহূর্তেই ঘুড়ি দু'টি পাশাপাশি উড়তে থাকে। শেরের একজন সাহায্যকারী চিৎকার করে বলল, 'এখন ঠিক আছে?'

অন্যজন বলল, 'বিলকুল ঠিক আছে।'

ফজলুর ঘুড়ি শেরের ঘুড়ির খুব কাছে চলে আসে। ফজলুর ঘুড়ি ভালো অবস্থানে এবং অনবরত শেরের ঘুড়ির চতুর্দিকে চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেকে ফজলুর ঘুড়ির ওপর বাজি ধরে। কিন্তু যারা অনেকদিন থেকে শেরকে চেনে, তারা শেরের ঘুড়ির ওপর বাজি ধরে। শেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য তারা চিৎকার করে বলে, 'সাবাস শের। শের চ্যাম্পিয়ান। কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না।'

দূরের আকাশে ঘুড়ি দু'টি বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। একসময় ঘুড়ি দু'টি সবার দৃষ্টির সীমানার বাইরে চলে যায়। ঘুড়ির সূতা যেন কসাইয়ের ছুরির মতো ধারালো। সুতার ঘষায় উভয়ের আঙুল কেটে গেছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। জুয়ারিদের থেকে কিছুটা দূরে কয়েক শ' লোক উড়ন্ত ঘুড়ির দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। বাচ্চা ছেলেরা, এমনকি যুবকেরাও, উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় হাতের তালু ঘষছে। তাদের দৃষ্টি আঁঠার মতো লেগে আছে আকাশের সঙ্গে। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে কখন দৌড়ে গিয়ে কাটা ঘুড়ি সংগ্রহ করবে। আচমকা শেরের ঘুড়ি থেমে যায় এবং ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। হাততালির সঙ্গে উপস্থিত বাজিকররা সোৎসাহে চিৎকার করে, 'দেখো, দেখো, ফজলু জিতে যাচ্ছে! ফজলু জিতে যাচ্ছে!'

শের বাঁকা হয়ে হাঁটুর কাছে প্রায় মাথা নামিয়ে আরো বেশি সুতা ছাড়তে থাকে। কিন্তু সে আসন্ন বিপদ টের পায়। সে জানে, ফজলুর প্রতিশোধ নেয়ার সময় এসে গেছে। সে যদি হেরে যায়, তাহলে তার উৎসাহী সমর্থকরা তার ঘুড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

সবার দৃষ্টি শেরের দিকে। কিন্তু শের জানে, ফজলুর কাছে সে হেরে যাচ্ছে।

শেষ মুহূর্তে শেরের ঘুড়ি যখন নিচের দিকে গোত্তা খেয়ে নেমে আসছিল, তখন শের সাহায্যকারীকে চিৎকার করে বলল, 'সুতা প্যাঁচাও, আমি টানছি।' বলেই সে রীতিমতো ঝাকি দিয়ে এক, দুই, তিন বলে সজোরে সুতা টানে। তখন ফজলুর হাতে ঘুড়ির সূতার টান হালকা হয়ে যায়।

সবাই যা ভাবছিল, আসলে তা সত্যি হয়নি। শেষপর্যন্ত শের জিতেছে। বিজয়ের আনন্দে সে আরো সুতা ছেড়ে ঘুড়ি ওপরে তোলে।

www.pathagar.com

পরাজয়ের গ্লানিতে ফজলু চুপসে যায়। ঘুড়ি নামানোর জন্য পাশের একজনের হাতে সুতা তুলে দিয়ে শের বিজয়ীর বেশে পেছনে চলে আসে।

ইতোমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে। মনে হয় আকাশ যেন তার নীল স্কার্টের গায়ে লাল টিউলিপ ফুলের নকশা এঁকেছে। দূরে ঈদের চাঁদ ভেসে উঠেছে, যা দেখতে অনেকটা তাহিরার ভুরুর মতো। লোকজন জানে আগামীকাল ঈদ। তাই তারা অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। অবশেষে শেরের ঘুড়ি এমন ভঙ্গিতে নেমে আসে যেন কোনো নববিবাহিতা কনের মতো লাস্যময়। ঘুড়ির গায়ে লেখা 'হ্যাপি ঈদ' স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। শের বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে 'হ্যাপি ঈদ' লেখার ওপর, যা সে বিগত পঁচিশ বছর ধরে মনের ভেতর খোদাই করে লিখেছে। কল্পনায় সে দেখতে পায় তাহিরা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পরনে তার নতুন সিল্কের জামা। সামনের দিকে ঘাড়ের দু'পাশে চুলের বিনুনি এক জোড়া কালো সাপের মতো ঝুলে আছে। শের ভাবল সে তাদের ছাদের উপর উঠে মহসিন খানের বাড়ির দিকে ঘুড়ি ওড়াবে। তাহলে তাহিরা ভীষণ আনন্দিত হবে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই একের পর এক তার মনে পড়তে শুরু করে খালাতো ভাইদের সঙ্গে লড়াই, কুস্তিগীর জীবনের কথা, মাহমুদের সঙ্গে সমঝোতা, কবরস্থানে তাহিরার সঙ্গে দেখা এবং সবশেষে ভুড়িওয়ালার সঙ্গে তাহিরার বিয়ে। এসব ঘটনা তার স্মৃতির খাতায় জমা হয়ে আছে। এতদিন পর শের যেন পুনরায় শুনতে পেল তাহিরার কণ্ঠস্বর। সে বলছে, আমি তোমার ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছি। তুমি আরো বেশি স্বপ্নচারী হবে। খাবারের প্রতি তোমার অনীহা দেখা দেবে। তুমি শুকিয়ে আমসি হয়ে যাবে এবং নির্ঘুম রাত কাটাবে।

শের বলল, 'তাহিরা, তুমি ঠিক। সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলে। তবে এ কথা সত্য যে, একজন প্রেমিক পাহাড়ও ভেঙে দিতে পারে।'

সে সময় তাহিরা যেন যোজন যোজন দূর থেকে কেঁদে উঠল। সেই কবরস্থানের অসংখ্য খোদাই করা পাথরের ফলকের মাঝ থেকে কান্নাভেজা কণ্ঠে সে বলল, 'প্রিয়তম শের, মাহমুদকে তুমি কথা দিয়েছিলে, এমনকি প্রতিজ্ঞাও করেছিলে। আমি কিন্তু কোনো কথা দিইনি, এমনকি কোনো প্রতিজ্ঞাও করিনি। আমি তোমাকে ভীষণ ভলোবাসি। শুধু তোমাকেই চাই। তুমি যদি আমার কাছে না আসো, তবে তার জন্য তোমাকে হাশরের ময়দানে জবাবদিহী করতে হবে।'

স্বগতোক্তির মতো করে শের বলল, 'প্রকৃত মানুষ তার কথা রাখে। আমি

www.pathagar.com

আমার প্রতিজ্ঞার কোনো বরখেলাপ করিনি।'

বলেই সে পাগড়ির এক কোণা দিয়ে অশ্রুভেজা চোখ মোছে।

[**গল্পসূত্র :** 'মানুষ কথা রাখে' গল্পটি আকরাম ওসমানের ইংরেজিতে 'এ রিয়েল ম্যান কিপস্ হিজ ওয়ার্ড' গল্পের অনুবাদ। গল্পটি ১৯৭৫ সালে লেখা। 'দারি' ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ড. আর্লে লোয়েন। ইংরেজিতে গল্পটি 'রিয়েল মেন কিপ দেয়ার ওয়ার্ড' গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।]

লেখক পরিচিতি : আফগানিস্তানের যে ক'জন লেখক তাদের প্রতিভা, মননশীলতা এবং শৈল্পিক লেখনীর মাধ্যমে সমকালীন আফগান কথা সাহিত্যে, বিশেষ করে গল্প সাহিত্যের, উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তাদের মধ্যে আকরাম ওসমান অন্যতম। তিনি ১৯৩৭ সালে আফগানিস্তানের হেরাত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে পড়াশুনা সমাপ্ত করে তিনি ১৯৭১ সালে ইরানের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। সনাতন আফগান সাহিত্যের কলাকৌশলের সঙ্গে পশ্চিমা সাহিত্যের মিশ্রণে আকরাম ওসমান এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। তার বিভিন্ন গল্পে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আফগানিস্তানের শহরকেন্দ্রিক, বিশেষ করে কাবুলের, জনপ্রিয় লোক সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এসব গল্পে নস্টালজিয়ার পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়। তার গল্প আফগানিস্তানের রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারণাসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে 'রহমান-বাবা' পুরস্কারে ভূষিত হন। ইংরেজিতে ছোটগল্প সংকলন 'রিয়েল মেন কিপ দেয়ার ওয়ার্ড' ২০০৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরপরই বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কর্মজীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি আফগান সরকারের রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া একসময় তিনি আফগান রাইটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ১৯৯২ সালে সুইডেনে গমন করেন। বর্তমানে তিনি স্টকহোমের আফগান পেন ক্লাবের সভাপতি। সেখান থেকে তার তত্ত্বাবধানে 'ফারদা' ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

আতিক রহিমী

কাল্পনিক প্রত্যাবর্তন

১৯৮৪

তখন রাত ছিল। নবম রাত্রি। চতুর্দিকে সুনসান নিস্তব্ধতা, নিপীড়ন আর অত্যাচারে জর্জরিত। সে রাতে সমস্ত পৃথিবী যেনো বরফের শুভ্রতার আড়ালে ঢাকা পড়েছিল এবং থমকে থাকা সময়ের গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। তখন রাত ছিল। নবম রাত্রি।

চোরাকারবারী লোকটা বললো, 'নবম রাত্রিতে আমরা সীমানা অতিক্রম করে ওপারে যাবো।'

চুপিচুপি, নিঃশব্দে আমরা সীমানার দিকে এগোতে থাকি। আমরা প্রাণের তাগিদে সবাই নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি। আমরা প্রত্যেকে এক একজন মানুষ, এক একটা প্রাণী, এক একটা কণ্ঠস্বর...

তখন রাত ছিল। নবম রাত্রি।

একসময় আমরা একটা গিরিপথের সম্মুখে এসে পৌঁছি। চোরাকারবারী চিৎকারের মতো উচ্চৈঃস্বরে বললো, 'থামুন। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

তৎক্ষণাৎ আমরা থেমে পড়ি এবং পেছন ফিরে তাকাই।

এটাই হচ্ছে প্রিয় মাতৃভূমিকে এক পলক দেখার শেষ সুযোগ।

তবে বরফের শুভ্রতার আড়ালে ঢাকা এবং থমকে থাকা সময়ের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত জন্মভূমিকে দেখা যাচ্ছে না। পেছনে পায়ের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

দেশ ছেড়ে আসার গভীর শোকে সবার চোখে শোকের কালো ছায়া, অশ্রুকণা। সেই শোকার্ত কান্না ভেজা চোখ নিয়েই আমরা সীমানার দিকে দৌড়ুতে থাকি।

আমাদের মধ্যে একজনের দৌড়ের গতি শ্লথ হয়ে আসে। একসময় সে থেমে যায়।

www.pathagar.com

লোকটির দেহের গড়ন খর্বাকৃতির। তার সঙ্গে কোনো ব্যাগ নেই এবং দলের অন্যদের চেয়ে সে সব সময় মন্থর গতিতে হাঁটছিল। দেখলে বুঝা যায় হাঁটার সময় তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

খানিকটা বিশ্রামের জন্য লোকটি বিশাল একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে। তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্য আমি এগিয়ে যাই, যেনো সে অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সীমানায় পৌঁছুতে পারে। লোকটি ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবো?'

'সীমানার ওপারে।'

'কেনো?'

'তাহলে এতোটা পথ এসেছেন কেন?'

'লেখার জন্য।' একটু থেমে লোকটি পুনরায় বললো, 'সীমানার ওপারে পাচার করার জন্য আমি আমার সমস্ত লেখা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

লেখা? কিসের লেখা? আমার উত্তেজিত কণ্ঠের পাল্টা প্রশ্নের জবাবে লোকটি যখন বললো। তখন আমি মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করি।

'সবগুলো লেখাই কবিতা, যা সন্ত্রাস এবং অত্যাচারের কাছে মূল্যহীন। ওগুলো আমি আমার দৃষ্টির গভীরে লুকিয়ে রেখেছি। এইমাত্র যখন চোরাকারবারী আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে বললো এবং আমরা দেশ ছাড়ার বেদনায় কাঁদলাম, তখনই লেখাগুলো কান্নার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। একসময় ওগুলো মাটিতে পড়ে বরফের সঙ্গে মিশে যায়। যেখানে যাই না কেন, লেখা ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না, এমনকি অন্য সব বিদেশীর চেয়ে একজন মূল্যহীন বিদেশী হয়ে যাবো।'

লোকটি যেখানে বসে কাঁদছিল, আমি ওখানে যাই। তার চোখের উষ্ণ পানিতে বরফ গলে মাটি কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। একমুঠো মাটি তুলে আমি লোকটির কাছে ফিরে আসি। লোকটি চোখেমুখে কাষ্ঠ হাসির রেখা ফুটিয়ে বললো, 'মাটি থেকে কখনোই কবিতাকে আলাদা করা যায় না।'

লোকটি বিশাল পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে এবং চোখেমুখে এমন অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে, যার অর্থ সে এখন একাকী থাকতে চায়। কিন্তু তার সামনে আমি বেহায়ার মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকি। লোকটি তখনও হাসছিল। তার হাসি আমাকে অভিভূত করে। যেই মাত্র আমি সীমানার দিকে দৌড়ুতে যাবো, ঠিক তখনই সে বললো, 'আমার নাম আতিক।'

'আপনি কি আমার নেমসেক, নাকি যমজ?'

'কোনোটাই না। আপনি শুধু আমার নামের একজন।'

www.pathagar.com

আমি রীতিমতো ভড়কে যাই এবং ভয়ে লোকটিকে পেছনে ফেলে সীমানার দিকে দৌড়ুতে থাকি।

সীমানার ওপারে পৌঁছে আমি বিস্তীর্ণ জমির সন্ধান পেলাম। পুরো জমি আনকোরা সাদা কাগজের মতো শুভ্র বরফে ঢেকে আছে।

কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

কোথাও কোনো কবিতা নেই।

সবকিছুই যেনো থমকে থাকা সময়ের গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

২০০২

তখন দিন ছিল। একাশিতম দিন।

তখনও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মাটি বরফের মতো জমে আছে। আমাদের পায়ের চাপে জমাট বাঁধা মাটি ভেঙে যাচ্ছে।

তখন দিন ছিল। ছায়া-সৈনিকেরা, অর্থাৎ তালেবানরা, কাবুল থেকে পাততারি গোটানোর পরে সেদিন ছিল একাশিতম দিন।

তখন যারা স্বদেশে ফিরে আসছিল, তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নিত্যদিনের মতো সেদিনও আমি বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম।

প্রতিদিন আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরিচিত একজনের মুখ দেখার অপেক্ষা করি।

তখন দিন ছিল। একাশিতম দিন। সেদিন সে বিমান থেকে নেমে আসে। চোখেমুখে হতাশা আর দুঃখের করুণ চিহ্ন এঁকে সে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে পলকহীন তাকিয়ে থাকে। আমি তার সামনে গিয়ে বললাম, 'স্বাগতম, ব্রাদার।'

তার ঠোঁটের ফাঁকে এক ঝলক হাসি ফুটে উঠলো। তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার মুখের ঘন দাড়ির আড়ালে হারিয়ে যায়। আমি তার ব্যাগ আমার হাতে নিয়ে তাকে মুক্ত করি।

'ব্যাগটা খুবই ভারি।'

'ব্যাগের ভেতর ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা এবং আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র আছে।'

'আপনি কি একজন সাংবাদিক?'

'না। আপনি?'

'যাত্রীদের মালপত্র বহন করে আমি তাদের সাহায্য করি।'

যাত্রীদের টার্মিনালে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা শাটল্ বাস এসে বিমানের

www.pathagar.com

সিঁড়ির নিচে থামে। সবাই বাসে ওঠে। ড্রাইভার ক্যাসেটে আহমদ জহীরের একটা গান শুরু করে।

'এসে দেখো, গোলাপ বাগিচা এখনো প্রস্ফুটিত,
এসে দেখো, আমার প্রিয়তমা এসেছে।'

মৌলানার গীতিকবিতা এবং আহমদ জহীরের কণ্ঠ শুনে আমার পাশের মহিলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

'এ শহর জেগে উঠবে যখন চতুর্দিকে গুজব ছড়িয়ে পড়বে,
আরেকবার উন্মাদ তার শেকল ভেঙেছে।'

আমার যাত্রীর চোখেমুখে বিষণ্নতার ধূসর ছায়া। সে বিমানবন্দরের চারপাশে পড়ে থাকা ভাঙাচোরা এবং মরচেপড়া বিমানের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

একসময় টার্মিনালে এসে বাস থামে। আমার যাত্রী বাসের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় এবং ড্রাইভারের সামনের কাচের ওপর লেখা পড়তে থাকে, 'এ সময়ও কেটে যাবে।'

বেশ জোরে আমিও বাক্যটা উচ্চারণ করলাম। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে যাত্রী কাঁচ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে আমার মুখের ওপর রাখলো।

আমি একটা গল্প বলতে শুরু করি, 'অনেক অনেকদিন আগে এক দেশে এক রাজা ছিল। একদিন রাজা তার শাহী দরবারে এক নামীদামী শিল্পীকে তলব করে কঠোর আদেশ করলেন যে, সে যেনো এমন একটা কিছু তৈরি করে, যা দেখলে রাজার ভারাক্রান্ত মন ভালো হবে এবং উৎফুল্ল মন বিষণ্ন হবে। রাজার নির্দেশ মতো শিল্পী একটা রিং তৈরি করে এবং সেই রিংয়ের মধ্যে খোদাই করে লিখেছিল 'এ সময়ও কেটে যাবে'।

তারপর আমরা বাস থেকে নেমে যাই।

বাস থেকে নেমে গল্পের উৎস জানার জন্য যাত্রী বিস্ফারিত চোখে আমার মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে। আমি বললাম, 'এই নীতিবাক্য আমরা তেইশ বছর ধরে আমাদের বুকের ভেতর সযত্নে লালন-পালন করছি। সুখে-দুঃখে এটাই আমাদের সঙ্গী।'

আমরা বিমানবন্দরের পুলিশের কাছে যাই। যাত্রী তার পাসপোর্ট বের করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করে, 'নাম?'

'আতিক।'

'জাতীয়তা?'

'ফ্রান্স।'

www.pathagar.com

পুলিশ অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে তেরছা হাসি হাসলো। আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আমার নামও আতিক।'

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ অফিসারের আতংকিত চোখেমুখে এক ঝলক ক্ষীণ আলো জ্বলে ওঠলো। সে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমি বললাম, 'না, আপনি আমার নেমসেক নন, এমনকি যমজও না। শুধু আমার নামে নাম, সীমানার ওপারে সে সময়ের অতলে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে।'

গল্পসূত্র : 'কাল্পনিক প্রত্যাবর্তন' গল্পটি আতিক রহিমীর 'ইম্যাজিন্যারি রিটার্ণ' গল্পের অনুবাদ। ফরাসি ভাষা থেকে ইংরেজিতে গল্পটি অনুবাদ করেন এডওয়ার্ড গোঁভা। ইংরেজিতে গল্পটি ২০১০ সালের এপ্রিল সংখ্যা 'ওয়ার্ডস্ উইদআউট বর্ডার্স' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

লেখক পরিচিতি : আতিক রহিমী একজন স্বনামধন্য আফগান-ফরাসি ঔপন্যাসিক, চিত্রগ্রাহক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক। তার জন্ম ১৯৬২ সালে, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের পর ১৯৮৪ সালে তিনি পাকিস্তানে পালিয়ে যান এবং পরের বছর শরণার্থী হিসেবে ফ্রান্সের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করার পর তিনি ফরাসি টেলিভিশনের জন্য বেশ কয়েকটি প্রামাণ্য চিত্র এবং অসংখ্য বিজ্ঞাপন তৈরি করেন। আতিক রহিমী মূলত ফার্সী এবং ফরাসি ভাষায় লেখালেখি করেন। ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আর্থ এন্ড অ্যাসেজ' (২০০৩), 'এ থাউজেন্ড রুমস্ অফ ড্রিম এন্ড ফিয়ার' (২০০৭) এবং 'দ্যা পেইশনস্ স্টোন' (২০১২)। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত 'দ্যা পেইশনস্ স্টোন' উপন্যাসের জন্য তিনি ২০০৮ সালে ফ্রান্সের নামকরা 'প্রি গনক্যু' পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া ২০০৪ সালে 'কান চলচ্চিত্র উৎসব'-এ 'আর্থ এন্ড অ্যাসেজ' উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত হন। তালেবানদের পতনের পর ২০০২ সালে তিনি কাবুলে ফিরে এসে উঠতি আফগান লেখক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সহযোগিতা ও অনুশীলন প্রদানের জন্য 'রাইটার্স হাউজ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। বর্তমানে তিনি ভাগাভাগি করে প্যারিস এবং কাবুলে বসবাস করেন।

www.pathagar.com

জাহেদা গনি

আফগানিস্তান

আকাশ থেকে কাগজ পড়ছিল। আমি তখন বাগানে ছিলাম। দিনটা ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। মন্থর গতিতে কাগজ আমার দিকে উড়ে আসছিল। তখন আমার বয়স মাত্র তিন বছর। কখনো কখনো আব্বাজান এই ভেবে অবাক হন যে কেমন করে অল্প বয়সের সেই ঘটনা আমি অনেকদিন ধরে মনে রেখেছি। আমি তাকে বলি, সেসব স্মৃতি কখনোই ভুলে যাওয়ার নয়।

কাগজগুলো ক্রমাগত উপর থেকে পড়ছিল। বলতে গেলে এগুলো কমিউনিস্টদের একধরনের অপপ্রচার, যা আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছিল। যদিও হেলিকপ্টারগুলো আকাশের অনেক ওপরে কাগজ ছড়াচ্ছিল, কিন্তু ওগুলোর পাখার শব্দ ভীষণ জোরে শোনা যাচ্ছিল। দুপাশে হাত মেলে আমি ওপরের দিকে তাকিয়েছিলাম। কেননা সবগুলো কাগজ আমি ধরতে চাই।

কাগজ, কাগজ, চতুর্দিকে শুধু কাগজ।

তবে এটা সুখের বিষয় ছিল যে ওরা বুলেট ছোড়ার বদলে আমাদের ওপর লিফলেট ছেড়েছিল।

তখন আম্মাজান স্কুলে। তিনি রাস্তার উল্টোদিকে একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। দাদাজানের বাড়ির বিশাল দেয়ালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্কুলটা দেখা যেতো। দেয়ালটা ছিল মাটি এবং খড়ের তৈরি। দেয়ালটার স্মৃতি এখনো আমার মনে জেগে আছে। তখন আমার ভেতরে একধরনের নিরাপত্তা দিতো সেই সুউচ্চ দেয়াল। কেন জানি সব সময় ভাবতাম, হয়তো রকেট হামলা থেকে দেয়ালটা আমাদের রক্ষা করবে। কিন্তু কখনোই তা করেনি।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমি অতিথি কক্ষের বিশাল কালো সোফার পেছনে খেলছিলাম। মধ্য রাতে বিপদ সংকেত বাজার সময় আমরা ওখানেই লুকোতাম। এক রাতে আমি শুনতে পেলাম মোনাজাতের ভঙ্গিতে আব্বাজান দোয়া করছেন বোমা পড়লে আমরা যেনো সবাই একসঙ্গে মারা যাই। সে

www.pathagar.com

রাতে দুশ্চিন্তায় তিনি আম্মাজানকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমি আব্বাজানের কাছে ছিলাম। আমি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছি। আব্বাজান ভয়ে রীতিমতো কাঁপছিলেন। এর আগে আমি কখনোই তাকে এভাবে কাঁপতে দেখিনি।

ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমি বড় একটা লাল পুতুল নিয়ে খেলছিলাম। হঠাৎ বিকট একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি জানি, নির্ঘাত এটা একটা বোমার শব্দ। দৌড়ে আমি বাগানে যাই। একসময় বুঝতে পারলাম চাচীআম্মা আমার হাত ধরে আছেন। হেঁচকা টানে তিনি আমাকে তার পেছনে টেনে নিলেন। বাইরে অনেক মানুষের ভিড় জমেছে। স্কুলের দিক থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। আমি দেখতে পেলাম দেয়ালের উপর দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডুলী উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বোমার বিকট শব্দে আমি কিছু শুনতে পাইনি। তবে দেয়ালের অন্য পাশে চিৎকার আর চেঁচামেঁচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আচমকা আমার মনে প্রশ্ন জাগে, আম্মাজান কোথায়?

গেট পেরিয়ে আমরা বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াই। ভয়ে আমি জড়োসড়ো। কেননা আমি আমার সামনে কিছুতেই আম্মাজানের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ দেখতে চাই না। এ সময় ঘরে এসে তার দুপুরের খাবার খাওয়ার কথা।

চতুর্দিকে আমি শুধু ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমার বুকের ভেতর ধুকপুকানির শব্দ থেমে গিয়েছে। আমার পা থরথর করে কাঁপছিল। কেন জানি তখন আমার মনে হয়েছিল আম্মাজান বেঁচে নেই। সবাই কাঁদছিল। দাদীজান আমার হাত ধরেছিলেন। আমার মাথা তার বুকের সঙ্গে লেপ্টে ছিল। বোবা দৃষ্টিতে হা করে তাকিয়ে আমি শুধু কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলী দেখেছি। আমার মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছিল না। মনে প্রাণে চাইছিলাম, আম্মাজান ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসুক। আমি আর কিছু চাইনি, শুধু এটাই চেয়েছিলাম।

দাদীজানের হাত থেকে নিজেকে আলাদা করে আমি একাকী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু আমার চোখে কোনো কান্না নেই। তারপর কি ঘটেছিল, আমি কিছুই মনে করতে পারি নি। তবে আমার শুধু মনে হয়েছিল, আম্মাজান ধোঁয়ার ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছেন। আমার দিকে তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন। সে সময় আমি তার শরীরর ঘ্রাণ পেয়েছি, যা শুধু আম্মাজানের। তিনি শক্ত করে আমাকে তার বুকের সঙ্গে আগলে রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

ফিসফিসানির মতো শব্দ করে আম্মাজান কান্না জড়ানো গলায় বলেছিলেন, 'অবশ্যই এখান থেকে আমাদের পালাতে হবে।'

আমার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়েছিল।

গল্পসূত্র : 'আফগানিস্তান' গল্পটি জাহেদা গনির ইংরেজিতে 'আফগানিস্তান' গল্পের অনুবাদ। ইংরেজিতে গল্পটি ১৯৯৮ সালের এপ্রিল-জুন সংখ্যা 'আফগানম্যাগাজিন.কম'-এ প্রকাশিত হয়।

লেখক পরিচিতি : জাহেদা গনির জন্ম ১৯৭৭ সালে, আফগানিস্তানের হেরাত শহরে। তিনি সাংবাদিকতা এবং সৃজনশীল লেখনির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং রেডিওতে চাকরি করেন। বিখ্যাত মনিষীদের জীবনী ও আধুনিক লেখকদের বই পড়ে এবং লেখালেখিতে তার অবসর সময় কাটে। ভবিষ্যতে তিনি একজন লেখিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের বসবাস করেন।

www.pathagar.com

একটি ইত্যাদি প্রকাশনা

ISBN 984 70289 0299 9